পরিবেশ ও বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা – ২০০৫ এবং শিক্ষা অধিকার আইন – ২০০৯ দলিল দুটিকে গুরুত্ব দিয়ে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই কমিটির বিষয়-বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক চেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের ফসল হলো এই বইটি।

এই বিজ্ঞান বইটি ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়েছে ও নামকরণ করা হয়েছে 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান'। অতীব সহজ সরল ভাষায় বইটিতে পরিবেশ, ভৌত ও জীবন বিজ্ঞানের বিভিন্ন অভিমুখ আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ছবি, প্রতিকৃতি, চিত্রের নকশা ব্যবহার করে পরিবেশ ও বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের যাতে তথ্য ভারাক্রান্ত না হতে হয়, সে বিষয়ে লক্ষ রাখা হয়েছে। লেখা ও ছবিগুলি যাতে শিশুমনে আকর্ষণীয় হয় সেদিকে নজর রেখে উৎকৃষ্ট মানের কাগজ, কালি ও রং ব্যবহার করা হয়েছে। আশা করি পর্ষদ প্রণীত 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত হবে ও তাদের শিখন সামর্থ্য বাড়বে। অন্যদিকে সক্রিয়তা-নির্ভর অনুশীলনী তাদের বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ে আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করবে।

প্রথিতযশা শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাপ্রেমী শিক্ষাবিদ, বিষয়-বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য বিখ্যাত শিল্পীবৃন্দ — যাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও নিরলস পরিশ্রমের ফলে এই সর্বাঙ্গসুন্দর গুরুত্বপূর্ণ বইটির প্রকাশ সম্ভব হয়েছে তাঁদের সকলকে পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় বইটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এই প্রকল্পকে কার্যকরী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন সাহায্য করে পর্ষদকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে তা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে।

আশা করি পর্ষদ প্রকাশিত এই 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে বিজ্ঞানের বিষয়গুলি আকর্ষণীয় করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানচর্চার মান উন্নততর করতে সহায়ক হবে। ছাত্রছাত্রীরা উদবুদ্ধ হবে। এইভাবে সার্থক হবে পর্ষদের সামাজিক দায়বদ্ধতা।

সমস্ত শিক্ষাপ্রেমী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন বিনা দ্বিধায় বইটির ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্ষদের নজরে আনেন যাতে করে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়। এতে বইটির মান উন্নত হবে এবং ছাত্রসমাজ উপকৃত হবে। ইংরেজিতে একটি আপ্তবাক্য আছে যে, 'even the best can be bettered'। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক সমাজের ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের গঠনমূলক মতামত ও সুপরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
ডিসেম্বর, ২০১৭
কলকাতা - ৭০০০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পঃ বঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক- এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের বিজ্ঞান বইয়ের নাম 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান'। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (২০০৫) অনুযায়ী জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান ও পরিবেশ সমন্বিত আকারে একটি বইয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হলো। সহজ ভাষায় এবং উপযুক্ত দৃষ্টান্তের সহযোগে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বুনিয়াদি ধারণা শিক্ষার্থীদের সামনে আমরা উপস্থাপিত করেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন চিত্র সংযোজন করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীর কাছে বইটি আকর্ষণীয় এবং প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানগ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি আমরা স্মরণে রেখেছি—'তাহার ভাষা ও বিষয়বিন্যাস যতদূর সম্ভব সহজ করা উচিত, নতুবা ছাত্রদিগের মানসিক শক্তির অন্যায় এবং নির্দয় অপব্যয় সাধন করা হয়।' (ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক)। ষষ্ঠ শ্রেণিতেই প্রথম 'বিজ্ঞান' আলাদা বিষয় হিসেবে পাঠ্যপুস্তকে বিন্যস্ত হলো। এই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরিবেশ আর বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক সন্ধানে ব্রতী হবে এবং উৎসাহ নিয়ে বিজ্ঞানকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে পড়বে, এই আমাদের প্রত্যাশা।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

ডিসেম্বর, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০০৯১

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

‘পরিবেশ ও বিজ্ঞান’ বই নিয়ে কিছু কথা

এই বইয়ের নাম ‘আমাদের পরিবেশ’ না হয়ে ‘পরিবেশ ও বিজ্ঞান’ হলো কেন? একবিংশ শতকের প্রথম দশক অতিক্রান্ত — সারা পৃথিবীতে এখন পরিবেশ বিপন্ন। সেই পটভূমিকায় পরিবেশ যে পাঠক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তা সহজবোধ্য। কিন্তু ‘বিজ্ঞান ও পরিবেশ’ না হয়ে ‘পরিবেশ ও বিজ্ঞান’ কেন? আমরা মনে করি যে শিশুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবেশ থেকেই তার যাত্রা শুরু হোক। প্রকৃতি তার মনে জাগিয়ে তুলবে বিস্ময়, কৌতূহল এবং অনুসন্ধিৎসা। সেই কারণেই পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বইয়ের নাম ‘আমাদের পরিবেশ’।

পরিবেশ পর্যবেক্ষণ পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের প্রথম ধাপ, কিন্তু আরো গভীরে প্রবেশ করতে হলে চাই বিজ্ঞানের নানান শাখার সাহায্য। ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী যখন পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানচর্চার পথে অগ্রসর হবে তখন তার কাছে থাকবে এই বইটি। বইটি তাকে আনন্দের সঙ্গে বিজ্ঞানের নানান ধারণা শিখতে সাহায্য করবে। বইয়ের নাম তাই ‘পরিবেশ ও বিজ্ঞান’।

বিজ্ঞান শিক্ষায় সারা বিশ্বে বর্তমানে Constructivist পদ্ধতিই অনুসৃত হয়। এই পদ্ধতির মূল কথা হলো শিক্ষার্থীকে তার পরিচিত জগৎ থেকে তার মনোজগতের ধারণাগুলির সাহায্য নিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষায় দীক্ষিত করা। এই কাজে প্রয়োজন ধৈর্য, সুচিন্তিত পরীক্ষানিরীক্ষার সুচারু সম্পাদন ও শিশুকেন্দ্রিক মানসিকতার। এই উদ্দেশ্যে আমরা বহুসংখ্যক হাতেকলমে পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছি, যা অল্প খরচে, অল্প আয়াসেই করা সম্ভব। হাতেকলমে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিজ্ঞানের নানান বিষয় আরো ভালোভাবে শিখতে পারবে। Constructivist ধারণায় বিশ্বাস রাখলেও বিজ্ঞানের Counterintuitive দিকগুলি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে পাঠ পরিচালনা করতে হবে।

এই বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি সমন্বয়ী প্রচেষ্টার (integrated approach) ফসল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপন ও মেলবন্ধনের চেষ্টাই এই বইটিকে অন্য মাত্রা দেবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবইয়ের বাইরে অনুসন্ধিৎসা গড়ে তুলতে open-ended প্রশ্ন সংযোজিত হয়েছে। এটি এই বইয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বইটি সম্পর্কে যে-কোনো গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

পুস্তক নির্মাণ ও বিন্যাস

অধ্যাপক অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

ড. সন্দীপ রায় দেবব্রত মজুমদার রুদ্রনীল ঘোষ সুদীপ্ত চৌধুরী

ড. শ্যামল চক্রবর্তী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস পার্থপ্রতিম রায় ড. ধীমান বসু

দেবাশিস মন্ডল নীলাঞ্জন দাস

পরামর্শ ও সহায়তা

অধ্যাপক অমূল্যভূষণ গুপ্ত ড. শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য ডাঃ সুব্রত গোস্বামী

ড. অনির্বাণ রায় ডাঃ অমিতাভ চক্রবর্তী ডাঃ পৃথ্বীশ কুমার ভৌমিক

অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ মজুমদার অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ মজুমদার ড. অংশুমান বিশ্বাস

শিবপ্রসাদ নিয়োগী

পুস্তক সজ্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ — শঙ্খ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহায়তা — হিরাব্রত ঘোষ, অনুপম দত্ত, বিপ্লব মন্ডল

বিষয়		পৃষ্ঠা
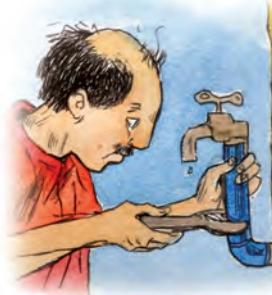
1 পরিবেশ ও জীবজগতের পারস্পরিক নির্ভরতা

আমরা ও অন্যান্য প্রাণীরা নির্ভর করি গাছেদের ওপর

আমাদের পরিবার আর সমাজ

জলের কল খারাপ হয়ে গেছে। খাবার জল দরকার। চান করার জল চাই। জামাকাপড় কাচতেও চাই জল। জল নাহলে চলে নাকি! কিন্তু কল সারাবে কে ? কাকু খোঁজ দিল পাড়ার নন্দ মিস্ত্রির। ডাকতেই চলে এলেন। আর সহজেই সারিয়েও দিলেন।

তোমাদের জামাকাপড় কি তোমরা নিজেরা সেলাই করতে পারো? বাড়িতে ইলেক্ট্রিকের লাইনে বা ইলেক্ট্রিকের কোনো জিনিসের সমস্যা হলে তোমরা কি নিজেরা ঠিক করতে পারো? দাদার সাইকেল খারাপ হলে কী করো?

বাড়িতে তোমার বাবা বা বাড়ির অন্য বড়ো কেউ হয়তো বাজার করে দেন। মা বা অন্য কেউ রান্না করেন।

কোনো কোনো কাজের জন্য তোমাকে তোমার পরিবারের লোকদের ওপর নির্ভর করতে হয়। আবার অন্য কোনো কাজে তোমাকে হয়তো তোমার পরিবারের বাইরে সমাজের বিভিন্ন লোকের সাহায্য নিতে হয়।

আচ্ছা, তোমরা কি তোমাদের সব কাজ নিজেরা করতে পারো? কোন কোন কাজের জন্য তুমি তোমার পরিবারের লোকদের ওপর নির্ভর করো? আর কোন কোন কাজের জন্য তোমাকে সমাজের অন্যদের ওপর নির্ভর করতে হয় ?

কোন কাজ করার জন্য তোমাকে তোমার পরিবারের সদস্যদের ওপর নির্ভর করতে হয় ?

কোন কাজ	কার ওপর নির্ভর করো
1. প্রতিদিন রান্না করা	1. মা, কাকিমা, ...
2. ছোটো ভাই বা বোনকে দেখশোনা করা	2. বাবা, কাকু, ...
3.	3.

কোন কাজ করার জন্য তোমাকে সমাজের বিভিন্ন লোকের ওপর নির্ভর করতে হয় ?

কোন কাজ	কার ওপর নির্ভর করো
1.	1.
2.	2
3.	3.

আমরা মানে মানুষেরা কি কোনোভাবে গাছেদের ওপর নির্ভর করি? নীচের তালিকায় লেখো মানুষ কোন কোন জিনিসের জন্য গাছপালার ওপর নির্ভর করে ?

মানুষ কীভাবে গাছেদের ওপর নির্ভর করে
খাবারের জন্য :
1. চাল
2. আটা
3.
ঘরবাড়ি তৈরিতে বা প্রতিদিন ব্যবহার করা হয় এমন জিনিস তৈরি করার জন্য :
1. ঘরের কাঠের আসবাব
2.
3.
জামাকাপড় তৈরি করার জন্য :
1
2.
3.
অন্যান্য জিনিসের জন্য :
1. ওষুধের জন্য
2.
3.

মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীরাও (যেমন - কাক, টিয়া, কাঠবেড়ালি, বেজি ও আরও অন্যান্য প্রাণী) কি গাছেদের ওপর নির্ভরশীল? নীচে লেখার চেষ্টা করো।

প্রাণীরা কীভাবে গাছেদের ওপর নির্ভর করে	
খাবারের জন্য :	
1.	3.
2.	4.
বাসা তৈরির জন্য :	
1.	3.
2.	4.
অন্যান্য প্রয়োজনে :	
1.	3.
2.	4.

খাবারের জন্য আমরা ও অন্যান্য প্রাণীরা যেভাবে গাছেদের ওপর নির্ভর করি

আগের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীরা নানাভাবে গাছেদের ওপর নির্ভর করি। আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার গাছপালা থেকে পাই। এছাড়াও আরো অনেক ধরনের খাবার আছে, যেগুলো আমরা বিভিন্ন প্রাণীদের থেকেও পাই। যেমন - গোরু বা ছাগলের দুধ অথবা মুরগির মাংস। কিন্তু একটু ভাবো তো। গোরু, ছাগল বা মুরগিরা তাদের খাবার কোথা থেকে জোগাড় করে? সেই গাছপালা থেকেই। মুরগি বা অন্যান্য প্রাণীরা যে পোকামাকড় খায়, সেই পোকামাকড়গুলোও কিন্তু গাছপালার কোনো না কোনো অংশ খেয়েই বেঁচে থাকে। কিছু প্রাণী তাদের খাবার হিসেবে পুরো গাছকেই খেয়ে ফেলে। কেউ কেউ আবার গাছের কোনো অংশ খেয়েই সন্তুষ্ট থাকে। তাহলে খাবারের জন্য আমরা মানুষ আর অন্যান্য সব প্রাণীরা অবশ্যই গাছেদের ওপরেই সরাসরি বা একটু ঘুরপথে নির্ভর করে থাকি।

এবারে দেখা যাক, প্রাণীরা কীভাবে খাবারের জন্য গাছেদের ওপর নির্ভর করে। প্রয়োজনে তুমি নীচের সারণিতে আরো কিছু প্রাণীর নাম যোগ করতে পারো।

প্রাণীর নাম	যেসব গাছপালা বা তাদের যে অংশগুলো খায়
1. গোরু	
2. ছাগল	
3. মুরগি	
4. বাঁদর	
5. কাঠবেড়ালি	
6. টিয়া	
7. শামুক	
8. পঙ্গপাল	
9.	

এবারে এসো দেখি খাবারের জন্য মানুষ কীভাবে গাছেদের ওপর নির্ভর করে। নীচের সারণিতে কিছু উদ্ভিদের নাম দেওয়া আছে। তোমরা আরো কিছু গাছের নাম ওই সারণিতে যোগ করতে পারো। ওইসব গাছের কোন অংশ আমরা খাই সেটাও লেখার চেষ্টা করো।

উদ্ভিদের নাম	উদ্ভিদের কোন অংশ মানুষ খায় (মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল, বীজ)
1. গাজর	
2. আদা	
3. আম	
4. সজিনা	
5. কুমড়ো	
6. কলা	
7. ভুট্টা	
8. পালংশাক	
9. কলমিশাক	
10. চালতা	

থাকবার জায়গা বা বাসা তৈরির জন্য প্রাণীরা যেভাবে গাছেদের ওপর নির্ভর করে

পাখিরা গাছের শুকনো ডাল, পাতা - এইসব দিয়ে গাছে বাসা বানায়। কোনো কোনো পাখি আবার ডাল-পাতা দিয়ে গাছে বাসা বানায় না। এরা বাসা বানায় বাড়ির ঘুলঘুলিতে, কড়ি-বরগার ফাঁকে বা বাড়ির আনাচে কানাচে। কিন্তু বাসা বানানোর উপকরণ জোগাড় করে সেই গাছ থেকেই।

কোনো প্রাণী আবার গাছে বাসা না বানিয়ে কেবল আশ্রয় নেয় গাছের ডালে। কেউ আবার বাসা বানাতে পারে না, থাকে গাছের কোটরে।

কেবল পাখি নয়, কাঠবেড়ালি, মাকড়সা, পিঁপড়ের মতো আরও অনেক প্রাণীও থাকে গাছে। এদের মধ্যে কেউ বাসা তৈরির জিনিসপত্র সংগ্রহ করে গাছেই বাসা বানায়। আবার কেউ বাসা বানাতে না পেরে গাছেই থাকে। বাদুড়রা যেমন গাছের ডালে ঝুলে থাকে।

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে কোনো কোনো প্রাণী গাছ থেকে বাসা তৈরির জিনিসপত্র জোগাড় করে। আবার কেউ বা গাছকেই থাকবার জায়গা হিসেবে বেছে নেয়।

তোমার বাড়ি বা স্কুলের আশেপাশের গাছগুলো খুব ভালো করে লক্ষ করো। কী কী প্রাণী সেখানে বাস করছে সেটা দেখো। কীভাবে তারা গাছের নানান অংশ ব্যবহার করে তাদের বাসা বানিয়েছে তাও দেখতে ভুলো না। নীচের তালিকায় তাদের কথা লেখো। গাছে বাসা না বানিয়ে গাছকেই থাকবার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করছে, এমন প্রাণীদের কথাও লেখো।

প্রাণীরা যেসব গাছ থেকে বাসা তৈরির জিনিসপত্র জোগাড় করে			গাছই যখন থাকার জায়গা	
কোন প্রাণী	কোন উদ্ভিদে বাসা বাঁধে	কীভাবে বাসা তৈরি করে	কোন প্রাণী	কোন উদ্ভিদে বাসা বাঁধে
1. চড়াই, শালিক	1. ডালপালা আছে এমন যে-কোনো গাছ	1. গাছের ছোটো ডাল সাজিয়ে	1. কাক	1. ডালপালা আছে এমন যে কোনো গাছ
2. লাল পিঁপড়ে (নালসে)	2. যে-কোনো চওড়া, গোল পাতাওয়ালা গাছ	2. গাছের পাতা মুড়ে বাসা তৈরি করে	2. বাদুড়	2.
3.	3.	3.	3.	3.
4.	4.	4.	4.	4.
5.	5.	5.	5.	5.

আমরা বাড়িঘর তৈরির জন্য যেভাবে গাছেদের ওপর নির্ভর করি
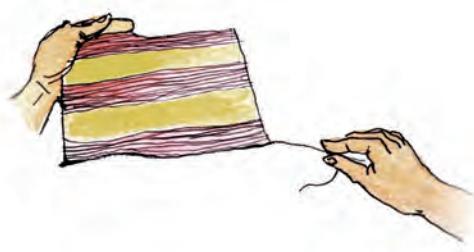
প্রাণীরা তাদের বাসা তৈরি বা থাকবার জায়গা খুঁজে পেতে কীভাবে গাছের ওপর নির্ভর করে সেটা তো আমরা জানলাম। আমরাও কি আমাদের বাড়িঘর, প্রয়োজনীয় আসবাব বা কাজের নানান সরঞ্জাম তৈরির জন্য গাছের ওপর নির্ভর করি? অবশ্যই।

যেমন ধরো,পাহাড়ি অঞ্চল বা যেখানে বেশি ভূমিকম্প হয় এমন জায়গায় কাঠ দিয়ে বাড়ি তৈরি করাই রীতি। আগেকার দিনে বাড়ি তৈরি করার সময় ছাদের কড়ি-বরগা তৈরি হতো কাঠ দিয়ে। অনেক আগে থেকেই চাষের কাজের নানা জিনিসপত্র তৈরি হতো কাঠ দিয়ে। জাহাজ বা গোরুর গাড়ির চাকা তৈরিতে কাঠের ব্যবহার বহুদিনের। এছাড়াও চেয়ার-টেবিল, খাট তৈরি করতেও কাঠ ব্যবহার করা হয়। কাঠ দিয়ে ঘর সাজানোর নানারকম শৌখিন জিনিসপত্রও অনেকের বাড়িতে কমবেশি দেখা যায়।
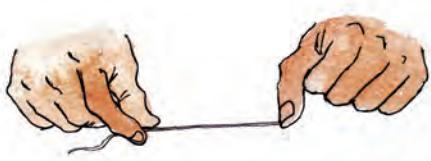
আমাদের রোজকার জীবনে, বাড়িঘর তৈরিতে বা প্রতিদিন ব্যবহার করা হয় এমন জিনিস তৈরির জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে গাছের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার আছে নীচের তালিকায় লেখো।

গাছের কোন অংশ	গাছের নাম	কী কাজে ব্যবহার করা হয়
1. গুঁড়ি		
2.	তালগাছ	হাতপাখা
3. ফল		
4.		

জামাকাপড়ের জন্য গাছের ওপর নির্ভর করতে হয়

দরজির দোকান বা বাড়ি থেকে সুতির কাপড় বা সুতির জামার একটা টুকরো জোগাড় করো। ওই কাপড়ের টুকরোটাকে খুব ভালো করে লক্ষ করো। কী মনে হচ্ছে ? ওই টুকরোটা কি দিয়ে তৈরি বলো তো ? এসো আমরা এবারে সেটাই জানার চেষ্টা করি।

ওই কাপড়ের টুকরোটার যে-কোনো একটা ধার ভালো করে লক্ষ করো। দেখতে পাবে কাপড়ের টুকরোটার ধার থেকে আলগা সুতো বেরিয়ে আছে। আর সুতো যদি না বেরিয়ে থাকে, তবে একটা পিন বা সুচের সাহায্যে কাপড়ের টুকরোটা থেকে সুতো বের করে নাও।

এবারে ওই সুতোটাকে টেবিলে রাখো। সুতোটার একটা প্রান্ত ছবিতে যেমন দেখানো আছে সেইভাবে বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দাও। আর অন্য প্রান্ত থেকে সুতোর দৈর্ঘ্য বরাবর নখ দিয়ে ঘষতে থাকো। কী দেখতে পেলে ? সুতোটার যে প্রান্তে নখ দিয়ে ঘষছিলে, দেখবে সেখান থেকে সুতোর থেকেও সরু সরু কিছু অংশ বেরিয়ে পড়েছে। ওগুলো কী বলো তো?

সুচে কখনও সুতো পরানোর চেষ্টা করে দেখেছ? বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছ? সুতোর যে প্রান্তটা সুচে ঢোকানোর চেষ্টা করছিলে,সেই প্রান্তটা ভালোভাবে লক্ষ করেছ কি? দেখতে পাবে, সেই প্রান্তটা কেমন যেন অনেকগুলো সুতোর চেয়েও সরু সরু অংশে ভাগ হয়ে গেছে। ওই সুতোর চেয়েও সরু সরু অংশগুলোই হলো **তন্তু**। তাহলে কী বোঝা গেল? কাপড় তৈরি হয় সুতো দিয়ে। আর সুতো তৈরি হয় তন্তু দিয়ে।

কাপড় → সুতো → তন্তু

তন্তু আমরা কোথা থেকে পাই বলতো? কিছু তন্তু আমরা পাই গাছ থেকে। আর কিছু আমরা পাই প্রাণীদের থেকে। প্রাণীদের থেকে পাওয়া তন্তুগুলোর কথা পরে বলব। সুতির জামাকাপড় তৈরি হয় যে তন্তু থেকে, সেটা পাওয়া যায় তুলো গাছ থেকে - যার আর এক নাম কার্পাস। এছাড়াও এখন কৃত্রিমভাবে তৈরি অনেক তন্তু থেকেও কাপড় তৈরি করা হচ্ছে। তবে শুধু যে জামাকাপড় তৈরি করার জন্যই তন্তু লাগে তাই নয়। তন্তু দিয়ে তৈরি হয় দড়ি। যেমন নারকোল দড়ি, সুতলি দড়ি। এছাড়াও বিভিন্ন জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় বস্তা আর ব্যাগ। চটের বস্তা কী দিয়ে তৈরি হয় জানো কি ? পাটের তন্তু দিয়ে। যদিও এখন পাটের বদলে কৃত্রিম তন্তু দিয়ে বস্তা তৈরি করা হচ্ছে।

জামাকাপড় তৈরি করার জন্য গাছ কীভাবে সাহায্য করে নীচের সারণিতে লেখো।

জামাকাপড় তৈরি করার জন্য গাছ কীভাবে সাহায্য করে? (অতীতে জামাকাপড় তৈরির কাজে উদ্ভিদকে কীভাবে কাজে লাগানো হতো, সেটাও লিখতে পারো)			
উদ্ভিদের নাম	উদ্ভিদের কোন অংশ	এখন কীভাবে কাজে লাগে	আগে কীভাবে কাজে লাগানো হতো
1. কার্পাস			
2. শিমুল			
3. পাট			
4. নারকোল			
5.			

গাছেদের কাছ থেকে আর যেসব জিনিস আমরা পেয়ে থাকি

খাবার আর থাকার জায়গার জন্য আমরা আর অন্যান্য প্রাণীরা কতরকমভাবে গাছেদের ওপর নির্ভরশীল সেটা আমরা জানলাম। জামাকাপড় আর বস্তা, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরির জন্যও আমরা কীভাবে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল সেটাও আমরা জেনেছি। এইসব জিনিস ছাড়াও প্রতিদিন আমরা নানান গাছ থেকে আরও অনেক উপকার পাই। এসো এবারে সেগুলো জানার চেষ্টা করি।

তুমি যে এই বইটা পড়ছ, বলো তো এই বইটা কী দিয়ে তৈরি ? গাছ থেকে আমরা পাই কাগজ।বই তৈরি হয় সেই কাগজ দিয়ে। আমরা লেখালিখিও করি কাগজে।

বই বা খাতা বাঁধাই করতে লাগে গঁদের আঠা। আর আঠাও আমরা পাই গাছ থেকে। যদিও এখন অনেকক্ষেত্রে এই কাজের জন্য কৃত্রিমভাবে তৈরি আঠা ব্যবহার করা হচ্ছে।

কাঠের জিনিসকে চকচকে করে তোলার জন্য পালিশ করা হয়। পালিশ করার জন্য যে রজন লাগে তাও আসে পাইন বা শালের মতো গাছ থেকে।

রজন

বটগাছ থেকে একটা পাতা বা ডাল ভাঙলে দেখবে সাদা দুধের মতো চটচটে একটা জিনিস বেরিয়ে আসছে। ওটা আসলে ওই গাছের বর্জ্য পদার্থ। রবার গাছ থেকে এইরকম যে পদার্থ বেরোয়, তার থেকেই তৈরি হয় রবার। এই রবার দিয়েই আগে তৈরি করা হতো গাড়ির টায়ার। অবশ্য ইদানীং টায়ার তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে কৃত্রিম রবার। প্রাকৃতিক রবার দিয়ে এখনও পেনসিলের দাগ মোছার ইরেজার তৈরি করা হয়।

ম্যালেরিয়ার ওষুধ তৈরি হয় কুইনাইন থেকে। কুইনাইন পাওয়া যায় সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে। কুইনাইন হলো সিঙ্কোনা গাছের একধরনের বর্জ্য পদার্থ। এছাড়াও সর্পগন্ধা, তুলসী, বাসক-এর মতো নানা গাছ থেকে পাওয়া যায় আরও নানারকম ওষুধপাতি।

অক্সিজেন তো গাছই দেয়

তোমরা জানো,আমরা যখন শ্বাস নিই তখন অক্সিজেন গ্রহণ করি। আর শ্বাস ছাড়ার সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করি। আবার গাছেরা খাবার তৈরি করার সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে আর অক্সিজেন ত্যাগ করে। এর ফলে পরিবেশে অক্সিজেনের জোগান বজায় থাকে। কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলেও পরিবেশে নানারকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই পরিবেশে অক্সিজেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য বজায় রাখাটা খুবই জরুরি।

খাবার, থাকার জায়গা বা জামাকাপড় তৈরি - এইসব ছাড়া আর অন্যান্য প্রয়োজনে মানুষ কীভাবে উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে ? নীচের সারণিতে লেখার চেষ্টা করো।

কীভাবে নির্ভর করি	কোন উদ্ভিদ থেকে পাই	উদ্ভিদের কোন অংশ থেকে পাই
1. কাঠ পালিশ করার জন্য		
2. পেনসিলের দাগ মোছার রবার		
3. ম্যালেরিয়ার ওষুধ — কুইনাইন		
4.		
5.		

গাছেরা যেভাবে নির্ভর করে প্রাণীদের ওপর

পরাগমিলন

স্কুল ছুটির পর অমল, রাবেয়া আর ফিরোজ দাসদের বাগানের ভেতর দিয়ে গল্প করতে করতে বাড়ি ফিরছে। অমল হঠাৎ হাত নেড়ে বন্ধুদের কথা বলতে বারণ করল। আর সামনের একটা ফুলগাছের দিকে দেখল। সবাই দেখল ফুলের ওপর অসাধারণ সুন্দর একটা প্রজাপতি বসে আছে। ওরা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকল। একটু পরেই প্রজাপতিটা উড়ে আরেকটা ফুলের ওপর গিয়ে বসল। তার একটু পরেই আবার আরেকটু দূরের একটা ফুলে গিয়ে বসল। প্রজাপতিটার কাণ্ডকারখানা দেখে ওরা আবার হাঁটতে আরম্ভ করল। অমল বলল, প্রজাপতিটা এক ফুল থেকে আর এক ফুলে গিয়ে বসছে কেন বলো তো ?

রাবেয়া বলল — কেন আবার, ফুলের মধু খাবে বলে।

ফিরোজ বলল — শুধু ফুলের মধু নারে। সেদিন স্যার বলছিলেন যে ওরা কিছু কিছু ফুলের পরাগরেণুও খায়।

অমল বলে উঠল — ফুলের মধু, পরাগরেণু সব খেয়ে নিচ্ছে ! এতে গাছের তো ক্ষতি হচ্ছে !

গাছের কি ক্ষতি হচ্ছে? নাকি লাভ হচ্ছে? তোমাদের কী মনে হয়? নীচের ছবিগুলো ভালো করে দেখো।

1.মৌমাছি/প্রজাপতির গায়ে,পায়ে কী লেগে গেল?

....

....।

2.ওই মৌমাছি/প্রজাপতিটা এক ফুল থেকে অন্য আর এক ফুলে গিয়ে বসলে কী হবে?

....

....।

3.ওপরের ছবি দেখে বলো তো, মৌটুসী কি কোনোভাবে কল্কে ফুলকে সাহায্য করছে? সাহায্য করলে কীভাবে সাহায্য করছে?

....

....।

অনেক প্রাণী তাদের খাবার সংগ্রহ করে ফুল থেকে। আর সেইসময় তাদের দেহের নানা অংশে লেগে যায় ফুলের পরাগরেণু। এই প্রাণীরা যখন অন্য কোনো ফুলে গিয়ে বসে, তখন পরাগরেণু ওই ফুলে এসে পড়ে। এই প্রক্রিয়াটারই নাম হলো **পরাগমিলন**। নতুন উদ্ভিদ তৈরির জন্য পরাগমিলন খুবই জরুরি। ফুলের এত রং আর গন্ধের আয়োজন কেবলমাত্র পতঙ্গ আর অন্যান্য প্রাণীদের কাছে টানার জন্যই। যাতে তারা ফুলের রং আর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ফুলে এসে বসে। আর এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে মাখামাখি হয়ে পরাগমিলন ঘটে যায়।

ফল আর বীজ ছড়িয়ে পড়ে দূরে দূরে

আনিসুর একদিন দেখল যে তাদের বাড়ির পাঁচিলে কতগুলো ছোটো ছোটো গাছের চারা বেরিয়েছে। ও ভাবল, পাঁচিলের ওপর তো কোনো গাছের বীজ পোঁতা হয়নি। তাহলে পাঁচিলে চারাগাছ এল কী করে?

পরদিন ক্লাসে গিয়ে ও দিদিমণিকে জিজ্ঞেস করল কারণটা। দিদিমণি তাকে কয়েকটা ছবি এনে দেখালেন। তোমরাও সেই ছবিগুলো দেখো।

ওপরের ছবিগুলো দেখে কী বুঝলে লেখো।..।

দিদিমণি বললেন — অনেকসময় পাখিরা মুখে করে ফল নিয়ে উড়ে যায়। উড়ে যাওয়ার সময় পাখিদের মুখ থেকে ফলটা মাটিতে পড়ে যায়। কখনও আবার পাখি বা অন্য কোনো প্রাণী কিছুটা খেয়ে ফলটা মাটিতে ফেলে দেয়। মাটিতে পড়ার পরে ফল পচে গিয়ে বীজটা বেরিয়ে পড়ে। ওই বীজ থেকে এরপর চারাগাছ জন্মাতে পারে। এইভাবেই হয়তো আনিসুরদের বাড়ির পাঁচিলে চারাগাছ গজিয়েছিল।

আনিসুর জিজ্ঞেস করল — বাদুড়ও কি এইভাবেই বীজকে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে?

— হ্যাঁ। কিন্তু প্রাণীরা আবার অন্যভাবেও বীজকে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে। বাদুড় ওই ফলগুলো খায়। কিন্তু ফলের বীজগুলো হজম করতে পারে না। ফলে ওই বীজগুলো তার মলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। এইভাবে বিভিন্ন প্রাণীদের মলত্যাগের মাধ্যমে হজম না হওয়া বীজগুলো দূরে দূরে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। আর একসময় ওই বীজগুলো থেকে চারাগাছ জন্মায়। গাছটা যে জায়গায় ছিল, সেই জায়গা থেকে গাছের ফল আর বীজ এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে তার বীজ দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ায় গাছেরই সুবিধা হয়। তাই ফলের রং হয় উজ্জ্বল আর ফলে থাকে খাওয়ার উপযোগী শাঁস, যাতে তার লোভে পশু-পাখি ছুটে আসে আর বয়ে নিয়ে যায় দূরের কোনো জায়গায়।

রেখা জিজ্ঞেস করলো — আচ্ছা দিদি, সেদিন পুবপাড়ার মাঠ দিয়ে মা-র সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলাম। বাড়ি ফিরে মা দেখল যে মা-র শাড়ির নীচের দিকে কীসব কাঁটা কাঁটা বিঁধে আছে। মা বলল, ওগুলো নাকি চোরকাঁটা। ওগুলো কি দিদি ?
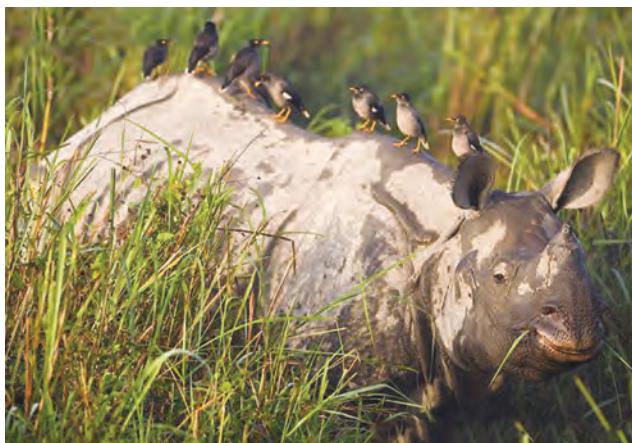
দিদি বললেন — ওগুলো আসলে একজাতীয় গাছের ফল। আমাদের জামাকাপড় বা অন্যান্য প্রাণীদের গায়ে লেগে ওই ফলগুলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

তোমরা এরকম আরো কিছু প্রাণীদের কথা জানো কিনা দেখো তো, যারা গাছের ফল বা বীজ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে।

ফল ও বীজের বিস্তারে সাহায্য করে কোন প্রাণী	কীভাবে সাহায্য করে
1. বনবিড়াল	
2. শেয়াল	
3.	

এক জীবের সঙ্গে অন্য জীবের সম্পর্কের প্রকৃতি

মিথোজীবিতা

ওপরের ছবিগুলো দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে ? প্রতিটি ছবিতে যে দুটো করে প্রাণীদের দেখতে পাচ্ছ তাদের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে ? তোমাদের কী মনে হয় ? নীচে লেখো।

....

....

রোহন আর অমিত স্কুলে আসে ধানক্ষেতের ধার ঘেঁষা মোরাম রাস্তা ধরে। হঠাৎ রাস্তার পাশে একটা ধানক্ষেতে নজর পড়ে রোহনের। লালচে সবুজ একধরনের পানা ভরে আছে ক্ষেতটাতে। পানাগুলো অন্য রকম দেখতে। রোহন অমিতকে বলল— এই ক্ষেতটাকে দেখছিস? অন্য কোনো ক্ষেতে এরকম পানার মতো জিনিস চোখে পড়েনি তো!

অমিত বলল—দাঁড়া। করিমচাচা আসছেন। ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখি।

ওদের কথা শুনে করিমচাচা বললেন—ওগুলো অ্যাজোলীর চাষ হয়েছে বাবারা।

— ধানক্ষেতে অ্যাজোলীর চাষ কেন চাচা? অমিত জানতে চাইল।

— ধানক্ষেতে অ্যাজোলী পানা চাষ করলে জমিতে আর সার দিতে লাগে না।

বিজ্ঞানের দিদিমণি ক্লাসে ঢুকতেই রোহন জিজ্ঞেস করল— অ্যাজোলী থাকলে জমিতে সার দিতে লাগে না কেন!

— তোমরা নিশ্চয়ই কোনো ক্ষেতে এমনটা দেখেছ! আসলে অ্যাজোলা একধরনের পানা। এদের পাতার মধ্যে একধরনের ব্যাকটেরিয়া আছে যারা বাতাসের নাইট্রোজেনকে বেঁধে ফেলতে পারে। তাতে অ্যাজোলার উপকার হয়। কারণ সারের জন্য

নাইট্রোজেন লাগে। আর অ্যাজোলা তার পাতায় ওই ব্যাকটেরিয়াকে থাকবার জায়গা দেয়। এতে দুজনেরই বোঝাপড়া থাকে, দুজনেই উপকার পায়।

অ্যাজোলা

প্রকৃতিতে দেখা যায় এইভাবে দুটো জীব একে অপরকে সাহায্য করে বেঁচে আছে। আবার এই ধরনের সম্পর্কে অনেকসময় এমনও দেখা যায়, দুটো জীবের এই ধরনের সম্পর্কে কেবল একটা জীবই উপকার পাচ্ছে, অন্যজনের উপকার বা অপকার কিছুই হচ্ছে না। প্রকৃতিতে এই ধরনের সম্পর্ক, যেখানে দুই বা তার বেশি জীব একে অপরকে সাহায্য করে বেঁচে থাকে সেটাই হলো **মিথোজীবিতা**।

এবারে এসো পাশের পাতার ছবিতে দেখানো এইরকম কয়েকটা মিথোজীবী সম্পর্কের সম্বন্ধে জানি।

মিথোজীবী		সম্পর্ক
জীব	জীব	
1. গো-বক (Cattle Egret)	গোরু	গোরুরা হাঁটার সময় ঘাসের মধ্যে থাকা নানা পোকামাকড় উড়ে যায় , যা গো-বকের খাদ্য। অনেকসময় এরা আবার গোরুর গায়ে বসা পোকাদেরও খায়।
2. সাগরকুসুম (Sea anemone)	ক্লাউন মাছ	ক্লাউন মাছ থাকে সাগরকুসুমের সঙ্গে। সে সাগর কুসুমের শত্রু যেমন - বাটারফ্লাই মাছকে তাড়িয়ে দেয়। আর সাগরকুসুমের খাবারের পড়ে থাকা অংশের ভাগ পায় ক্লাউন মাছ। আবার অনেকসময় ক্লাউন মাছকে তাড়া করে আসা প্রাণীরা সাগরকুসুমের শিকার হয়।
3. পিঁপড়ে	জাব পোকা (Aphid)	জাব পোকারা গাছের শর্করা-সমৃদ্ধ রস শোষণ করে শর্করা-সমৃদ্ধ বর্জ্য ত্যাগ করে। এই বর্জ্যের নাম হানিডিউ (Honeydew)। পিঁপড়েদের খুবই উপাদেয় খাবার এই হানিডিউ। খাবার পাওয়ার জন্য পিঁপড়েরা জাব পোকাদের লালন-পালন করে, শত্রুর হাত থেকে বাঁচায়। এমনকি জাব পোকাদের খাবার ফুরিয়ে গেলে তাদের এক গাছ থেকে অন্য গাছে নিয়েও যায়।
4. গন্ডার	গো-বক/ শালিক	শালিক গন্ডারের পিঠে বসে গন্ডারের চামড়ার এঁটুলিগুলোকে খেয়ে গন্ডারকে স্বস্তি দেয়। পরিবর্তে শালিকরা এঁটুলিগুলোকে খাবার হিসেবে পায়।
5. সাগরকুসুম (Sea anemone)	সন্ন্যাসী কাঁকড়া (Hermit crab)	সন্ন্যাসী কাঁকড়ার পেটের অংশটা নরম। তাই সে বাসা বাঁধে কোনো মৃত সামুদ্রিক প্রাণীর খোলসে। আর সন্ন্যাসী কাঁকড়া পিঠে করে বয়ে নিয়ে বেড়ায় সাগরকুসুমকে। সন্ন্যাসী কাঁকড়ার দেহ যখন বাড়ে, সাগরকুসুম খোলস শুদ্ধ সন্ন্যাসী কাঁকড়াকে ঢেকে রাখে। সাগরকুসুম তার বিষাক্ত কোশযুক্ত টেন্ট্যাকলের সাহায্যে সন্ন্যাসী কাঁকড়াকে রক্ষা করে। সন্ন্যাসী কাঁকড়া খাবারের খোঁজে গেলে সাগরকুসুমও সেই খাবারের ভাগ পায়।

কে খায়, কাকে খায়

পরাগ বলল–– জানেন স্যার, কাল রাতে আমাদের বাড়িতে শেয়াল এসেছিল। মুরগি নিয়ে গেছে। শেয়াল কি মুরগি খায়?

স্যার বললেন — হ্যাঁ, শেয়াল ছোটো ছোটো পাখি, বড়ো ইঁদুর - এসব ছোটোখাটো প্রাণীদের খায়। এমনকি ছোটো ছাগল, ভেড়াদের একলা পেলে ধরে খেয়ে নিতে পারে।

আমির বলল–– বনবিড়ালও স্যার ছোটো ছোটো প্রাণীদের খায়। আমার মামার বাড়িতে খুব বনবিড়ালের উপদ্রব। ওখানে অনেকে বনবিড়ালকে খট্টাশ বলে। খট্টাশ হাঁস-মুরগি নিয়ে যায়।

--- এরকম আরো অনেক প্রাণী আছে যারা অন্য প্রাণীদের খায়। তারা মাংসাশী। আবার কিছু প্রাণী আছে যারা লতা-পাতা-ঘাস- ফল-মূল খেয়ে বেঁচে থাকে। তারা তৃণভোজী।

যারা অন্য কোনো প্রাণীদের ধরে খায় তারাই খাদক। খাদকরা যাদের খায় তারাই খাদ্য।

নীচের ছবিগুলো দেখে প্রাণীগুলোকে চিনতে পারো কিনা দেখত। ছবির নীচে প্রাণীদের নাম লেখার চেষ্টা করো।

তোমরা এরকম আরো কিছু খাদকের নাম লেখার চেষ্টা করো। এইসব প্রাণীদের খাদ্য কী সেটাও তোমরা লেখার চেষ্টা করো।

খাদকের নাম	কোথায় দেখেছ	এইসব প্রাণীদের খাদ্য কী কী
1. শিয়াল	1.	1. মুরগি, ইঁদুর, ...
2. গোসাপ	2.	2. সাপ, ইঁদুর, মাছ, ...
3. খট্টাশ/বনবিড়াল	3.	3. কলা, অন্যান্য ফল ....
4. কেউটে সাপ	4.	4. পাখি, ইঁদুর,...........................
5. দাঁড়াশ সাপ	5.	5.
6. টিকটিকি	6.	6.
7. মাকড়সা	7.	7.
8. ব্যাং	8.	8.
9.	9.	9.
10.	10.	10.

পরজীবিতা — অন্য জীবের দেহে বাসা বাঁধা ও বেঁচে থাকা

উকুন
(অনেক গুণ বড়ো করে দেখানো)

তহমিনা স্কুলে এল ন্যাড়া হয়ে। সবাই অবাক। জিজ্ঞেস করছে, কীরে ? মাথা ন্যাড়া কেন ? কী হয়েছে ? এরই মধ্যে দিদিমণি ক্লাসে এসে গেছেন। দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন— কী তহমিনা, মাথার চুল কেটে ফেলেছ কেন ?

তহমিনা বলল— মাথায় উকুন হয়েছিল দিদি । তাই মা চুল কেটে দিয়েছে ।

আশপাশ থেকে কয়েকজন বলে উঠল— উকুন তো আমাদেরও হয়েছিল দিদি।

দিদি জিজ্ঞেস করলেন-— তোমরা কি জানো উকুন আসলে কি ?

রেবা বলে উঠল —ওই তো ছোটো ছোটো কী যেন! মা মাথার চুল থেকে বেছে নখ দিয়ে টিপে মেরে ফেলে।

— উকুন আসলে একধরনের পোকা । এরা আমাদের মাথায় বাসা বাঁধে। আর এদের খাবার কি জানো ? আমাদের রক্ত ।

মায়া বলল— তাহলে তো এরা আমাদের ক্ষতি করছে !

— ক্ষতি করছে তো ! উকুন আসলে আমাদের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকে। তাই এদের বলে **পরজীবী**।

হেনা বলল —এরা পরের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। তাই এদের পরজীবী বলে । তাই না দিদি ?

—ঠিক তাই।

প্রমিতা বলল — দিদি এই পরজীবীরা কি খালি মানুষের দেহেই বাসা বাঁধে ?

— খুব ভালো প্রশ্ন করেছ। পরজীবীরা মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদের দেহেও বাসা বাঁধে। এমনকি গাছেদের দেহেও পরজীবীরা বাসা বাঁধে। হলুদ রঙের নরম তারের মতো দেখতে একধরনের লতা, কুলগাছ বা অন্য কোনো গাছের ওপর দেখা যায়। এরা যে গাছের ওপর হয়, তার দেহ থেকে রস শুষে নিয়ে বেঁচে থাকে। এই লতার রং হলুদ সোনার মতো বলে একে স্বর্ণলতা বলে ডাকা হয়।

স্বর্ণলতা

এবারে এসো আমরা এইরকম আরো কিছু পরজীবীদের কথা জানি। আরো কিছু পরজীবীর কথা তোমরা লিখতে পারো কিনা দেখো। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষক বা শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

পরজীবী	কোথায় বাসা বাঁধে	শরীরে কী কী লক্ষণ দেখা দেয়
1. যক্ষ্মার জীবাণু	ফুসফুস, হাড় ও নানা অঙ্গে	জ্বর, দেহের ওজন কমে যাওয়া ও কাশি
2. ফিতাকৃমি	পাকস্থলী, অন্ত্র, পেশি, মস্তিষ্ক, যকৃত	দুর্বলতা, খিঁচুনি
3. ম্যালেরিয়ার জীবাণু	যকৃত, লোহিত রক্তকণিকা	জ্বর, রক্তাল্পতা, দুর্বলতা
4. আমাশয়ের জীবাণু	অন্ত্র	বারেবারে পাতলা মলত্যাগ, শরীরে জলের ঘাটতি
5.		
6.		

অন্যান্য প্রাণীদের ওপর মানুষ যেভাবে নির্ভর করে

খাবারের জন্য

তমালের খুব কাশি হচ্ছিল। সরিৎ বলল, কীরে ওষুধ খাচ্ছিস না কেন ?

— খাচ্ছি তো । মা আমাকে প্রতিদিন তুলসীপাতা মধু দিয়ে খাওয়াচ্ছেন।

— মধু তো আমি এমনিই খাই !

পাশেই ছিল আমিনুল। বলল— কিন্তু মধু কোথা থেকে পাওয়া যায় জানিস কি ?

— নারে । তুই জানিস নাকি ?

আমিনুল বলল— আমাদের গ্রামের বাড়ি সুন্দরবনে। সেখানে মৌচাক দেখেছি। মৌলিরা মৌচাকে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছিদের মৌচাক থেকে তাড়িয়ে মধু জোগাড় করে।

সরিৎ বলল— মৌচাক তো আমাদের বাড়ির পাশের গাছেই দেখেছি।

তোমরাও নিশ্চয় কেউ কেউ মৌচাক দেখেছ । এবারে এসো আমরা মৌচাক আর মৌমাছির ছবি দেখি।

মধু ছাড়াও ডিম, মাংস, দুধ - এসবও তো আমরা পাই প্রাণীদের থেকে। আর দুধ থেকে নানান খাবার তৈরি হয় - ঘি, মাখন, দই, ছানা, ঘোল ইত্যাদি।

নীচের তালিকায় প্রাণীদের থেকে পাওয়া যায় এমন কিছু খাবারের নাম লেখার চেষ্টা করো। ওই খাবার কোন প্রাণী থেকে পাওয়া যায়, সেটাও লেখো।

খাবারের নাম	কোন প্রাণী থেকে পাওয়া যায় (একের বেশি প্রাণীর নাম লিখতে পারো)
1. মধু	1.
2. মাংস	2.
3. ডিম	3.
4.	4.
5.	5.

জামাকাপড়ের জন্য

সেদিন ক্লাসে দিদি বললেন— আমার শাড়িটা কী দিয়ে তৈরি বলত?

তনুশ্রী বলে উঠল— সুতির শাড়ি।

লিপি চটজলদি বলে উঠল— নারে সিল্কের, দেখছিস না কেমন চকচক করছে।

দিদি বললেন— ঠিক বলেছ। কিন্তু তোমরা কি জানো, সিল্ক কোথা থেকে পাওয়া যায়?

রুকসানা বলল— গাছ থেকে দিদি। আমরা তো পড়েছি তুলো গাছ থেকে পাওয়া যায় তুলো। আর তুলো থেকেই তৈরি হয় সুতো।

দিদি বললেন— তুলো থেকেই সুতো তৈরি হয়। কিন্তু ....

লিপি তড়িঘড়ি হাত তুলে বলে উঠল—আমি বলব দিদি? সিল্ক পাওয়া যায় রেশম মথ থেকে।

দিদি জিজ্ঞেস করলেন— কী করে জানলে লিপি ?

লিপি বলল— মালদায় আমার মামার বাড়িতে গিয়ে দেখেছি দিদি । রেশম মথের চাষ। রেশম মথের গুটিও দেখেছি দিদি।

তনুশ্রী জিজ্ঞেস করল— রেশম মথ কেমন দেখতে দিদি ?

দিদি বললেন— এই যে রেশম মথের ছবি দেখো।

তনুশ্রী আর রুকসানাদের সঙ্গে তোমরাও দেখে নাও। রেশমের কথা তো জানলাম। এসো তো এবারে লেখার চেষ্টা করি প্রাণীদের থেকে জামাকাপড় তৈরির আর কী কী উপাদান আমরা পাই।

জামাকাপড় তৈরির উপাদান	কোন প্রাণী থেকে পাওয়া যায়
1. রেশম	1.
2. উল	2.
3.	3.
4.	4.

ওষুধের জন্য

জাহানারা ক্লাসে দিদিমণিকে জিজ্ঞেস করল— দিদি টিভিতে দেখলাম, লিভার অয়েল- এর বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে। ওটা কী দিদি?

— ওটা আসলে কড, হাঙরের মতো কিছু সামুদ্রিক মাছের লিভার অর্থাৎ যকৃতের তেল। তোমরা তো নিশ্চয়ই পাঁঠা বা মুরগির মেটে খেয়েছ। ওই মেটে হলো আসলে পাঁঠা বা মুরগির যকৃত।

অগ্নি জিজ্ঞেস করল— ওই যকৃতের তেলে কী থাকে দিদি?

— যকৃতের তেলে থাকে ভিটামিন।

জাহানার জিজ্ঞেস করল — ভিটামিন কী দিদি?

— ভিটামিন হলো আমাদের খাবারের একটা অত্যন্ত দরকারি উপাদান। আমাদের দেহে ভিটামিনের অভাব হলে নানারকম রোগ হয়। এইসব সামুদ্রিক মাছের যকৃতে থাকে ভিটামিন A আর ভিটামিন D।

অগ্নি এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল। এবারে সে জিজ্ঞেস করল- ভিটামিন A আর ভিটামিন D - এর কাজ কী দিদি?

— আমাদের হাড়, দাঁত মজবুত করতে সাহায্য করে এই দুটো ভিটামিন। কড মাছের যকৃতের তেলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন A আর ভিটামিন D থাকে। তাছাড়াও ভিটামিন A আমাদের চোখ ভালো রাখতে সাহায্য করে।

প্রাণীদের দেহ থেকে পাওয়া যায় এরকম আরো কিছু ওষুধের কথা ভেবে লেখার চেষ্টা করো। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষক/ শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

ওষুধের নাম	কোন প্রাণী থেকে পাওয়া যায়	কী কাজে লাগে
1. কড লিভার অয়েল	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.

দূষণ কমায় যারা

ক্লাসে দিদিমণি খুব দরকারি একটা জিনিস পড়াচ্ছেন। হঠাৎ কা-কা! কাকটা একটানা ডেকেই যাচ্ছে। শ্যামলের খুব রাগ হচ্ছিল। দিদিমণির কথা শুনতেই পাচ্ছে না! যা, যা - বলে সে কাকটাকে তাড়িয়ে দিল।

দিদিমণি কথা থামিয়ে বললেন — কী হলো শ্যামল ?

— দেখুন না দিদি, কাকটা এত বাজে। খালি ডেকেই যাচ্ছিল। আমি পড়া শুনতেই পাচ্ছি না। তাই তাড়িয়ে দিলাম।

— ঠিক আছে। কিন্তু কাক কি সত্যিই বাজে ?

রুকসানা বলে উঠল — শুধু বাজে নয় দিদি, খুব নোংরা স্বভাবের। যেখান সেখান থেকে নোংরা মুখে করে নিয়ে আসে।

প্রদীপ বলে উঠল — আগের দিন তারে আমার জামাকাপড় শুকোতে দেওয়া ছিল। একটা কাক কোথা থেকে মাংসের হাড়, রক্ত নিয়ে এসে আমার জামাকাপড়ে ফেলল।

দিদি জিজ্ঞেস করলেন — আচ্ছা বলো তো ওই মাংসের হাড় সে কোথা থেকে নিয়ে এসেছিল?

ঝিলাম বলল — কোথা থেকে আবার ? বাজারের মাংসের দোকানের সামনের নর্দমা থেকে মুখে করে এনেছে।

মোনালিসা বলল — কেন? এরকম বলছিস কেন? এই সেদিনই তো আমি রাস্তার ধারে নোংরা ছুঁড়ে ফেলেছিলাম । কোথা থেকে একটা কাক এসে নোংরাটা মুখে করে নিয়ে গেল।

দিদি বললেন — বাহ! আচ্ছা এবারে বলো তো প্রতিদিন সকালে ঘর ঝাঁট দেওয়া হয় কেন ?

আসমা বলল — সে তো ঘরের নোংরা পরিষ্কার করার জন্য দিদি।

— কাকও ঠিক একইভাবে এইসব নোংরা জিনিস খেয়ে আমাদের আশপাশ পরিষ্কার রাখে।

কুনাল বলে উঠল — জানি দিদি, ছোটোবেলায় পড়েছিলাম কাককে ঝাড়ুদার পাখি বলে।

দিদিমণি বললেন — আচ্ছা আমাদের আশেপাশে তো আরো নানারকম প্রাণীদের দেখতে পাই। ভেবে দেখো তো এরাও আমাদের পরিবেশকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে কিনা।

আমিনুল বলল — নালার ধারে আমি এক পাল শুয়োরদের চরতে দেখেছি দিদি। নোংরার মধ্যে কী যেন করছিল।

দিদিমণি বললেন — ঠিকই দেখেছ। ওরাও নোংরা খেয়ে আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখে।

আরো কয়েকটা প্রাণীর কথা ভাবার চেষ্টা করো, যারা আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।

প্রাণীর নাম	কীভাবে আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে
1. কাক	1.
2. শুয়োর	2.
3. শকুন	3.
4.	4.
5.	5.

পরিবহণে সাহায্য করে যেসব প্রাণী

রাবেয়া তিনদিন স্কুলে আসেনি। ক্লাসে দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন — কি রাবেয়া তুমি স্কুলে আসোনি কেন? শরীর খারাপ হয়েছিল?

রাবেয়া একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিল — না দিদি। শরীর খারাপ হয়নি। আসলে আমার ফুফুর বিয়ে ছিল। তাই গেছিলাম।

— তোমার মামার বাড়ি কোথায়?

— মুর্শিদাবাদে।

— কীভাবে গেলে?

— ট্রেনে।

রাতুল বলল — আমি তো আমার মামার বাড়িতে বাসে করে যাই।

করিম বলে উঠল — আমার মামার বাড়িতে যেতে হলে বাস তো লাগেই। বাস থেকে নেমে গোরুর গাড়ি করে যেতে হয়। তারপর আবার কিছুটা রাস্তা পায়ে হেঁটেও যেতে হয়। ওখানে আমি দেখেছি, গোরুর গাড়ি করে ক্ষেত থেকে ধান, নানাধরনের সবজিও বয়ে আনে।

কুসুম বলল — আমাদের এখানে তো সাইকেল-ভ্যানে করে ক্ষেত থেকে শাক-সবজি বয়ে আনে।

দিদি বললেন — বাহ! তোমরা তো তাহলে অনেক ধরনের পরিবহণের কথা জানো। আর অন্য কোনো ধরনের পরিবহনের কথা কেউ জানো কি ?

রাবেয়া বলে উঠল — জানেন দিদি, আমি না মামার বাড়িতে ঘোড়ায় টানা গাড়ি দেখেছি।

এবারে তোমরা তোমাদের দেখা এমন কিছু প্রাণীর কথা লেখার চেষ্টা করো তো যারা পরিবহনের কাজে সাহায্য করে।

প্রাণীর নাম	কীভাবে পরিবহণের কাজে সাহায্য করে	কোথায় দেখেছ
1. গোরু	1.	1.
2. ঘোড়া	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.

আচ্ছা তোমাদের এলাকার এমন কোনো প্রাণীর কথা কি তুমি জানো যারা আগে পরিবহণের কাজে সাহায্য করত কিন্তু এখন আর করে না। তাদের নাম লেখার চেষ্টা করো । প্রয়োজনে তোমার শিক্ষক/শিক্ষিকা বা বাড়ির বা পাড়ার বয়স্ক ব্যক্তিদের সাহায্য নিতে পারো।

প্রাণীর নাম	কীভাবে পরিবহণের কাজে সাহায্য করত	কতদিন আগের কথা	এর পরিবর্তে পরিবহণের কাজে এখন কী ব্যবহার করা হয়

চাষের কাজে সাহায্য করে যেসব প্রাণী

ওপরের ছবিগুলোর মধ্যে মিল কোথায়?

....

....

কমল আর ইসমাইল গল্প করছিল। ইসমাইলদের বাড়িতে কাল ট্র্যাক্টর এসেছে । ইসমাইলের বাবা কিনেছেন। চাষের কাজে ব্যবহার করার জন্য। কমল বলল — ভালোই হলো। তাহলে তো তোদের আর হাল-বলদ দিয়ে চাষের কাজ করতে হবে না।

এইসব কথার মাঝে স্যার ক্লাসে ঢুকলেন। ক্লাসে ঢুকতে ঢুকতে তিনি কমলের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন — তোমরা কি জানো যে চাষের কাজে লাঙল চষার হাড়ভাঙা খাটুনি কমানোর জন্য নানা প্রাণীদের কাজে লাগানো হতো। ফলে চাষের কাজ অনেক সহজ হয়ে উঠেছিল। এখন তো চাষের কাজে পশুদের জায়গা নিচ্ছে নানারকম যন্ত্রপাতি। এই যেমন ইসমাইলের বাবা ট্র্যাক্টর কিনেছেন।

তোমরা কোন কোন প্রাণীকে চাষের কাজে দেখেছ লেখার চেষ্টা করো তো।

প্রাণীর নাম	কোথায় দেখেছ	কীভাবে চাষের কাজে সাহায্য করে
1. গোরু	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.

আচ্ছা এবারে ভেবে দেখার চেষ্টা করত তোমাদের এলাকার এমন কোনো প্রাণীর কথা কি তুমি জানো যারা আগে চাষের কাজে সাহায্য করত কিন্তু এখন আর করে না। তাদের নাম লেখার চেষ্টা করো তো। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষক/শিক্ষিকা বা বাড়ির বা পাড়ার বয়স্ক ব্যক্তিদের সাহায্য নিতে পারো।

প্রাণীর নাম	কীভাবে চাষের কাজে সাহায্য করত	কতদিন আগের কথা	এর পরিবর্তে চাষের কাজে এখন কি ব্যবহার করা হয়

আমরা যেসব জীবাণুর ওপর ভরসা করি

দই তৈরি

তোমরা বাড়িতে মাকে বা অন্য আর কাউকে দই পাততে দেখেছ? মা বা অন্যরা দই পাতার সময় কী করেন, কখনও খেয়াল করে দেখেছ কি ? তাঁদের জিজ্ঞেস করে নীচে লেখার চেষ্টা করো। প্রয়োজনে তোমার পাড়ার মিষ্টির দোকানে গিয়েও কথা বলতে পারো।

দই পাতার জন্য কী কী করা হয় পরপর লেখো :

1.
2.
3.
4.

ল্যাকটোব্যাসিলাস
(অনেক গুণ বড়ো করে দেখানো)

দই পাতার জন্য যে জিনিসটা লাগবেই, সেটা তাহলে কী ? দইয়ের সাজা - অর্থাৎ আগে পেতে রাখা দইয়ের কিছুটা অংশ। কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছ, কী এমন আছে দইয়ের সাজায়, যে অল্প গরম দুধে মিশিয়ে রেখে দিলে দই পড়ে যায়, মানে দই জমে যায়!

ওই দইয়ের সাজায় আসলে আছে খালি চোখে দেখা যায় না এমন একধরনের অণুজীব বা জীবাণু। এই অণুজীবটার পোশাকি নাম হলো **ল্যাক্টোব্যাসিলাস**। এটা একধরনের ব্যাকটেরিয়া। এরাই দুধে একধরনের অ্যাসিড তৈরি করে। সেই অ্যাসিডটার নাম ল্যাকটিক অ্যাসিড। আরো নানান পরিবর্তন ঘটে দুধ দইতে পরিণত হয়।
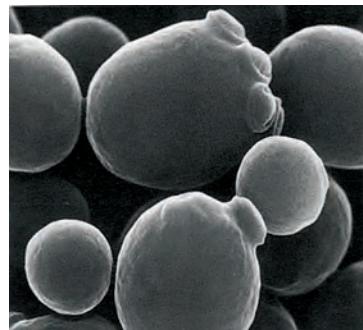
পাঁউরুটি তৈরি

দই তৈরির কথা তো জানলাম। পাঁউরুটি কীভাবে তৈরি হয় জানো কি? পাঁউরুটির গায়ে যে ফুটো ফুটো থাকে, সেগুলো কেন তৈরি হয় বলতে পারবে কি?

কী লাগে জানো পাঁউরুটি তৈরি করতে? ময়দা বা আটা আর জল। আর লাগে **ইস্ট**। ইস্ট হলো একধরনের এককোশী ছত্রাক। ময়দা বা আটায় থাকা শর্করাকে ইস্ট ভেঙে ফেলে। আর তৈরি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর অ্যালকোহল। ময়দা বা আটার মিশ্রণটাকে ফুলে ফেঁপে উঠতে সাহায্য করে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড। পরে ওই মিশ্রণ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে যায়। আর পাঁউরুটির গা ফুটো ফুটো হয়ে যায়।

ইস্ট
(অনেক গুণ বড়ো করে দেখানো)

ওষুধ তৈরি

স্ট্রেপ্টোমাইসেস
(অনেক গুণ বড়ো করে দেখানো)

বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া মানুষের দেহে রোগ সৃষ্টি করে। আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যাদের থেকে বিভিন্ন জীবাণুদের মেরে ফেলার ওষুধ তৈরি হয়। এদের থেকে ওষুধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পাওয়া যায়। **স্ট্রেপ্টোমাইসেস** হলো এমনই একধরনের ব্যাকটেরিয়া। স্ট্রেপ্টোমাইসেস ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন প্রজাতি থেকে প্রায় 50 টারও বেশি ব্যাকটেরিয়ানাশক, ছত্রাকনাশক আর পরজীবীনাশক ওষুধ পাওয়া যায়। স্ট্রেপ্টোমাইসিন, এরিথ্রোমাইসিন হলো স্ট্রেপ্টোমাইসেস থেকে পাওয়া এরকমই কয়েকটা ওষুধ যা আমাদের শরীরে ঢুকে পড়া জীবাণুদের মেরে ফেলে।

2 আমাদের চারপাশের ঘটনাসমূহ

প্রতিদিন আমাদের চারিদিকে নানা ঘটনা ঘটতে দেখি আমরা। এই সমস্ত ঘটনায় কোনো পদার্থের বা বস্তুর পরিবর্তন স্থায়ীভাবে ঘটে যায় অথবা ঘটে না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কোনো জায়গার আবহাওয়া ক্রমশ পালটে যেতে দেখি আমরা; পরের দিনটা শুরু হয় কি একইভাবে? হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। কাঠ জ্বালিয়ে রান্না করার সময় কাঠ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু ইলেকট্রিকের বালব জ্বালিয়ে যদি পরে নিভিয়ে দেওয়া হয়, বালব কি পালটে যায়?

এরকম আরও ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে যেগুলো একবার ঘটে গেলে আর আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া যায় না, অথবা ফেরত যাওয়া যায়।

একমুখী, উভমুখী

করে দেখো

সাবধানে একটা প্লাস্টিকের বা কাঠের হাতল যুক্ত স্টিলের চামচে কিছুটা মোম নিয়ে গরম করো, তারপর ঠান্ডা করো। অন্য একটা ওইরকম চামচে কিছুটা চিনি নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গরম করো। ঠান্ডা করার পর তোমার অভিজ্ঞতা লেখো।
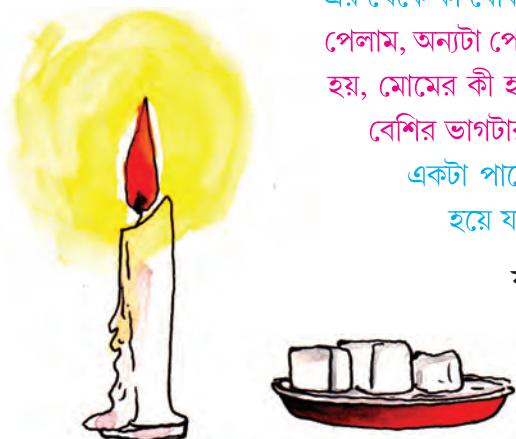
	কী করলে	কী দেখতে পেলে
প্রথম চামচে		
দ্বিতীয় চামচে		

চিনির স্বাদ কেমন আমরা সবাই জানি। চিনি খুব গরম করে যেটা পাওয়া গেল সেটা কি একই জিনিস, না রং-টা একটু পালটে গেল? একটু স্বাদ নিয়ে দেখো আগের মতোই মিষ্টি কিনা? কিন্তু মোম গরম করে ঠান্ডা করতেই আবার আগের অবস্থাতেই ফিরে গেল।

এর থেকে কী বোঝা গেল? দুটো জিনিসই গরম করা হলো; একটা আগের অবস্থাতেই ফেরত পেলাম, অন্যটা পেলাম না। কিন্তু একই মোম দিয়ে তৈরি একটা মোমবাতি যদি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, মোমের কী হয় বলো তো? কিছুটা গলে পড়ে, আবার ঠান্ডা হয়ে শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু বেশির ভাগটার কী হয়? পুড়ে যায়। এই পুড়ে যাওয়া অংশটা আর ফিরে পাওয়া যায় না।

একটা পাত্রে কিছুটা বরফ রেখে দিলে দেখবে সাধারণ তাপমাত্রাতেই তা গলে জল হয়ে যায়। সেই বরফগলা জলকে ঠান্ডা করলে আবার বরফে ফিরে যাওয়া যায়।

যখন শিলাবৃষ্টি হয়, টুকরো টুকরো বরফ কুড়িয়ে তোমরা হাতের মুঠোয় চেপে ধরো, তাই না? তারপর কী হয়? বরফের কুচিগুলো জুড়ে একটা বড়ো খণ্ড হয়ে যায়। হাত থেকে ফেলে দিলে বড়ো খণ্ডটার কী হবে? আবার ছোটো ছোটো টুকরো হয়ে যাবে।

কয়েকটা ঘটনার কথা নীচে দেওয়া হলো। তোমাদের জানা আরও ঘটনার কথা তালিকায় যোগ করো।

কী ঘটনা ঘটল	আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া যায়, না যায় না
ক) গরমকালের রোদে রাস্তার পিচ গলে গেল	
খ) চাল ফুটিয়ে ভাত রান্না করা হলো	
গ) খাবার খেয়ে হজম হয়ে গেল	
ঘ)	
ঙ)	
চ)	

তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের চারদিকে বহু ঘটনা ঘটে; যেগুলো একবার ঘটলে আর উলটোদিকে ফিরে যাওয়া যায় না। এগুলো একমুখী। আবার কিছু ঘটনা যে পদার্থে বা বস্তুতে ঘটছে তাদের আবার আগের অবস্থায় ফিরে পাওয়া যায়, এই ঘটনাগুলো উভমুখী।

নীচের ছবিতে যে ঘটনাগুলো ঘটতে দেখছ, সেগুলো কী ঘটনা? সেগুলো একমুখী না উভমুখী?

কী ঘটনা ঘটতে দেখছ	একমুখী না উভমুখী
(ক)	
(খ)	
(গ)	
(ঘ)	

1. ওপরের ছবিতে তুমি কোনো ঘটনা চক্রাকারে ঘটতে দেখছ কি? নিজের ভাষায় ঘটনাটা লেখো।

   ....।

2. তোমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে চক্রাকারে ঘটে এরকম আরও দুটো ঘটনার কথা লেখো।

   ....।

পর্যাবৃত্ত, অপর্যাবৃত্ত

আমাদের বাড়িতে যে দেয়াল ঘড়ি লাগানো থাকে সেটার কথা ভাবো। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে লেখো :

এই ঘড়িগুলোতে কটা কাঁটা থাকে? ....।

কোন কাঁটাটা আমাদের কী দেখায়? ....।

কটার সময় ঘড়ির কাঁটাদুটো একই সরলরেখায় আসে, আর কটার সময় তারা একসঙ্গে মিশে যায়?...........................।

কতক্ষণ পরে আবার একই ঘটনা ঘটতে দেখো? ....।
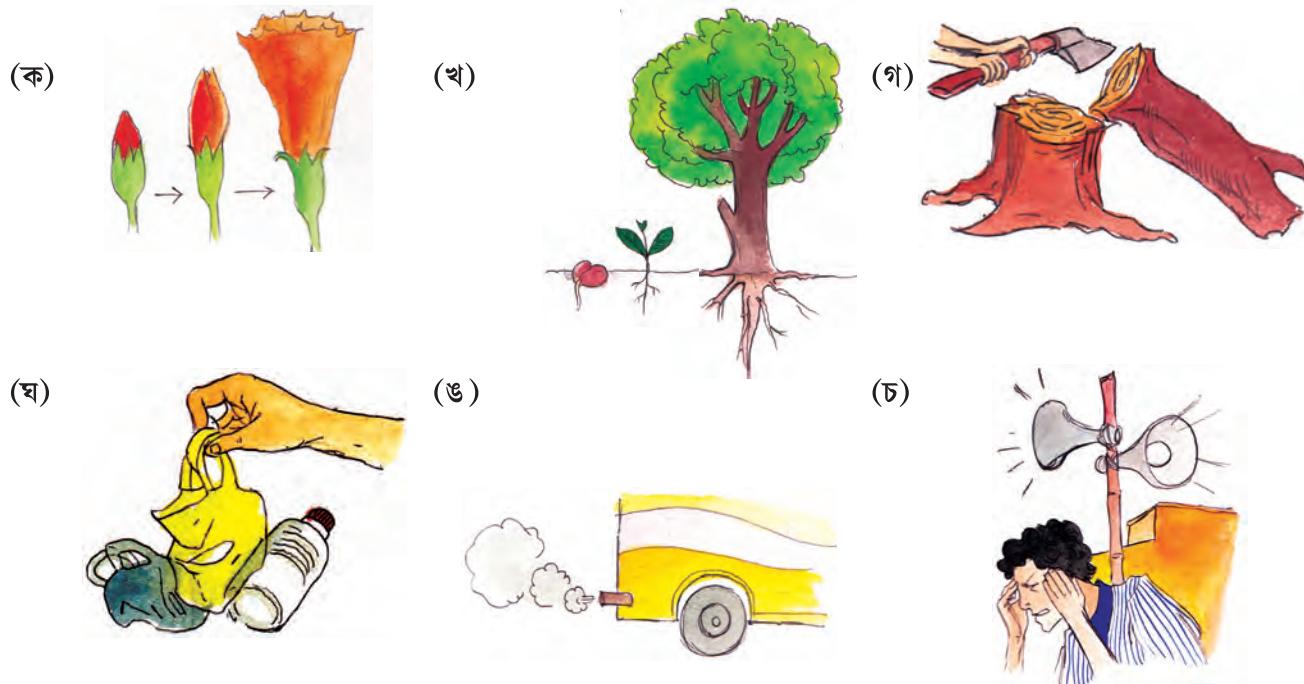
এরকম একটা নির্দিষ্ট সময় পরে পরে যে ঘটনা পুনরায় ঘটে, তাকে বলে পর্যাবৃত্ত ঘটনা। আর যে ঘটনাগুলো কোনো সময়ের নিয়মে ঘটে না তাদের অপর্যাবৃত্ত ঘটনা বলে। এই যে তোমরা প্রতিদিন দিন থেকে রাত, আবার রাত থেকে দিন হতে দেখছ — এটা একটা পর্যাবৃত্ত ঘটনা। আবার কোনো জায়গায় একদিন ঝড় হলো বা, কোনো একবছর বন্যা হলো — এগুলো অপর্যাবৃত্ত ঘটনা।

নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে অথবা বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের ছকে এরকম আরও ঘটনার কথা যোগ করো যেগুলো পর্যাবৃত্ত বা অপর্যাবৃত্ত :

কী ঘটনা	পর্যাবৃত্ত না অপর্যাবৃত্ত ও কেন?
1. সিলিং ফ্যান বা টেবিল ফ্যানের ব্লেডের ঘোরা	
2. রাস্তায় গাড়ির আসা-যাওয়া	
3. গাছের পাতা ঝরে পড়া	
4. জোয়ারভাটা	
5. সাপের খোলস ত্যাগ	
6. সুনামি	
7. লিপইয়ার	
8. সমুদ্রের জলের ঢেউ	
9. স্কুলের বিভিন্ন বিষয়ের পিরিয়ড	
10. আকাশে ধূমকেতু দেখতে পাওয়া	
11.	
12.	

অভিপ্রেত, অনভিপ্রেত

নীচে কয়েকটা ঘটনার ছবি দেওয়া হলো। একটু ভেবে বলো তো কোনগুলো প্রকৃতির নিয়মে বা স্বাভাবিকভাবে ঘটছে, আর কোনগুলো সেরকম নয় বলে আমাদের ক্ষতি করছে।

যে ঘটনাগুলো প্রকৃতির বা মানুষের ক্ষতি করে না সেগুলো আমাদের অভিপ্রেত, কিন্তু যেগুলো প্রকৃতি বা মানুষের ক্ষতি করে সেগুলো কী? সেগুলো আমাদের অনভিপ্রেত।

যা যা ঘটতে দেখছ	আমাদের অভিপ্রেত না অনভিপ্রেত
(ক)	
(খ)	
(গ)	
(ঘ)	
(ঙ)	
(চ)	

প্রাকৃতিক, মনুষ্যসৃষ্ট

আগের পৃষ্ঠায় যে ঘটনাগুলোর ছবি দেওয়া হয়েছে সেগুলোর সবই কি প্রকৃতিতে নিজে থেকেই ঘটছে? তা নয়। কিছু ঘটনা মানুষ ঘটিয়েছে। এধরনের ঘটনাগুলোকে বলা হয় মনুষ্যসৃষ্ট। অন্য ঘটনাগুলো কী ধরনের? সেগুলো প্রাকৃতিক ঘটনা।

প্রকৃতিতে যেমন কখনো-কখনো আপনা থেকেই আগুন লেগে যেতে পারে তেমনি মানুষ তাদের প্রয়োজনেই আগুন জ্বালিয়ে থাকে। নীচে যে যে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট ঘটনাগুলোর কথা দেওয়া হলো সেগুলো কীভাবে ঘটতে পারে তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

ঘটনা	প্রাকৃতিক		মনুষ্যসৃষ্ট	
	কী ঘটনা	কীভাবে ঘটা সম্ভব	কী ঘটনা	কীভাবে ঘটা সম্ভব
আগুন জ্বলা	কখনো কখনো বনের গাছে আগুন লেগে যায় যাকে দাবানল বলে	শুকনো ডালে ঘষা লেগে	আমরা রান্না করার সময় আগুন জ্বালাই	মানুষের অসাবধানতার জন্য
বন্যা	হঠাৎ হওয়া অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য	নদীখাতের জলধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়া	বাঁধের জমা জল ছেড়ে দেওয়ার ফলে	বাঁধ বাঁচাতে জল ছেড়ে দেওয়া
বনের পশুর মৃত্যু	স্বাভাবিক মৃত্যু		চোরাশিকারিদের হাতে মৃত্যু	
ক্ষতিকারক পোকা-মাকড়ের বিনাশ	ব্যাং বা পাখি ফসলের পক্ষে ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় খেয়ে নেয়		কীটনাশক ছড়িয়ে এরকম পোকামাকড় মারা হয়	

যে ঘটনাগুলো প্রকৃতিতে নিজে থেকেই ঘটে, যেখানে মানুষের কোনো হাত নেই — সেগুলোই প্রাকৃতিক ঘটনা।

এরকম কিছু ঘটনার উদাহরণ দেওয়া আছে। তোমরা স্কুলের বা বাড়ির চারপাশে দেখতে পাও, এরকম কিছু কিছু ঘটনার কথা তালিকায় লেখো যেগুলো একইরকম হতে পারে।

আমরা কী ঘটতে দেখি	অভিপ্রেত না অনভিপ্রেত	প্রাকৃতিক না মনুষ্যসৃষ্ট
(ক) মুরগির ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়া		
(খ) উনুন জ্বালিয়ে রান্না করা		
(গ) ভূমিকম্প		
(ঘ)		
(ঙ)		
(চ)		

কর্মপত্র

(ক) আমাদের শরীরে খাদ্যের কী পরিণতি হয় তা আমরা আগেই জেনেছি। বলো তো এটা কী ধরনের পরিবর্তন?

....

(খ) যতদিন যাচ্ছে তত লোকসংখ্যা বাড়ছে আর দরকার পড়ছে আরো বেশি খাদ্যের। বেশি খাদ্য উৎপন্ন করার জন্য কী করা হচ্ছে, আর তার ফলে কী ঘটতে পারে তা নীচের ছবি দেখে বুঝতে পারছ কি?

ছবি 1 ছবি 2

কোন ছবিতে	কী ব্যবহার করা হচ্ছে	কী কারণে এদের ব্যবহার প্রয়োজন হয়	দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে কী কী ফলাফল হতে পারে
ছবি 1	কীটনাশক		
ছবি 2	সার ও কীটনাশক		

(গ) যতটা রাসায়নিক ব্যবহার করা হলো, তার কি সবটাই কাজে লেগে গেল? যদি না যায়, তাহলে বাকি অংশটা কোথায় গেল বলে তোমার মনে হয়? ....

(ঘ) এই সকল রাসায়নিকের কী ধরনের প্রভাব পরিবেশের উপর পড়ে, এসো দেখা যাক। তোমার বাড়ির বা আশেপাশের বয়স্কদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করো : তাঁরা যখন তোমাদের মতো ছোটো ছিলেন, তখন চাষের জমি থেকে বর্ষাকালে কী কী মাছ পাওয়া যেত? আর এখন ওই সব মাছ কি সেখানে পাওয়া যায়?
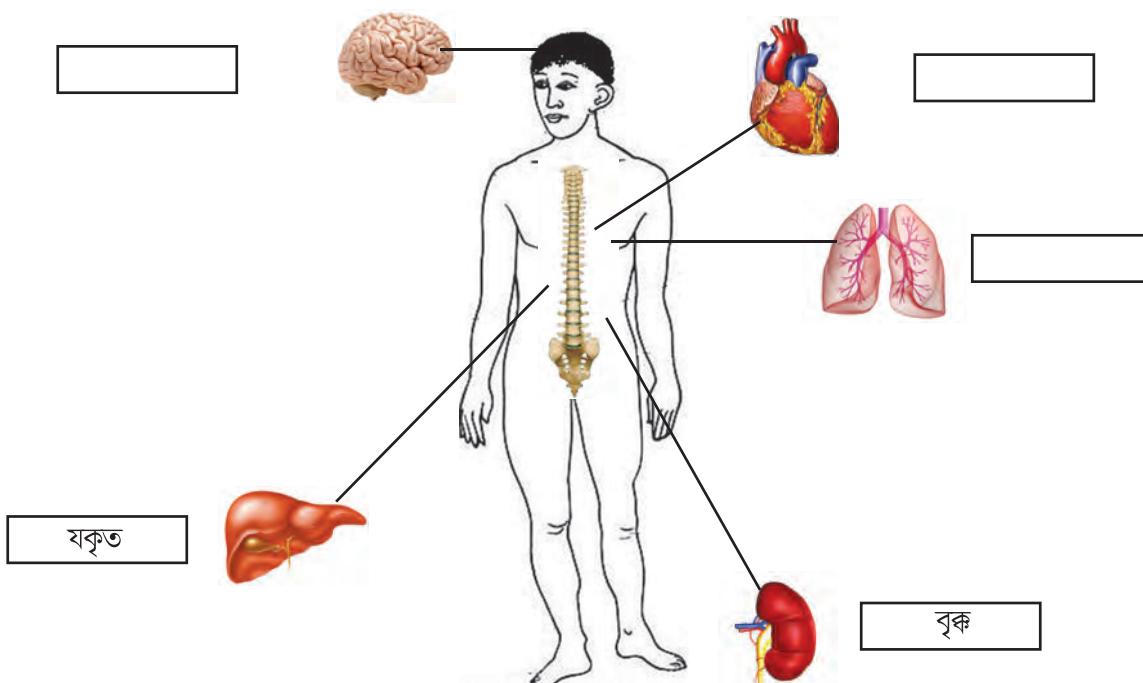
আগে যেসব মাছ চাষের ক্ষেতে পাওয়া যেত তাদের নাম	এখন সেইসব মাছের কোনগুলো সেখানে আর পাওয়া যায় না তাদের নাম

(ঙ) রাসায়নিক কীটনাশক ও সার মাছের দেহে প্রবেশ করলে নানা ধরনের বিষক্রিয়া দেখা যায়। এইধরনের মাছকে যারা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদের দেহেও একই ধরনের বা ভিন্ন ধরনের বিষক্রিয়া দেখা যেতে পারে। এই ধরনের কোনো বিষক্রিয়ার কথা তোমার বা স্থানীয় মানুষদের জানা থাকলে তা লেখো। ....।

(চ) আরো দুটো উৎসের কথা লিখতে পারো কি, যেখান থেকে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ জলে মিশে যেতে পারে?
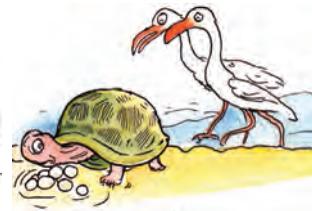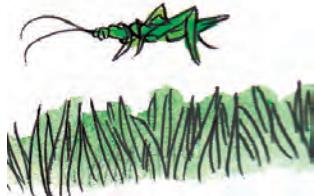
1. .... 2. ....

(ছ) ওই ধরনের মাছ খাওয়ার পর মানুষের দেহেও মাছের দেহ থেকে বিষ প্রবেশ করে এবং দেহের নানা অঙ্গে (যকৃত, বৃক্ক, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি) জমা হয়। এই রাসায়নিকগুলো কিন্তু অনেকদিন থেকে যেতে পারে। দেহের মধ্যে তাদের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে অথবা অন্যভাবে এই রাসায়নিকগুলো আমাদের বা অন্য প্রাণীদের শরীরে ঢুকে পড়ে। এর জন্য মানুষের দেহে নানা ক্ষতিকারক প্রভাব পড়তে পারে। নীচের ছবিতে এই অঙ্গগুলো চিহ্নিত করো।

নীচের সারণিতে কয়েকটা রাসায়নিক পদার্থের নাম দেওয়া হলো। এর কোনগুলো রাসায়নিক সার ও কোনগুলো কীটনাশক তা চিনে নাও।

রাসায়নিক পদার্থের নাম	কোন কাজে ব্যবহৃত হয়
ইউরিয়া	রাসায়নিক সার
ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট	রাসায়নিক সার
কার্বারিল	রাসায়নিক কীটনাশক
ম্যালাথিয়ন	রাসায়নিক কীটনাশক

ওপরের প্রথম ছবিতে কীটনাশক স্প্রে করার পর তার প্রভাব পরিবেশের অন্যান্য কোন কোন জীবের ওপর পড়তে পারে তা অন্য ছবিগুলো দেখে লেখো।

....।

মন্থর ও দ্রুত ঘটনা

তুমি একটা বাটিতে জলের মধ্যে ছোলা ভিজিয়ে রাখলে, সঙ্গে সঙ্গেই কি ছোলার অঙ্কুর বেরোয়? বেরোয় না। তোমার বাবা বাজার থেকে চাল কিনে আনলেন। এই চাল কীভাবে পাওয়া যায় সংক্ষেপে তার ধাপগুলো নীচে দেখানো হলো।

(i) বীজধান থেকে চারাগাছ তৈরি করা হয়েছে, যাকে বলে বীজতলা

(ii) এই ধানের চারাগাছ জমিতে রোয়া হয়েছে

(iii) ধানগাছ বড়ো হয়েছে

(iv) সেই গাছে ফুল এসেছে

(v) তা থেকে ধান ফলেছে

(vi) সেই ধান পুরুষ্টু হয়ে পেকেছে

(vii) পাকা ধান ঝাড়া হয়েছে

(viii) তা থেকে চাল বের করা হয়েছে — ঢেঁকিতে বা মেশিনে

(ix) সেই চাল বস্তাবন্দি হয়েছে

(x) চালের বস্তা বাজারে এসেছে

তারপরেই তোমার বাবা চাল কিনতে পেরেছেন। ভেবে দেখত কত সময় লেগেছে এর জন্য!
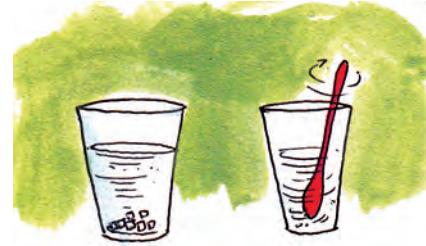
ধান না হয় বছরে একবার বা দু-বার ফলে। কিন্তু একটা আমগাছের চারা থেকে কি এত সহজেই আম পাওয়া যায়? আন্দাজ করত কত সময় লাগতে পারে। একটা নারকেলগাছের চারা থেকে কী একই সময়ে নারকেল পাওয়া যায়?

আবার, চাল ফুটিয়ে যে ভাত হলো সেটা তুমি খেলে। খাবার সঙ্গে সঙ্গেই কি শক্তি পেলে? খাবার হজম হয়ে পেশিতে শক্তি পেতে বেশ কয়েক ঘন্টা সময় লাগে।

তাহলে ভেবে দেখো, যে কয়লার ভাণ্ডার আমরা বিভিন্ন কাজে জ্বালিয়ে শেষ করে ফেলেছি; সেটা তৈরি হতে কত লক্ষ বছর সময় লেগেছিল? এটা তাহলে দ্রুত না মন্থর ঘটনা, কী মনে হয়? মাটি থেকে ইট তৈরি হয় এটা তোমরা জানো; আর সেই ইট-সিমেন্ট-বালি দিয়ে গেঁথে বাড়ি তৈরি হয়। বাড়ি তৈরি হতে সময় লাগে। একবার ভাবো, যে মাটি থেকে ইট তৈরি হলো, বড়ো পাথর গুঁড়ো হয়ে ছোটো পাথর, তা থেকে বালি, তার থেকে মাটি তৈরি হওয়া কত সুদীর্ঘ সময়ের ঘটনা। আবার সিমেন্ট তৈরির সময় যে জিপসাম বা অন্য খনিজের গুঁড়ো ব্যবহার হচ্ছে, সেই খনিজের ভাণ্ডার তৈরি হতে কত লক্ষ বছর সময় লেগেছে?

প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তোমরা নিজেরাই দেখেছ যে ভিজে জামাকাপড় জড়ো করে রাখলে শুকোতে দেরি হয়। কিন্তু একই জামাকাপড় ছড়িয়ে শুকোতে দিলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। যে ঘটনা তাড়াতাড়ি ঘটে সেটা দ্রুত, আর যে ঘটনা ঘটতে বেশি সময় লাগে অর্থাৎ ধীরে ধীরে হয় সেটা মন্থর ঘটনা।

নিজেদের কাজের অভিজ্ঞতা থেকেই তোমরা বোঝো যে একগ্লাস জলে এক চামচ চিনি শুধুমাত্র ফেলে দিলে মিশতে দেরি হয়। কিন্তু ওই গ্লাসের মধ্যে একটা চামচ দিয়ে নাড়লে, একই ঘটনা তাড়াতাড়ি হয়।

করে দেখো

(ক) একটা পাত্রে কিছুটা পাথুরে চুন রেখে তার মধ্যে সাবধানে কিছুটা জল ঢালো, কী দেখতে পেলে?

....।

(খ) থিতিয়ে পড়ার পর কিছুটা পরিষ্কার চুনজল খোলা বাতাসে কয়েকদিন রেখে দিলে কী দেখতে পাও লেখো।

....।

(গ) অন্য পাত্রে কিছুটা পরিষ্কার চুনজল নিয়ে একটা খড়ের টুকরো বা কোল্ড ড্রিঙ্ক খাবার 'স্ট্র' দিয়ে জলের মধ্যে ফুঁ দাও। কী দেখলে বলো তো?

....।

(ঘ) আগের মতো একই ঘটনা পরেরটাতেও কি ঘটল? যদি ঘটে থাকে কোন ক্ষেত্রে বেশি সময় লাগছে?

....।

(ঙ) ফুঁ দিলে নিঃশ্বাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চুনজলের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বিক্রিয়া করে। খোলা হাওয়ায় যা ঘটতে দেরি হয়। (চুনজল ব্যবহারের সময় সাবধান থাকবে যাতে চোখে না পড়ে।)

ওপরের আলোচনা থেকে কোন ঘটনাগুলো দ্রুত, আর কোনগুলো মন্থর — নিশ্চয় বুঝতে পারলে।

ভেবে দেখো : একটা চককে ক্রমশ ভাঙলে কী দেখা যাবে বলো তো? — দেখা যাবে যে চকের উপরিতলে আরো খানিকটা জায়গা দেখা যাচ্ছে। আমরা বলতে পারি যে বড়ো চকটা ভাঙবার ফলে টুকরোগুলোর উপরিতলের ক্ষেত্রফল বেড়ে গেছে। নীচের ছবিতে বেড়ে যাওয়া ক্ষেত্রফলকে ◯ দিয়ে বোঝানো হলো।
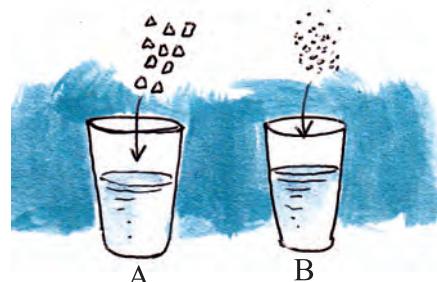
বাড়িতে বা স্কুলে মিড-ডে মিল রান্না করার সময় তোমরা দেখো তরিতরকারি ছোটো ছোটো টুকরো করে কাটা হয়। গোটা অবস্থাতেই তো সেগুলো সিদ্ধ করা যেতে পারে। তাহলে এটা করা হয় কেন? সবজিকে ছোটো ছোটো টুকরো করলে টুকরোগুলোর মোট ক্ষেত্রফল বেশি হওয়ার জন্যই তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়। আবার খাবার ভালো করে চিবিয়ে আরও ছোটো টুকরো করে ফেললে আমাদের পাকস্থলীরও সেগুলো হজম করতে কম সময় লাগে। কীটনাশক বা ছত্রাকনাশকের কাজ দ্রুত করার জন্যই তা স্প্রে করা হয়। স্প্রে করলে তরলের ফোঁটা অনেক ছোটো ছোটো ফোঁটায় ভেঙে যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থকে গুঁড়ো করে নিলে কিংবা দ্রবণ তৈরি করে নিলে তারা তাড়াতাড়ি রাসায়নিক বিক্রিয়া করার সুযোগ পায়।

করে দেখো

বাড়িতে বাথরুম পরিষ্কারের জন্য যে অ্যাসিড ব্যবহৃত হয় তার একটা পাতলা জলীয় দ্রবণ সাবধানে তৈরি করো যেন চোখে বা চামড়ায় না পড়ে। এই দ্রবণটাকে দুটো অংশে ভাগ করে দুটো ছোটো কাচের গ্লাসে (A ও B) রাখো। একটা গ্লাসে মার্বেল পাথরের টুকরো দাও, অন্যটায় তার কিছুটা গুঁড়ো দাও।

কোন গ্লাসে কী দেখতে পাচ্ছ	কেন এমন হচ্ছে বলে মনে হয়
A গ্লাসে:	
B গ্লাসে:	

A B

নিজেরা আলোচনা করে তোমাদের দেখা আরও দ্রুত ও মন্থর ঘটনার কথা যোগ করো।

কী দেখলে	দ্রুত না মন্থর
(ক) শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হলো	
(খ) ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ হলো	
(গ) আমগাছের মুকুল থেকে আম হলো	
(ঘ) ফুটন্ত দুধে লেবুর রস মিশিয়ে ছানা কাটানো হলো	
(ঙ)	

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য

করে দেখো

একটা কাগজের টুকরো নাও। নীচের ধাপগুলো অনুসরণ করে কাজটা করতে থাকো ও নিজে কী দেখছ লেখো :

(ক) কাগজের টুকরোটাকে চারটে ভাগে ভাগ করে ফেলো। কী পেলে? ....

(খ) কাগজের টুকরোগুলো কেমন দেখতে হয়েছে? ....

(গ) যে-কোনো একটা টুকরোতে সাবধানে আগুন ধরিয়ে দাও। কী দেখলে? ....

(ঘ) এখন কাগজটার কী পরিবর্তন হলো? ....

(ঙ) কাগজ থেকে যে ছাই পেয়েছ, তা থেকে কী আবার কাগজে ফিরে যাওয়া যাবে বলে তোমার মনে হয়?

....

তাহলে এক্ষেত্রে মূল পদার্থে ফিরে যাওয়া যায়/যায় না (সঠিক উত্তরটা বেছে নাও)।

একটু ভেবে দেখত, এরকম ঘটনা কী তোমরা ঘটতে দেখো যেখানে মূল পদার্থটা একই থেকে যায়? আবার কোনো ক্ষেত্রে মূল পদার্থটা পালটে নতুন পদার্থ পাওয়া যায়। যে ঘটনায় মূল পদার্থটা ফিরে পাওয়া যায় সেটা ভৌত পরিবর্তন; আর যেক্ষেত্রে তার মূল গঠন ও ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য পালটে যায় সেটা রাসায়নিক পরিবর্তন।

করে দেখো

(ক) বাড়িতে যখন জল ফুটিয়ে রান্না করা হয়, সেই পাত্রের ঠিক ওপরে একটা হাতল আছে এমন পাত্র সাবধানে ধরো।

কী দেখলে লেখো : ....।

কেন এমন হলো? ....।

(খ) পড়ে থাকা পুরোনো লোহার জিনিসের ওপরের দিকটা কেমন দেখতে হয় বলত? .... মতো রঙের একটা .... পড়ে যায় লোহার ওপর।

এরকম একটা লোহার জিনিস থেকে ওপরের অংশটা (যেন লোহা উঠে না আসে) ছাড়িয়ে নাও।

কয়েকটা নতুন লোহার ছোটো পেরেক বা আলপিনের কাছে একটা চুম্বক নিয়ে যাও। কী দেখতে পেলে? ....।

এবার পুরোনো লোহার জিনিস থেকে যে অংশটা সহজেই খসে পড়েছিল, তার কাছে চুম্বকটা নিয়ে যাও। এখন কী দেখতে পেলে? ....।
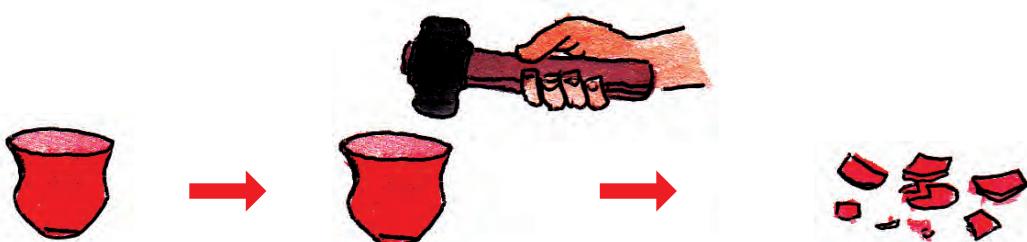
লোহার সঙ্গে লোহার এই পালটে যাওয়া রূপের (মরচে) কোনো তফাত লক্ষ করলে কি?...।

এরকমই বিভিন্ন ঘটনা থেকে ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলো তোমরা লক্ষ করে থাকবে। একটা তুলনামূলক আলোচনা থেকে এবিষয়ে তোমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হয় কিনা দেখো।

ভৌত পরিবর্তন	রাসায়নিক পরিবর্তন
i. জল ফুটে .... পরিণত হয় এটা একধরনের .... ।	i. জলে চাল ফুটিয়ে .... রান্না করা হয়। এটা একধরনের .... ।
ii. জল থেকে .... হলে জলের .... কোনো পরিবর্তন হয় না।	ii. চাল থেকে .... হয়ে গেলে, ... এর .... পরিবর্তন হয়ে যায়।
iii. জলীয় বাষ্পকে............ করলে আবার জল ফিরে পাওয়া যায়।	iii. ভাত থেকে কোনোভাবেই আর .... এ ফেরত যাওয়া ....।
iv. তাহলে এই ধরনের পরিবর্তনের কারণটা সরিয়ে নিলেই মূল পদার্থ ফিরে ....।	iv. .... পরিবর্তনের .... সরিয়ে নিলে ....।
v. ভৌত পরিবর্তন উভমুখী ঘটনা।	v. রাসায়নিক পরিবর্তন সাধারণত একমুখী ঘটনা।

নীচের ছবিটা দেখে বলতে পারো এটা কী ধরনের পরিবর্তন? একমুখী না উভমুখী?

আমাদের চেনা-জানা কয়েকটা ঘটনার কথা নীচে দেওয়া হলো। বলতে পারো কোনটা কোন ধরনের পরিবর্তন?

বরফ গলে জল হওয়া, কাঠ পুড়িয়ে আগুন জ্বালানো, লোহা থেকে চুম্বক তৈরি, বালব জ্বালানো, দুধ থেকে দই তৈরি, কালো চুল পেকে সাদা হওয়া, লোহায় মরচে পড়া, খাদ্যনালীতে খাবার হজম করা, গাছের পাতার রং পালটে যাওয়া, কর্পূরের উবে যাওয়া।

কোনটা ভৌত পরিবর্তন	কোনটা রাসায়নিক পরিবর্তন
লোহা থেকে চুম্বক তৈরি	গাছের পাতার রং পালটে যাওয়া

ভেবে দেখো

জল থেকে বাষ্প হওয়া, জলের মধ্যে চিনি বা নুন গুলে যাওয়া, লোহা বা অন্য ধাতুকে গরম করা — এগুলো সবই উভমুখী ভৌত পরিবর্তন। কিন্তু কাচের তৈরি জিনিস ভেঙে টুকরো হয়ে গেল, গম থেকে আটা তৈরি হলো — এগুলো একমুখী ভৌত পরিবর্তন।

করে দেখো

ধরো, তোমাকে একটা পাত্রে কিছুটা ছেঁকে নেওয়া লেবুর রস ও অন্য পাত্রে পরিষ্কার চুনজল দেওয়া হলো। এসো এদের নিয়ে একটা পরীক্ষা করা যাক।

কয়েকটা সরু সরু ফিলটার কাগজের টুকরো নাও। এবার একটা পাত্রে জলের মধ্যে কিছুটা হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে একটা লেই তৈরি করো। সেই লেইয়ের মধ্যে কয়েকটা ফিলটার কাগজের টুকরো ডুবিয়ে নিয়ে রোদে শুকিয়ে নাও। অন্য একটা পাত্রে কিছুটা বিটের রস নিয়ে তারমধ্যে একইভাবে ফিলটার কাগজের টুকরো ডোবাও ও শুকিয়ে নাও। এই কাগজগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে তুমি চুনজলে ডোবাও। আর তুলে দেখো তাদের রং-এর কোনো পরিবর্তন হলো কিনা। এবার ওই কাগজগুলোতে ফোঁটা ফোঁটা করে লেবুর রস দিতে থাকো। কোনো পরিবর্তন দেখতে পেলে কি? যা দেখলে তা নিচের সারণিতে লেখো।

কোন কাগজের রং	চুনজলে	লেবুর রস দেবার পর
হলুদ লাগানো কাগজের রং		
বিটের রস লাগানো কাগজের রং		

চুনজল বা লেবুর রসে সংস্পর্শে এই রং বদলানো রাসায়নিক পরিবর্তন। তাহলে দেখা গেল যে রাসায়নিক পরিবর্তনে পদার্থের রং পালটে যেতে পারে। হলুদ ও বিটের মধ্যে থাকা কিছু রাসায়নিক পদার্থ চুনজলের সঙ্গে রাসায়নিক পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করায় এই ঘটনা ঘটে।

পরিবর্তন ও শক্তি

আমরা সকলেই জানলাম যে জলে চাল ফুটিয়ে ভাত রান্না করা হয়, এটা একটা রাসায়নিক পরিবর্তন। কিন্তু জলে যদি তাপ না দেওয়া হতো তাহলে কি ভাত তৈরি হতো? তাহলে চাল থেকে ভাত হওয়া একটা রাসায়নিক পরিবর্তনের ঘটনা যেখানে তাপের দরকার হয়। আবার তোমরা দেখেছ ঘরের তাপমাত্রাতেই জামাকাপড়ে দেবার ন্যাপথালিনের গুলি আস্তে আস্তে ছোটো হয়ে যায়। অর্থাৎ সাধারণ তাপেই ন্যাপথালিন উবে যায়। কিন্তু খোলা জায়গায় না রেখে একটা ঢাকা পাত্রে যদি ন্যাপথালিনকে তাপ দেওয়া হতো, তাহলে কী হতো? ন্যাপথালিন আরো তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যেত ঠিকই, কিন্তু পাত্রের ওপর দিকের ঠান্ডা অংশে আবার তা কঠিন অবস্থায় জমতে দেখা যেত। তাহলে বন্ধ পাত্রে ন্যাপথালিনের বাষ্প হওয়া কী ধরনের পরিবর্তন? এটা একটা ভৌত পরিবর্তন।

খোলা হাওয়ায় কাঠ পড়ে আছে, অক্সিজেনও আছে। কই আগুন তো জ্বলে উঠছে না? তার জন্য কাঠে তাপ দেবার দরকার হয়। আবার কাঠ পুড়ে তাপ তৈরি হয়, পড়ে থাকে ছাই। এটা কী ধরনের পরিবর্তন?

— পুড়ে যাওয়া হলো রাসায়নিক পরিবর্তন যেখানে তাপ উৎপন্ন হয়। কাঠ অক্সিজেনে পুড়ে তাপ উৎপন্ন করে। খাবার হজম হয়ে যে সরল যৌগ তৈরি হয় সেগুলো আমাদের শরীরের মধ্যে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে শক্তি তৈরি করে। তাহলে দেখো আমাদের দেহের মধ্যেও অক্সিজেনের সাহায্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এক মগ জলে একটু গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে জল মেশালে কী হবে? অ্যাসিডের দ্রবণ তৈরি হবে, সেইসঙ্গে অনেক তাপও। এটা একটা রাসায়নিক পরিবর্তনের ঘটনা যেখানে তাপ উৎপন্ন হয়।

তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কয়েকটা ঘটনার কথা বলত যেখানে শক্তি লাগে অথবা শক্তি পাওয়া যায়।

(ক) ....

(খ) ....

(গ) ....

তাপ ছাড়া কি অন্য শক্তির দ্বারা কোনো পরিবর্তন ঘটে না? তোমরা অনেকেই বাজ পড়তে দেখেছ বা শুনেছ। বাজের প্রভাবে কত কী যে ঘটতে পারে তা জানো? — তার আগুনে গাছ পুড়ে যেতে পারে, গাছে বাস করা পশু-পাখি মরে যেতে পারে, তার শব্দে কী হতে পারে? তোমাদের বাড়ির জানালার কাচ ভেঙে যেতে পারে। কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়লে তার বিদ্যুতের প্রচণ্ড প্রভাবে বাড়ির বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলো যেমন — পাখা, টিভি, ফ্রিজ খারাপ হয়ে যেতে পারে।

অন্যান্য কী শক্তির দ্বারা কেমন পরিবর্তন ঘটে দেখত বুঝতে পারো কিনা?

কর্মপত্র

গাছের সবুজ অংশে গাছ তার নিজের খাবার তৈরি করতে পারে, এটা আমরা সবাই জানি।

(ক) এই ঘটনার জন্য গাছের কোন শক্তির দরকার হয়? ....।

(খ) ওই শক্তি প্রকৃতিতে গাছ কোথা থেকে পায়? ....।

(গ) গাছের তৈরি খাবারে সৌরশক্তি .... শক্তিতে পরিণত হয়ে .... আবদ্ধ থাকে।

(ঘ) গাছের এই খাবার তৈরি করাটা কী ধরনের পরিবর্তন? ....।

(ঙ) তাহলে দেখা যাচ্ছে .... শক্তির দ্বারা .... পরিবর্তন ঘটেছে।

কর্মপত্র

এবার অন্য একটা শক্তির প্রভাবে ঘটা ঘটনার কথা আলোচনা করা যাক।

(ক) জল কী কী মৌল দিয়ে তৈরি বলো তো?

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে জল তৈরি হয়।

(খ) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসীয়, কিন্তু জল তরল পদার্থ।

(গ) সামান্য খাবার নুন মেশানো জলে ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ পাঠালে জল ভেঙে গিয়ে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন গ্যাস পাওয়া যায়। এই ঘটনাটা তাহলে বিদ্যুৎ শক্তির প্রভাবে .... পরিবর্তনের ঘটনা।

বিভিন্ন আনন্দ উৎসবে তোমরা অনেকেই বাজি পোড়াও। বাজি পোড়াতে কী লাগে? কখনো কখনো আগুন থেকে পাওয়া তাপ লাগে। বাজি পোড়ানোর পর কি সেটা একই থাকে, না পালটে যায়? এটা একটা রাসায়নিক পরিবর্তন, যেখানে তাপ লাগে। আবার, খেলনা বন্দুকের ট্রিগারে চাপ দিয়ে অথবা, পাথর দিয়ে ঠুকে তোমরা ক্যাপ ফাটাও। সেখানে কী শক্তি ব্যবহার করো বলত?

এরকম আরো ঘটনা আমাদের আশপাশে ঘটতে দেখবে যেখানে কোনো না কোনো শক্তি লাগে ভৌত বা রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য।

পরিবর্তনের সঙ্গে শক্তি কীভাবে জড়িয়ে আছে তা নীচের কর্মপত্র পূরণ করে দেখত বোঝা যায় কিনা।

কর্মপত্র

জল থেকে বাষ্প হয়, এটা আমরা আগেই জেনেছি।

(ক) জল থেকে বাষ্প হতে কোন শক্তি লাগে বলো তো? ....।

(খ) একইভাবে তোমরা বাড়ির পাশের পুকুর বা নদী থেকে জল বাষ্প হতে যে তাপ লাগে তার উৎস কী?

.................................।

(গ) বাতাসে উপাদান হিসাবে যে জলীয় বাষ্প থাকে, তার প্রাকৃতিক উৎস তাহলে কী কী?

...................., ..., ...।

(ঘ) শীতের সকালে তোমরা সেই জলই ঘাসের বা গাছের পাতার ওপর শিশির রূপে জমে থাকতে দেখো। এই জলটা আসে কীভাবে?

বাতাসের ছোটো ছোটো .... কণা জড়ো হয়ে .... তৈরি করে।

(ঙ) শীতকালের রাতে বাতাস ঠাণ্ডা হলে বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে ঘনীভূত হয় এবং জলের ফোঁটা সৃষ্টি করে। সেই জলের ফোঁটারা যখন গাছের পাতা, টিনের চাল কিংবা শানবাঁধানো উঠোনে জমা হয় তখন আমরা বলি শিশির পড়েছে।

ভেবে দেখো

শীতকালেই কেন শিশির জমে? গরমকালে তো জমে না!

আগে জেনেছ গাছের সবুজ অঙ্গে সূর্যের আলোর প্রভাবে খাদ্য তৈরি হয়। এটি একটি রাসায়নিক পরিবর্তন।এবার বলো সূর্যের তাপে জল বাষ্প হওয়া কী ধরনের পরিবর্তন?

তাহলে দেখো সূর্য কীভাবে আমাদের প্রকৃতিতে ঘটে যাওয়া ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে!

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের আরও ঘটনা

আমাদের চারপাশে সবসময়েই ঘটে চলেছে নানা ঘটনা। তার মধ্যে ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের ঘটনাগুলো আমরা চিনতে পারি কী? অথচ সেইসব ঘটনা হয়তো আমরাই ঘটাচ্ছি।

সেদিন অতসীর বাবা বাজার থেকে মাংস কিনে আনলেন। আর তার মা শিলে নানারকম মশলা বেটে রাখলেন। ভালো করে মাংস ধুয়ে অতসী তার সঙ্গে নুন আর মশলাগুলো ভালো করে চটকে মেখে কিছুক্ষণ রেখে দিল। পরে কী দেখল সে? অনেকটা জল বেরিয়ে এসেছে মাংস থেকে, আর মশলার রং, গন্ধ মিশে গেছে মাংসের মধ্যে। এখানে তাহলে কী কী পরিবর্তন ঘটল? রান্না করার সময় আর কী কী থেকে এরকম জল বেরিয়ে আসে? কতক্ষণ পরে তা থেকে জল বেরোয় একটু খোঁজ নিয়ে দেখত। বাজারে নুন মাখানো মাছ বিক্রি হয়। আবার আচারে ভিনিগার মেশানো হয়। মাছ নুনে জরিয়ে রাখলে বা আচারে ভিনিগার দিলে যেসব জীবাণু মাছ বা আচারের নানারকম রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে নষ্ট করে দেয়, তারা বাড়তে পারে না। ফলে মাছ বা আচার বেশি দিন ভালো থাকে।

একটা বোতলের মুখে তার ধাতুর তৈরি ঢাকনাটা এঁটে বসে গেছে। তুমি কী করবে?

— বোতলের ঢাকনাসহ মুখটা আগুনে গরম করবে। তখন কী ঘটবে? ধাতব ঢাকনাটা আকারে একটু বেড়ে গিয়ে আলগা হয়ে যাবে।

একইভাবে গোরুর গাড়ির চাকায় লোহার বেড় পরানোর সময় লোহার বেড়টা গরম করে একটু বাড়িয়ে নেওয়া হয়। কাঠের চাকায় ওই বেড় পরানোর পর ঠান্ডা করলেই তা চাকায় আঁট হয়ে বসে যায়। আবার রেললাইনের জোড়ের মুখে একটু ফাঁক রাখা হয় একই কারণে। রোদের তাপে বা রেল চলাচলের ফলে গরম হয়ে রেললাইন দৈর্ঘ্যে বেড়ে যেতে পারে। তখন যদি তা বাড়ার জায়গা না পায় রেললাইনের কী হবে? রেললাইন বেঁকে যেতে পারে, তাই বাড়ার জায়গা রাখার জন্যই রেললাইনের জোড়ের মুখে একটু ফাঁক রাখা হয়। এগুলো সবই ভৌত পরিবর্তনের উদাহরণ।

শহরে যে পানীয় জল পাঠানো হয়, তার মধ্যে মাঝেমাঝে একটু ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়, তাই না? কীসের জন্যে ওই গন্ধ? জলে ক্লোরিন মেশানো হয় জীবাণু মারার জন্য। পানীয় জলে হ্যালোজেন ট্যাবলেট মিশিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিলেও জীবাণু মরে যায়। জীবাণু মরে যাওয়া রাসায়নিক পরিবর্তন।
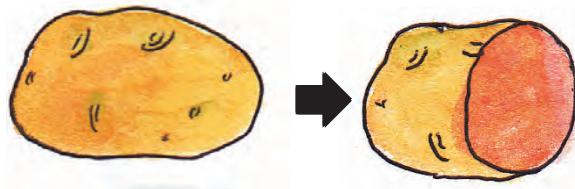
কিছুদিন রেখে দিলে কলার গায়ে কালো ছোপ পড়ে যায়। কেন বলো তো?

তার মধ্যে ঘটে যাওয়া রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণে। কী করে হয় এই পরিবর্তন?

আবার জলে আর্সেনিকের যৌগ থাকলে মানুষের হাতে-পায়ে কালো ছোপ পড়ে যায়। এটা একধরনের জটিল ও ধারাবাহিক রাসয়নিক পরিবর্তনের ফলে ঘটে।

করে দেখো

একটা ছোটো আলু নিয়ে তাকে দু-ভাগে ভাগ করো। তার ভেতরের অংশের রং-টা এখন কেমন? কিছুক্ষণ রেখে দাও। তারপর দেখো ভেতরের অংশটার রং কি একই থাকল না পালটে গেল?

কী দেখতে পেলে?	কেন এমন হলো বলে মনে হয়

এই ঘটনাটা আপেল বা ডাবের মুখ কেটে রাখলেও দেখতে পাবে। বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে ওই কেটে রাখা অংশে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে বাদামি ছোপ ধরে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন একই সঙ্গে ঘটতে পারে। মোমবাতি জ্বালালে মোম যেমন পুড়ে যায় (রাসায়নিক পরিবর্তন), তেমনি মোম গলেও যায় (ভৌত পরিবর্তন)। কোনো কোনো গাছের আঠা জমে গঁদ-ধুনো ইত্যাদি তৈরি হয়। এক্ষেত্রে বাতাসের জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেনের সংস্পর্শে গাছের আঠার ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।

আবার পাইন, ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা পড়ে তার ভিতরের রাসায়নিক পদার্থ মাটিতে মিশে যায়। এই সমস্ত পদার্থের জন্যই এইসব গাছের চারপাশে ঘাস জন্মাতে দেরি হয়।

প্রাণীর মল-মূত্র অথবা জীবদেহের অংশকে জীবাণুরা রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আরো সরল জিনিসে ভেঙে প্রকৃতিতে মিশিয়ে দেয়। কিছু জীবাণু কাটা ফলে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায় ও বংশবৃদ্ধি করে। আবার কাটা ফলে রোগজীবাণুর বাহক মাছি এসে বসতে পারে। তা থেকে নানা রকম অসুখ হতে পারে। তাই অনেকক্ষণ কেটে রাখা ফল খেতে বারণ করা হয়।

জামাকাপড়ে কিছু কিছু দাগ লাগলে লেবুর রস দিয়ে সেই দাগ তুলে দেওয়া যায় এটা তোমরা জানো। বাড়ির বেসিনে বা মেঝেতে ছোপ পড়লে কী করতে দেখো? ....।

এইসব ঘটনায় কী ধরনের পরিবর্তন হয়? ....।

শীতকালে গা-হাত-পায়ের চামড়া ফাটে, ঠোঁট ফেটে যায়? কেন বলো তো?

তুমি এই ঠোঁট ফাটা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ডাক্তারবাবু বা বাড়ির বড়োদের পরামর্শে কী করো? ক্রিম বা অন্য জিনিস গায়ে মেখে এ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বিভিন্ন ঋতু পরিবর্তনের সময় তোমাদের কী কী রোগ সংক্রমণ হতে পারে (পেটখারাপ, সর্দিকাশি, জলবসন্ত, হাম, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি ইত্যাদি) তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের সারণিতে লেখো :

গ্রীষ্মকালে	বর্ষাকালে	শীতকালে	বসন্তকালে

কেন এমন হয় বলো তো? উপযুক্ত আবহাওয়া পেয়ে বিভিন্ন সময়ে জীবাণুদের বাড়-বাড়ন্ত হয়। দেহে ঢুকে-পড়া জীবাণুদের প্রভাবে আমাদের শরীরেও নানাধরনের পরিবর্তন ঘটে। তার ফলেই আমাদের শরীরে নানারকম রোগের লক্ষণ দেখা দেয়।

— তাহলে দেখো আমাদের শরীরেও কতরকম ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে চলেছে। তার ফলে কী ঘটে কখনও অনুভব করেছ?

কখনও শরীরের তাপমাত্রা বাড়ছে-কমছে, হৃৎপিণ্ডের গতির তফাত ঘটছে। আবার কখনও শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত বা মন্থর হচ্ছে। আরো কত কী যে ঘটে যাচ্ছে শরীরের মধ্যে কখনও ভেবেছ তা নিয়ে?

করে দেখো

ঘটনা	কিছু দেখতে পেলে বা অনুভব করলে	কেন এমন হলো বলে তোমার মনে হয়
(ক) তোমার নাকের কাছে একটা আঙুল এনে জোরে শ্বাস ছাড়ো		
(খ) একটা খালি কাঁচের গ্লাস এক হাতে নিয়ে মুখ হাঁ করে তার গায়ে জোরে শ্বাস ছাড়ো		

একটা কাচের গ্লাসে বরফ নিয়ে খোলা বাতাসে রাখা হলো। তখনও কি আগের পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ঘটনাটির মতো একইরকম কিছু দেখা যাবে? দুটো ঘটনার মিল বা অমিল কোথায়?

জেনে রাখো :

আমাদের শরীরের হাড় ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া, মল-মূত্রের স্বাভাবিক রং পরিবর্তন, খাদ্য হজম করা, দাঁতে ছোপ পড়া, চোখে ছানি পড়া — এগুলো নানা ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রভাবেই ঘটে।

নীচে আমাদের চেনা কতকগুলো ঘটনার কথা দেওয়া হলো। কোনটা কোন ধরনের ঘটনা লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

কী ঘটছে	কেমন ঘটনা		
	একমুখী/উভমুখী	প্রাকৃতিক/মনুষ্যসৃষ্ট	ভৌত/রাসায়নিক
ক) গাছে কাঁচা ফল পেকে গেল			ভৌত ও রাসায়নিক
খ) শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হলো			
গ) ফুটবলে পাম্প দেওয়া হলো			
ঘ) মোমবাতি জ্বালানো হলো			ভৌত ও রাসায়নিক
ঙ) উদ্ভিদদেহ থেকে কয়লা তৈরি হলো			ভৌত ও রাসায়নিক
চ) দেহের ভাঙা হাড়ের ছবি এক্সরে প্লেটে তোলা হলো	একমুখী	মনুষ্যসৃষ্ট	রাসায়নিক
ছ) দুধ থেকে ছানা কাটানো হলো			
জ) মাখন গলানো হলো			
ঝ) মেপল গাছের পাতার রং পালটে গেল			

3 মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ

ধাতু ও অধাতু

আমাদের চারপাশে আমরা যে জিনিসগুলো দেখতে পাই সেগুলোকে আমরা সাধারণভাবে বস্তু বলি। আবার ওই বস্তুর মধ্যে যে উপাদান আছে তা হলো পদার্থ। আমাদের রোজকার ব্যবহারের কিছু জিনিসের কথা মনে করো — লোহার আলমারি লোহা দিয়ে তৈরি, প্লাস্টিকের মগ-বালতি প্লাস্টিক থেকে তৈরি। লোহা, প্লাস্টিক — এগুলো যেমন কঠিন পদার্থ, তেমনি জল, সরষের তেল, কাশির সিরাপ — এগুলো তরল পদার্থ। আবার বায়ুতে যেমন বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ মিশে আছে, তেমনি ধূপের ধোঁয়া বা গাড়ির ধোঁয়াতে বিভিন্ন গ্যাসের সঙ্গে মিশে আছে বিভিন্ন কঠিন কণা। দেখা যাচ্ছে পদার্থের অবস্থা নানা ধরনের হতে পারে— কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। কিন্তু সব কঠিন পদার্থই কি একইরকমের?

করে দেখো

একটা এক টাকার বা দু-টাকার কয়েন যদি হাত থেকে সিমেন্টের মেঝেতে পড়ে, কেমন শব্দ শুনতে পাও? এক টুকরো কাঠকয়লা একই জায়গায় ফেলে দেখো কেমন শব্দ হয়। হাত থেকে পড়ার পর কয়েনের আকার-আকৃতির কি কোনো পরিবর্তন দেখতে পাও? কাঠকয়লা ফেললে তার আকার-আকৃতির পরিবর্তন কি একইরকম হয়?

কী করা হলো	কী দেখলে ও কেমন শব্দ শুনলে
যখন এক টাকা বা দু-টাকার কয়েন ফেলা হলো	
যখন কাঠকয়লার টুকরো ফেলা হলো	
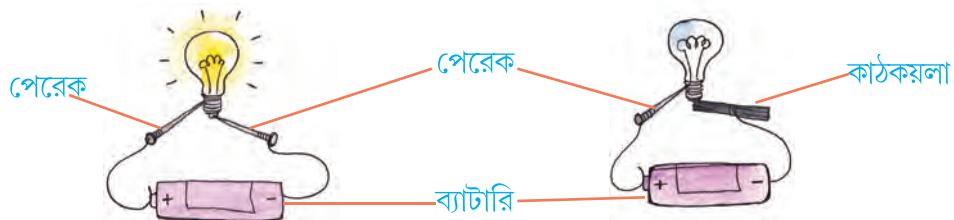
কী কী জিনিসে আঘাত করলে একইরকম শব্দ তৈরি হয়, যাদের বাঁকানো যায় ও পাতলা পাতে পরিণত করা যায় এরকম কয়েকটি পদার্থের উদাহরণ নীচের তালিকায় লেখো। আবার আঘাত করলে এরকম শব্দ হবে না, কিন্তু গুঁড়ো হয়ে যাবে এমন কয়েকটি জিনিসের নাম লেখো :

কেমন জিনিস	তাদের নাম
আঘাত করলে ঢং করে শব্দ হয়, বাঁকানো যায় ও পাতলা পাতে পরিণত হয়	
আঘাত করলে কোনোরকম ঢং শব্দ হয় না, গুঁড়ো হয়ে যায়	

তোমাদের পরিচিত কয়েকটা কঠিন পদার্থের আরো কয়েকটা ধর্ম কীভাবে বোঝা যাবে তার জন্য নীচের পরীক্ষাগুলো করো।

করে দেখো

(1) দু-টুকরো তামার তার, দুটো ছোটো পেরেক, একটা ব্যাটারি ও একটা ছোটো হোল্ডারসহ বালব নাও। এবার ছবির মতো করে তাদের জোড়া লাগাও। যা ঘটতে দেখছ তা লেখো।

(2) এবার একটা পেরেক খুলে নাও ও তার জায়গায় একটা সরু লম্বা কাঠকয়লার টুকরো ছবির মতো করে জোড়া লাগাও। আগের ঘটনা ও এখনকার ঘটনার বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের সারণিটি পূরণ করো।

ঘটনা	কী দেখতে পেলে	কেন এমন হলো বলে মনে হয়
যখন লোহার পেরেক জোড়া ছিল		
যখন লোহার পেরেকের বদলে কাঠকয়লার টুকরো জোড়া হলো		

করে দেখো

1. একটা স্টিলের সাধারণ চামচের একটা প্রান্ত একটা জ্বলন্ত মোমবাতির শিখার মধ্যে কিছুক্ষণ ধরে রাখার পর তোমার অনুভূতি কেমন হয় তা নীচে লেখো।
2. একইভাবে প্লাস্টিকের হাতল লাগানো একটা স্টিলের চামচ মোমবাতির আগুনে ধরলে তোমার অনুভূতি কি একইরকম হয়?

তোমার অনুভূতি কেমন তা নীচে লেখো।
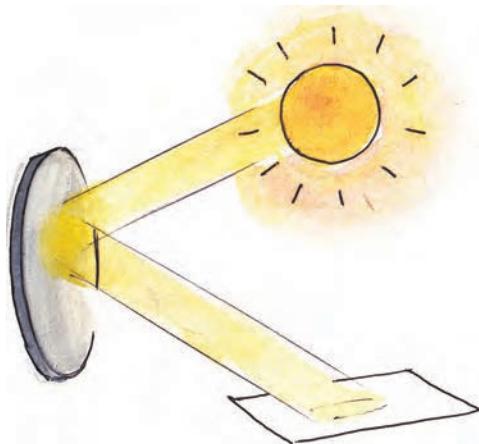
যখন আগুনে ধরা হলো	কী অনুভব করলে	কেন এমন অনুভূতি হলো বলে মনে হয়
স্টিলের চামচ		
প্লাস্টিকের হাতল লাগানো স্টিলের চামচ		

করে দেখো

তিনটে পরিষ্কার বাসন — একটা স্টিলের থালা, পেতলের রেকাবি ও একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি রোদ্দুরে ধরো। সূর্যের আলো এই তিনটে জিনিসের ওপর কেমন দেখাচ্ছে তা লক্ষ করো। মিনিট পাঁচেক এভাবে ধরে রাখার পর পাত্রের পিছনের পিঠে হাত দিয়ে তাদের তাপমাত্রার পরিবর্তন বোঝার চেষ্টা করো। তোমরা যা দেখছ তার মিল বা অমিল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো। একটা প্লাস্টিকের তৈরি বাটি রোদ্দুরে ধরলেও কি একই ঘটনা দেখতে পাও?

কীসের তৈরি জিনিস	রোদ্দুরে ধরলে কী হয়

তুমি যদি কখনও কামারশালায় যাও কী দেখতে পাবে?

— দেখবে যে বিভিন্ন আকারের লোহা গরম করে, তাকে পিটিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করা হচ্ছে। এইসব কাজ করার জন্য লোহাকেই কেন বেছে নেওয়া হলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

....।

কাঠকয়লা বা প্লাস্টিককে গরম করে বা পিটিয়ে কি একইরকম কাজ করা যাবে?

— যাবে না। কারণ কাঠকয়লার বা প্লাস্টিকের মধ্যে লোহার মতো একইরকম গুণ নেই।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, পিতল ইত্যাদির কতকগুলো সাধারণ ধর্ম আছে। ধর্মগুলো কী কী?

1. এদের ওপরের তলে আলো পড়লে চকচক করে,
2. এদের আঘাত করলে ঠং করে একরকম বিশেষ শব্দ হয়,
3. এদের একটা ধারে গরম করলে সহজেই অন্য ধারটা গরম হয়ে যায়; এরা তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী,
4. এদের সরু খণ্ডকে সহজেই বাঁকানো যায়,
5. জোরে পিটলে চ্যাপটা হয়ে যায়।

এই কারণেই লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি পদার্থগুলো হলো ধাতু। আর কাঠকয়লার মতো পদার্থগুলো হলো অধাতু।

ধাতু সাধারণত কঠিন। পারদ ধাতু হলেও তরল। আর অধাতুগুলো কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় হতে পারে। তবে গ্রাফাইট অধাতু হলেও তড়িতের পরিবাহী। হিরে অধাতু হলেও তাপের সুপরিবাহী।

নীচে তোমার চেনা কতকগুলি পদার্থের নাম দেওয়া হলো। শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সাধারণ ধর্ম কী কী হতে পারে সেগুলো লেখো। কোনগুলো ধাতু আর কোনগুলো অধাতু তা জেনে নাও ও সারণি আকারে লেখো।

সোনা, রুপো, অ্যালুমিনিয়াম, গন্ধক, দস্তা, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন।

ধর্মের মিল আছে এমন পদার্থের নাম	কী কী ধর্মের মিল দেখা যায়	ধাতু না অধাতু
	1. আলোতে চকচক করে 2. পিটলে শব্দ হয় 3. পাতে পরিণত হয় 4.	ধাতু
		অধাতু

বিশুদ্ধ ও মিশ্র পদার্থ

আমরা জানি যে বাতাসের মধ্যে অনেকগুলো উপাদান আছে। যেমন — 1. নাইট্রোজেন, 2. অক্সিজেন, 3. কার্বন ডাইঅক্সাইড, 4. জলীয় বাষ্প, 5. নিষ্ক্রিয় গ্যাস।

আবার যদি দুধ ফোটানো হয় দেখব দুধ ক্রমশ ঘন হতে থাকে। দুধ থেকে কী বেরিয়ে ঘন হয়?

ফোটানো দুধের ওপর একটা থালা কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখার পর তুললে কী দেখতে পাও?

....।

এই জলটা কোথা থেকে এল বলো তো?

— ওই ফোটানো দুধ থেকেই, কারণ দুধ ঘন হবার সময় তার মধ্যে থাকা জলের পরিমাণ কমে যায়।

তাহলে দেখো, বাতাস বা দুধের মধ্যে একের বেশি পদার্থ মিশে থাকে। তাই এরা সকলেই মিশ্র পদার্থ।

করে দেখো

একটা কাঁচের গ্লাসে জল নাও। তার মধ্যে এক চামচ নুন গুলে দাও। এরপর তার মধ্যে আরো এক চামচ করে নুন, তিন-চারবার গোলার চেষ্টা করো। প্রথমবারের সঙ্গে শেষবার তৈরি হওয়া দ্রবণের নোনাভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেছে কিনা লক্ষ করো।

তোমার পরিচিত কয়েকটি পদার্থের নাম নীচে দেওয়া হলো। এদের মধ্যে কোনগুলো মিশ্র পদার্থ তা শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছ থেকে জেনে নাও।

চিনির শরবত, ঠান্ডা পানীয়, মধু, বাজির মশলা, লোহার রং, গন্ধক, লোহা, জল, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, চিনি।

....।

অন্য পদার্থগুলোকে তাহলে কী পদার্থ বলা যাবে?

যেগুলোর মধ্যে একাধিক পদার্থ মিশে নেই তারা বিশুদ্ধ পদার্থ। তাহলে ওপরের তালিকার মধ্যে থাকা বিশুদ্ধ পদার্থগুলো হলো ....।

কিন্তু লোহা ও জল দুটোই বিশুদ্ধ পদার্থ হলেও তারা কি একইরকম পদার্থ?

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ
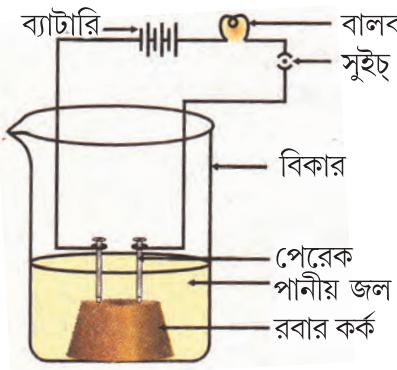
করে দেখো

একটা বিকারে কিছুটা পানীয় জল নাও। একটা রবারের টুকরোর মধ্যে দুটো ছোটো পেরেক পুঁতে পাশের ছবির মতো জলের মধ্যে ডোবাও। তিন-চারটে টর্চ জ্বালানোর সাধারণ ব্যাটারির সঙ্গে সাধারণ তামার তার যোগ করে ওই জলের মধ্যে ডোবানো দুটো পেরেকের মাথায় যোগ করো। পেরেক দুটোর গায়ে কী ঘটছে তা ভালো করে লক্ষ করো।

ভালো করে লক্ষ করলে দেখতে পাওয়া যাবে পেরেক দুটোর গায়ে বুদবুদের মতো গ্যাস জমা হচ্ছে। পেরেক দুটোর একটার গায়ে হাইড্রোজেন আর অন্যটার গায়ে অক্সিজেন জমা হচ্ছে। কেন বলত?

তড়িৎ চালানোর পর জল ভেঙে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন তৈরি হয়। এর থেকেই বোঝা যায় যে জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরি।

সতর্কতা : টর্চে ব্যবহার করা সাধারণ ব্যাটারি সাহায্যেই শুধু এই পরীক্ষা করবে। বাড়ির ইলেকট্রিক লাইন বা ইনভার্টারের লাইন থেকে কখনোই করবে না।

কিন্তু লোহাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে লোহা ছাড়া আর কিছুই নেই। একইভাবে তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে শুধুমাত্র ওই পদার্থগুলোই আছে।

লোহার মধ্যে লোহা ছাড়া আর কিছু নেই। এরকম পদার্থকে বলে মৌলিক পদার্থ। কিন্তু দুটি মৌলিক পদার্থ অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন জল উৎপন্ন করেছে। জল তরল পদার্থ, কিন্তু অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসীয় পদার্থ। জলের ধর্মের সঙ্গে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ধর্মের কোনো মিল নেই।

বায়ুতে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস মিশে আছে।

আবার জলেও দুটো উপাদান— অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন আছে। তাহলে বায়ু ও জল কি একইরকম পদার্থ, না কোথাও তাদের তফাত আছে?

— পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে বায়ুর মধ্যে তার সবকটি উপাদানই তাদের নিজেদের ধর্ম বজায় রেখেছে। যেমন— অক্সিজেনের কথাই ধরা যাক। অক্সিজেন —

(i) আমাদের শ্বাসকার্যে সাহায্য করে।
(ii) কোনো জিনিস জ্বলতে সাহায্য করে।

করে দেখো

একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে, একটা কাচের গ্লাস দিয়ে ঢাকা দাও।

কী দেখলে	কেন এমন হলো বলে মনে হয়

প্রথমে গ্লাসের ফাঁকা অংশে কী ছিল? ....।

যতক্ষণ পর্যন্ত মোমবাতিটা যথেষ্ট অক্সিজেন পাচ্ছিল ততক্ষণ জ্বলছিল। তারপর যখন অক্সিজেন কমে এল, তখন মোমবাতিটা নিভে গেল।

অক্সিজেন কোনো জিনিসকে জ্বলতে সাহায্যে করে। বাতাসের মধ্যে অনেকের সঙ্গে মিশে থাকা সত্ত্বেও তার নিজের সেই ধর্ম বজায় থাকে। এই পরীক্ষাটা তার প্রমাণ।

(i) কোনো জ্বলন্ত জিনিসে জল ঢেলে দিলে কী ঘটে তা নিশ্চয়ই দেখেছ।

(ii) আবার এটাও জানো যে জলের উপাদানগুলো হলো অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন।

তাহলে দেখো, জলের মধ্যে থাকা অক্সিজেন এমনভাবে হাইড্রোজেনের সঙ্গে জোট বেঁধেছে যাতে জোট বাঁধার পর তার নিজের ধর্ম লোপ পেয়েছে — জলের অক্সিজেন আগুন জ্বলতে সাহায্য করেনি।

জলের উপাদান অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সঙ্গে জলের ধর্মের মিল বা অমিলগুলো নীচের সারণিতে লক্ষ করো ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

হাইড্রোজেনের ধর্ম	অক্সিজেনের ধর্ম	জলের ধর্ম
হাইড্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, গ্যাসীয় পদার্থ আর বাতাসের চেয়ে হালকা।	অক্সিজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, গ্যাসীয় পদার্থ, বাতাসের চেয়ে সামান্য ভারী।	বর্ণহীন, গন্ধহীন, সাধারণ অবস্থায় তরল।
অক্সিজেনের উপস্থিতিতে আগুন দিলে হাইড্রোজেন গ্যাস নিজেই জ্বলে।	অক্সিজেন কোনো কিছুকে জ্বলতে সাহায্য করে, কিন্তু নিজে জ্বলে না।	কোনো কিছু জ্বলতে সাহায্য করে না।

পরীক্ষায় বোঝা যায় যে জলের মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তাদের নিজেদের ধর্ম বজায় রাখতে পারে নি। অর্থাৎ, জলের ধর্ম তার উপাদানগুলোর ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জল এমন একটা পদার্থ যা তৈরি হয়েছে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মধ্যে ঘটে যাওয়া রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে। তাই জল হলো একটা যৌগিক পদার্থ বা যৌগ।

করে দেখো

এক টুকরো ম্যাগনেশিয়াম ধাতুর ফিতে চিমটে দিয়ে আগুনে ধরো; আর নিজেরা আলোচনা করে লেখো।

কী দেখলে	কেন এমন হলো

পরীক্ষায় দেখা যাবে ম্যাগনেশিয়াম ধাতু জ্বালানোর পর একরকম সাদা গুঁড়ো তৈরি হয়েছে, যা দেখলেই বোঝা যাবে এই সাদা গুঁড়ো ম্যাগনেশিয়ামের থেকে আলাদা একটা পদার্থ। এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ম্যাগনেশিয়াম ও বাতাসের অক্সিজেন জুড়ে একটা নতুন যৌগ তৈরি হয়। তার নাম ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড।

তোমরা জানো, বাতাসের একটা উপাদান হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড। নাম শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে এই গ্যাসীয় পদার্থ কার্বন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরি একটা যৌগ।

এবার পরের পাতার সারণিতে কার্বন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ধর্মের তুলনা পড়ে দেখো।

কার্বনের ধর্ম	অক্সিজেনের ধর্ম	কার্বন ডাইঅক্সাইডের ধর্ম
(i) কালো রং-এর কঠিন পদার্থ (ii) অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জ্বালিয়ে দিলে জ্বলে	(i) বর্ণহীন গ্যাস (ii) জ্বলতে সাহায্য করে, (iii) শ্বাসকার্যে সাহায্য করে	(i) বর্ণহীন গ্যাস (ii) জ্বলতে সাহায্য করে না, (iii) শ্বাসকার্যে সাহায্য করে না

বাতাসের মতো মিশ্র পদার্থের মধ্যে তার উপাদানগুলো নিজেদের ধর্ম বজায় রাখতে পারে। মিশ্র পদার্থে উপাদানগুলির পরিমাণও বদলে যেতে পারে। বাতাসের উপাদানগুলোর পরিমাণ কি স্থান বা ঋতুভেদে একই থাকে?

নীচের ঘটনাগুলো কেন ঘটে তা শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছ থেকে জেনে নাও ও নীচের সারণিতে লেখো:

কী ঘটনা	কেন ঘটে
(i) উঁচু পাহাড়ের ওপরে শ্বাসকষ্ট হয়	
(ii) বর্ষাকালে ভিজে কাপড় শুকোতে দেরি হয়	

আমাদের চারিদিকে মিশ্র ও যৌগ এই দু-ধরনের পদার্থের সংখ্যাই বেশি, আবার কিছু পদার্থ আছে যারা একটামাত্র উপাদানেই তৈরি। যেমন — বিশুদ্ধ লোহা, তামা, সোনা, রুপো, কার্বন।

তোমরা জানো যে বড়ো জিনিসকে ভাঙলে ছোটো ছোটো টুকরো পাওয়া যায়। নীচের ছবি তিনটি দেখো; তিনটি বোতলেই একই ওজনের লোহার টুকরো আছে।

A

B

C

এবার ভেবে বলো।

কোনটায় লোহার টুকরোগুলো সবচেয়ে বড়ো? ☐

কোনটায় লোহার টুকরোর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি? ☐

কোনটায় খালিচোখে প্রত্যেকটা টুকরোকে চেনা শক্ত? ☐

কোনটায় একটা একটা করে টুকরো বা গুঁড়ো গোনা শক্ত? ☐

তাহলে আমরা বলতে পারি কি —

কোনো জিনিসকে ক্রমাগত ভাঙতে থাকলে টুকরোগুলো ক্রমশ ছোটো হতে থাকবে।

টুকরোগুলো যতই ছোটো হতে থাকবে প্রত্যেকটাকে আলাদা করে দেখা এবং চিনতে পারা ততই শক্ত হয়ে পড়বে।

লোহার মতোই সোনা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, রুপো, দস্তা বা কার্বন (কাঠকয়লা) — এদের যে-কোনো একটার ছোটো টুকরোকে যদি আরো ছোটো করে ফেলা যায় তাহলে তাদের বেলাতেও আরো ছোটো টুকরোগুলো চেনা শক্ত হয়ে পড়বে।

ছোটো টুকরো করতে করতে এসব মৌলিক পদার্থের এমন ক্ষুদ্রতম কণা পাওয়া যাবে যা চোখে দেখা যায় না এবং যার মধ্যে ওই পদার্থের গুণগুলো আছে; মৌলের ওই ক্ষুদ্রতম কণা যার মধ্যে ওই মৌলের গুণগুলো বর্তমান সেই ক্ষুদ্রতম কণাকে মৌলের পরমাণু বলে। কিন্তু পরমাণুকে আরো ভাঙলে তার মধ্যে মৌলের গুণগুলো আর বজায় থাকবে না।

(i) তাহলে আমরা জানলাম যে মৌলিক পদার্থ পরমাণু দিয়ে তৈরি।

(ii) আমরা জানি, যৌগিক পদার্থ একাধিক মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। তাহলে যৌগিক পদার্থের মধ্যেও একাধিক মৌলের পরমাণু আছে।

কয়েকটি পরিচিত যৌগে কী কী মৌলের পরমাণু থাকতে পারে তা নীচের সারণিতে লেখো:

যৌগের নাম	কী কী মৌলের পরমাণু দিয়ে তৈরি
জল	
কার্বন ডাইঅক্সাইড	
চিনি	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন
নুন	সোডিয়াম, ক্লোরিন
পাথুরে চুন	ক্যালশিয়াম, অক্সিজেন

দেখা যাক, মৌলিক, যৌগিক বা মিশ্র পদার্থের তফাত কোথায়।

বেশ কিছু ধাতব বা অধাতব মৌলের পরমাণু স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। অন্য মৌলগুলো যাদের পরমাণু স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না তারা তাহলে কেমনভাবে থাকে?

সেই মৌলগুলোর একাধিক পরমাণু একসঙ্গে জুড়ে থাকে। পরমাণুদের ওই জোটবদ্ধ অবস্থাকে ওই মৌলের অণু বলে। নীচের ছবিতে লক্ষ করো কীভাবে মৌলের পরমাণু জুড়ে ওই মৌলের অণু তৈরি হয়। যে-কোনো পদার্থের খালি চোখে দেখার মতো নমুনায় বহু লক্ষ-কোটি অণু-পরমাণু থাকে।

H H   O O   Cl Cl   I I

আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন মৌল জুড়ে যৌগিক পদার্থ তৈরি হয়। যৌগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ছোটো যে কণা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে ও যে কণার মধ্যে যৌগের ধর্ম বর্তমান থাকে তা হলো যৌগের অণু। একই মৌলের একাধিক পরমাণু জুড়লে তৈরি হয় মৌলের অণু আর ভিন্ন মৌলের পরমাণুরা জুড়লে তৈরি হয় যৌগের অণু। পরের পাতার ছবিতে কয়েকটি পরিচিত যৌগের অণুর গঠন দেখানো হয়েছে। পরমাণুর রং হয়না, ওটা বোঝাবার জন্য আঁকা হয়েছে।

ছবিগুলো দেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের তালিকা পূরণ করো:

জল

H Cl

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

O C O

কার্বন ডাইঅক্সাইড

কোন যৌগের অণু	কী কী মৌল দিয়ে গঠিত	একটা অণুতে কোন মৌলের কটা পরমাণু আছে
জল		
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড		
কার্বন ডাইঅক্সাইড		

এখানে মৌলের পরমাণুগুলোকে গোলকের আকারে দেখানো হয়েছে। আর মৌলগুলোকে চেনার জন্য তাদের নাম সংক্ষেপে ওই গোলকের মধ্যে লেখা হয়েছে। মৌলের এই সংক্ষিপ্ত নামকেই মৌলের চিহ্ন বলে।

মৌলগুলোর চিহ্ন কীভাবে পাওয়া যায়?

চিহ্ন, সংকেত ও যোজ্যতা

চিহ্ন

হাইড্রোজেন, কার্বন ও অক্সিজেন এই তিনটে মৌলের নামের ইংরাজি বানানগুলো দেখো — Hydrogen, Carbon ও Oxygen। এই তিনটে বানান লিখতে কতটা জায়গা লেগে গেল! তাহলে বিজ্ঞান বইতে বারবার এই পদ্ধতিতে মৌলগুলোর নাম লিখলে বিজ্ঞানের বইটা কত মোটা হবে তা একবার ভেবে দেখো। তাই বিজ্ঞানীরা মৌলগুলোর নাম ছোটো করে লেখার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। Hydrogen শব্দের বদলে H, Oxygen শব্দের বদলে O এবং Carbon শব্দের বদলে C দিয়ে লিখলে অনেক কম জায়গা লাগে। অর্থাৎ মৌলগুলোর ইংরাজি নামের প্রথম অক্ষরটা বড়ো হরফে লিখে অনেক মৌলকে চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। শুধু মৌলের চিহ্ন জানলেই কি আমাদের চলবে? যখন আমাদের এইসব মৌলের পরমাণুর কথা বলতে হবে তখন আমরা কী করব? তখন আমরা হাইড্রোজেন, অক্সিজেন আর কার্বনের পরমাণুকে বোঝাতেও যথাক্রমে H, O, ও C ব্যবহার করব। এতে কোন যৌগে কি কি মৌল আছে তা সংক্ষেপে বোঝাতে আমাদের সুবিধে হবে।

এবার তোমরা ওই একই পদ্ধতি ব্যবহার করে নীচের মৌলগুলোর চিহ্ন লেখো।

মৌলের নাম	ইংরাজি শব্দ	চিহ্ন
নাইট্রোজেন	Nitrogen	
বোরন	Boron	
সালফার	Sulphur	
ফসফরাস	Phosphorus	
আয়োডিন	Iodine	
ফ্লুওরিন	Fluorine	

এবার তোমরা তোমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে এই পদ্ধতির সাহায্যে আরও কিছু মৌলের চিহ্ন জানার চেষ্টা করো।

প্রকৃতিতে প্রায় বিরানব্বইটি মৌল পাওয়া যায়। সমস্ত মৌলের চিহ্ন ওই একই পদ্ধতিতে লিখে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নানা অসুবিধাও আছে। যেমন কার্বন (Carbon)-কে যদি তার ইংরাজি বানানের আদ্যক্ষরের (C) বড়ো হাতের হরফ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে ক্যালশিয়াম (Calcium)-এর চিহ্ন কী হবে? তাদের চিহ্ন লেখার জন্য অন্য একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে ইংরাজি বানানের প্রথম দুটি অক্ষর ব্যবহার করে মৌলের চিহ্ন লেখা হয়।

এই ক্ষেত্রে ক্যালশিয়ামের চিহ্ন Ca দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। ভালো করে লক্ষ করো মৌলের চিহ্ন যেখানে দুটি অক্ষর আছে সেখানে প্রথম অক্ষরটি Capital letter এবং দ্বিতীয়টি Small letter ব্যবহার করা হয়েছে।

এবার তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

মৌলের নাম	ইংরাজি শব্দ	মৌলের চিহ্ন
কোবাল্ট	Cobalt	
হিলিয়াম	Helium	
লিথিয়াম	Lithium	
বেরিলিয়াম	Beryllium	
বেরিয়াম	Barium	
ব্রোমিন	Bromine	

উপরের ওই একই পদ্ধতি ব্যবহার করে তোমরা ক্রোমিয়াম (Chromium), ক্লোরিন (Chlorine), ম্যাগনেশিয়াম (Magnesium), ম্যাঙ্গানিজ (Maganese) মৌলগুলোর চিহ্ন লেখার চেষ্টা করো। এতে তোমার কী অসুবিধা হচ্ছে তা সংক্ষেপে লেখো।

....

.... ।

এবার তোমরা ওই মৌলগুলোর চিহ্নের ক্ষেত্রে ইংরাজি প্রথম অক্ষরের সঙ্গে দ্বিতীয় অক্ষরের বদলে রং দিয়ে চিহ্নিত অক্ষরটি ব্যবহার করে চিহ্ন লেখার চেষ্টা করে দেখো তো ওই সমস্যা দূর হচ্ছে কিনা।

মৌলের নাম	ইংরাজি শব্দ	চিহ্ন
ক্লোরিন	Chlorine	
ক্রোমিয়াম	Chromium	
ম্যাঙ্গানিজ	Manganese	
ম্যাগনেশিয়াম	Magnesium	

তোমরা কি জানো রুপোকে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে চেনে। তাহলে পৃথিবীতে রুপোর আর কত নাম থাকতে পারে। কোথাও রুপোকে রজত বা চাঁদি বলে। কোথাও সিলভার, আবার প্রাচীনকালে আর্জেনটাম বলা হতো। বিভিন্ন মৌলের নানা নাম থাকলেও বিজ্ঞানীরা প্রত্যেক মৌলের জন্য একটি চিহ্ন নির্দিষ্ট করেছেন। বহু মৌলের ইংরাজি নাম ব্যবহার না করে মৌলের ল্যাটিন নামের প্রথম বা প্রথম দুটি অক্ষর অথবা প্রথম অক্ষরের সঙ্গে অন্য অক্ষর দিয়ে চিহ্ন প্রকাশ করা হয়েছে।

তোমরা শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে নীচের সারণিটি পূরণ করো:

মৌলের নাম	মৌলের ল্যাটিন নাম	চিহ্ন
পটাশিয়াম	Kalium	
সোডিয়াম	Natrium	Na
তামা	Cuprum	
লোহা	Ferrum	
সোনা	Aurum	
রুপা	Argentum	Ag

সংকেত

আমরা আগেই জেনেছি ধাতু বা নিষ্ক্রিয় মৌল ছাড়া সাধারণত পরমাণু স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না। মৌল অণু বা যৌগ অণু পরমাণু দ্বারা গঠিত। অণু স্বাধীনভাবে থাকতে পারে।

কোনো একটি মৌলিক পদার্থের অণু ওই মৌলের পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। হাইড্রোজেনের অণুতে হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণু আছে। তাই হাইড্রোজেন অণুর সংকেত H_2 দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সংকেত লেখার সময় লক্ষ করলে দেখা যাবে হাইড্রোজেনের চিহ্ন H লিখে হাইড্রোজেনের অণুতে উপস্থিত পরমাণুর সংখ্যা 2-কে চিহ্নের ডান দিকে একটু নীচে লেখা হয়েছে।

তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের সারণি পূরণ করো।

মৌলের নাম	মৌলের একটি অণুতে উপস্থিত পরমাণুর সংখ্যা	মৌলের অণুর সংকেত
অক্সিজেন	2	
নাইট্রোজেন	2	
ক্লোরিন	2	
সাদা ফসফরাস	4	
আয়োডিন	2	
ফ্লুওরিন	2	

মৌলের অণুতে যত সংখ্যক পরমাণু থাকে তাকে ওই মৌলের পারমাণবিকতা বলে।

এবার আমরা কিছু অধাতুর যৌগের সংকেত কীভাবে লেখা হয় তা দেখব। কোনো যৌগের সংকেত লিখতে হলে যৌগটি যে যে মৌলের পরমাণু দিয়ে তৈরি তাদের চিহ্ন পাশাপাশি লিখতে হয়। তবে মৌলের চিহ্নগুলো পাশাপাশি লেখাটার কিছু নিয়ম আছে তা আমরা পরে জানব। তারপর যে মৌলের যতগুলো পরমাণু আছে সেই সংখ্যাটা তার চিহ্নের নীচে ডানদিকে লিখতে হয়। ধরো তোমাকে বলা হলো জলের একটা অণুতে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটা অক্সিজেন পরমাণু আছে। তাহলে তুমি জলের সংকেত লিখবে H_2O_1। অণুতে যদি কোনো মৌলের একটাই পরমাণু থাকে তবে সেই 1 আর লেখা হয় না। শুধু চিহ্ন লেখা হয়। তাহলে জলের সংকেত হলো H_2O।

এবার তোমরা শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের সারণি পূরণ করো।

যৌগের নাম	অণুতে কোন মৌলের কটি পরমাণু আছে	সংকেত লেখার নিয়ম	সংকেত
কার্বন ডাইঅক্সাইড	C একটি; O দুটি	আগে C; পরে O	CO_2
কার্বন মনোক্সাইড	C একটি; O-একটি	আগে .....; পরে	
মিথেন	C একটি; H - চারটি	আগে C পরে H	
অ্যামোনিয়া	N .....; H	আগে ...., পরে	NH_3
হাইড্রোজেন সালফাইড	H- দুটি; S - একটি	আগে H, পরে S	
....	S - একটি; O দুটি	আগে S, পরে O	
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড	H - একটি; Cl- একটি	আগে H, পরে Cl	

এবার তোমরা শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সাহায্যে নীচের সারণি পূরণ করে কোথায় ডাই, ট্রাই, টেট্রা বা পেন্টা প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় তা জানার চেষ্টা করো।

যৌগের নাম	সংকেত	ব্যাখ্যা
কার্বন ডাইঅক্সাইড	CO_2	2 টি O পরমাণু বলে ডাইঅক্সাইড
ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড	PCl_3	3টি Cl পরমাণু বলে ট্রাইক্লোরাইড
....	CCl_4	4টি Cl পরমাণু বলে টেট্রাক্লোরাইড
....	PCl_5	5টি Cl পরমাণু বলে পেন্টাক্লোরাইড
ফসফরাস	PF_3	
সালফার	SO_3	3টি O পরমাণু বলে ....

যোজ্যতা

এসো আমরা নীচের সারণি ভালো করে লক্ষ করি।

যৌগের নাম	সংকেত	যৌগে উপস্থিত বিভিন্ন পরমাণু	ভিন্ন মৌলের একটি পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত H পরমাণুর সংখ্যা
জল	H_2O	অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন	2
মিথেন	CH_4	কার্বন ও হাইড্রোজেন	
অ্যামোনিয়া	NH_3	N ও H	
ফসফিন	PH_3	P ও H	
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড	HCl	H ও Cl	
হাইড্রোজেন আয়োডাইড	HI	H ও I	
হাইড্রোজেন সালফাইড	H_2S	H ও S	

আগের পৃষ্ঠার সারণিতে আমরা লক্ষ করলাম অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফার, আয়োডিন, ফ্লুওরিন, ক্লোরিন-এর একটি পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করেছে। দুটি মৌলের পরস্পর যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাকে যোজন ক্ষমতা বা যোজ্যতা বলে। কোনো মৌলের একটি পরমাণু যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে সেই সংখ্যা দিয়ে হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত মৌলের যোজ্যতা নির্ণয় করা হয়।

এবার তুমি আগের পাতায় যা পড়লে তা থেকে নীচের সারণি পূরণ করো।

মৌল	চিহ্ন	যোজ্যতা
অক্সিজেন	O	
নাইট্রোজেন	N	
কার্বন	C	
সালফার	S	
ক্লোরিন	Cl	
ফ্লুওরিন	F	
আয়োডিন	I	

এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার হাইড্রোজেনের যোজ্যতা 1 ধরে অন্য মৌলের যোজ্যতা নির্ণয় করা হয়েছে। একে হাইড্রোজেন ভিত্তিক যোজ্যতা বলে।

বিভিন্ন ধরনের মিশ্রণ

আমরা আগেই জেনেছি যে একাধিক পদার্থ মিশে গিয়েই তৈরি হয় মিশ্র পদার্থ বা মিশ্রণ। দ্রবণও একধরনের মিশ্রণ। জলে যখন তুমি চিনি বা নুন গুলে দাও তখন চিনির শরবত বা নুন জল তৈরি হয়। এগুলো হলো জলের মধ্যে চিনি বা নুনের দ্রবণ। দ্রবণ তৈরির সময় যে পদার্থটা গুলে গেল সেটা দ্রাব আর যার মধ্যে গুলে গেল সেটা দ্রাবক।

তাহলে ওপরের দুটো দ্রবণে দ্রাব ও দ্রাবক কী কী তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

কী দ্রবণ	দ্রাব	দ্রাবক
চিনির শরবত		
নুন জল		

দ্রবণ তৈরি করার সময় শুধুমাত্র যে তরল দ্রাবকের মধ্যেই কঠিন দ্রাব মেশানো হয় তা নয়, দুটো বা তার বেশি তরল মিশেও দ্রবণ তৈরি হতে পারে। আবার তরলে গ্যাস মিশেও দ্রবণ তৈরি হতে পারে। পুকুরের জলে অক্সিজেন গ্যাস দ্রবীভূত হয় বলেই মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী বেঁচে থাকে।

তোমরা দেখলে জলে গোলার পর চিনিকে আর দেখা যাচ্ছে না। জলে গোলার পর চিনির দানাগুলো গেল কোথায়?

— আসলে তোমরা চিনির যে দানাকে দেখতে পাচ্ছিলে সেটা একটা অণু নয়। ওতে লক্ষ লক্ষ চিনির অণু ছিল যাদের খালি চোখে দেখা যায় না। সবাই মিলে জোট বেঁধে যে সমষ্টি তৈরি করেছিল তাকেই তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে। এখন জল এসে

সেই সমষ্টি থেকে চিনির অণুদের আলাদা করে ফেলেছে। চিনির অণুরা এখন জলের অণুদের সঙ্গে মিশে দ্রবণের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। চিনির দ্রবণের মধ্যে চিনি ও জল তাদের নিজেদের ধর্ম বজায় রেখে শুধু মিশ্রিত অবস্থায় দ্রবণের মধ্যে আছে। জেনে রাখো দ্রাব যদি রঙিন হয় তাহলে জলীয় দ্রবণও রঙিন হবে। আমাদের পরিচিত কয়েকটি মিশ্রণের উদাহরণ নীচের সারণিতে দেওয়া হলো। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কী কী মিশে এই মিশ্রণগুলো তৈরি হয়েছে তা লেখো:

কোন মিশ্রণ	কী কী মিশে তৈরি হয়েছে
নুন জল	
চিনির শরবত	
কাদাগোলা জল	
চুন জল	
বায়ু	

- জলে গোলার পর চিনি যে হারিয়ে যায়নি তা বুঝতে কী কী পরীক্ষা করা যেতে পারে?
- দুটো একই রকমের কাচের শিশির একটায় মাঝামাঝি পর্যন্ত জল ঢালো। অন্যটায় সমান উচ্চতা পর্যন্ত কোনো একটা তেল ঢালো। দুটোতেই সামান্য পরিমাণ নুন দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঝাঁকিয়ে রেখে দাও। তোমার পরীক্ষার ফলাফল সারণি আকারে লিপিবদ্ধ করো। তুমি এই পরীক্ষাটা তোমার চেনা যত রকমের তেল আছে তা নিয়ে করে একই রকম ফলাফল পাও কিনা দেখো। পরীক্ষা থেকে তুমি কী দেখলে—নুন জলে বেশি দ্রাব্য, না তেলে বেশি দ্রাব্য?
- একটা শিশিতে কোনো একটা তেল আর জল নিয়ে শিশির মুখ বন্ধ করো। বেশ কিছুক্ষণ ঝাঁকিয়ে রেখে দাও। পরীক্ষা করে তুমি যা দেখলে আর যা বুঝলে তা সারণি আকারে লিপিবদ্ধ করো।

মিশ্রণ পৃথককরণের পদ্ধতি

পরিস্রাবণ

তোমাদের এলাকায় হঠাৎ করে দেখা গেল পানীয় জলের কল থেকে কাদাগোলা জল পড়ছে। কিন্তু পানীয় জল তো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই জল কিছুক্ষণ রেখে দিলেই কাদা থিতিয়ে পড়বে নীচের দিকে। তখন ওপরের এই পরিষ্কার জলটা ঢেলে নিলেই হলো। কিন্তু এই পদ্ধতিতে পাওয়া জল খালি চোখে পরিষ্কার দেখায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ওই জল দেখলে কী দেখা যাবে?

দেখা যাবে যে ওই জলের সমস্ত কাদার কণা দূর হয়নি।

কাদা মেশানো জল থেকে আরো পরিষ্কার জল পেতে হলে বাড়ির বড়োদের কী করতে দেখো? লক্ষ করলে দেখবে যে বাড়ির বড়োরা ওই জল কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিচ্ছেন। কিন্তু এইভাবে ছেঁকে নেওয়া জলও কি সম্পূর্ণ পরিষ্কার?

কখনোই নয়। তাহলে জলের মতো কোনো তরল ও ওই তরলে গলে না এমন কঠিন পদার্থের মিশ্রণ থেকে দুটো উপাদানকে সম্পূর্ণ আলাদা করতে হলে কী করা দরকার?

— তখনও ছেঁকে তাদের আলাদা করতে হবে। কিন্তু ছাঁকনি হিসাবে এমন জিনিস ব্যবহার করা হবে যার ছিদ্রের মাপ ওই কঠিন কণার মাপের থেকে ছোটো হবে।

এইরকম কাজে ছাঁকনি হিসাবে ব্যবহার করা হয় একরকম কাগজ; যাকে ফিলটার কাগজ বলা হয়। কীভাবে এই কাগজ ব্যবহার করা হয়?

করে দেখো: কিছুটা কাদাগোলা জল নাও। পাশের ছবির মতো প্রথমে একটা গোলাকার ফিলটার কাগজকে চারভাঁজ করো। একটা ভাঁজ খুলে শঙ্কু আকৃতির কাগজটা একটা ফানেলে বসিয়ে তার ওপর কয়েক ফোঁটা জল ছড়িয়ে কাগজটা বসাও। তারপর একটা কাচদণ্ডের সাহায্যে ঘোলা জলটা ফানেলের মধ্যে বসানো ফিলটার কাগজের ওপর ধীরে ধীরে ঢালো।

একটু পর থেকে কী দেখতে পাচ্ছ লেখো:

কী দেখতে পাচ্ছ	কেন হলো বলে মনে হয়

ওপরের পরীক্ষা থেকে দেখতে পাচ্ছ যে ফিলটার কাগজ সাধারণ কোনো ছাঁকনির (যেমন—কাপড়) থেকে অনেক ভালো কাজ করছে।

এই ফিলটার কাগজটা শুধু তরল পদার্থটাকে (এক্ষেত্রে জল) তার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যেতে দিচ্ছে। কিন্তু কঠিন পদার্থের কণা (এক্ষেত্রে কাদামাটির কণা)— এই কাগজের ওপরে আটকে থাকছে। এইভাবে প্রায় সমস্ত জলটাই কাদা থেকে আলাদা করা যাবে, যা আস্রাবণ পদ্ধতিতে পাওয়া জলের থেকে অনেক বেশি পরিষ্কার।

এইভাবে ফিলটার কাগজের মতো ছাঁকনির সাহায্যে তরল ও কঠিনকে আলাদা করার পদ্ধতিই হলো ফিলটার করা বা পরিস্রাবণ। ফিলটার করার পর পাওয়া নীচের তরলটাকে বলে পরিস্রুত। আর ফিলটার কাগজের ওপর পড়ে থাকা কঠিন পদার্থটা হলো অবশেষ।

ভেবে দেখো

বাড়িতে যে ওয়াটার ফিলটার থাকে, তা কীভাবে কাজ করে? অনেক আগে তো ওয়াটার ফিলটার ছিল না। তখন হাঁড়িতে রাখা বিভিন্ন মাপের নুড়ি ও বালির স্তরের মধ্য দিয়ে জল পাঠিয়ে এই কাজ করা হতো।

জলের মধ্যে কাদা মিশে থাকলে কাদার কণা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু জলের মধ্যে চিনি বা নুন মিশে গেলে চিনি বা নুনকে কী আলাদা করে দেখতে পাও?

— পাও না তাইতো। এর কারণ হলো চিনির বা নুনের কণা আরো ছোটো হয়ে জলে মিশে যায়। এই দুটো ক্ষেত্রে তোমাদের অভিজ্ঞতা থেকে নীচের সারণিটা পূরণ করো:

কোন ক্ষেত্রে	কঠিন কণার মাপ কেমন	আস্রাবণ অথবা পরিস্রাবণ কোন পদ্ধতিতে কঠিন পদার্থকে পৃথক করা সম্ভব
কাদাগোলা জল		
নুন জল		

কেলাসন

নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারছ যে নুন জল থেকে নুন ও জলকে আলাদা করতে দুটো পদ্ধতির কোনোটার সাহায্যে আলাদা করা সম্ভব নয়। এসো দেখা যাক কোন পদ্ধতিতে নুনজল থেকে নুনকে ফিরে পাওয়া যায়।

করে দেখো

ওপরের ছবির মতো একটি পাত্রে কিছুটা নুনজল নাও। তারপর ওই নুনজলকে ফোটাতে থাকো। যত সময় যাবে দেখবে নুনজলের জল ফুটতে ফুটতে বাষ্প হয়ে ক্রমশ কমে যাচ্ছে। আর নুনজলের দ্রবণ গাঢ় হচ্ছে। নুনজল বেশ গাঢ় হয়ে এলে না নাড়িয়ে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করতে দাও। অনেকক্ষণ এইভাবে রাখলে তুমি কী দেখতে পাবে?

— বেশ কিছুটা নুন ওই নুনজলের মিশ্রণ থেকে দানা দানা আকারে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

এই দানা দানা নুনকে কী বলে?

—এইরকম দানা দানা চকচকে নুনের দানাকে বলে নুনের কেলাস। এইভাবে দ্রবণ থেকে কঠিন পদার্থের কেলাস তৈরির পদ্ধতিকে কী বলে?

এই পদ্ধতিকে কেলাসন বলে। (এই পদ্ধতিতে কোনো কোনো পদার্থের দ্রবণ থেকে কঠিন দ্রাব-কে পৃথক করা যায়।)

চুম্বকের সাহায্যে মিশ্র পদার্থের পৃথককরণ

তোমরা লক্ষ করে থাকবে চালের সঙ্গে অনেক সময়েই বিভিন্ন জিনিস মিশে থাকে। চালের মধ্যে খুঁজলেই কাঁকর, বালি, ধানের খোসা, কালো চাল—এরকম নানা জিনিস খুঁজে পাবে। এগুলো না হয় হাত দিয়ে তুলে নিয়ে আলাদা করা যায়। কুলোয় করে ঝেড়েও চালের মধ্যে থাকা হালকা জিনিসগুলো কিছুটা উড়িয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু কোনো জিনিসে যদি লোহার গুঁড়ো মিশে থাকে, তখন কী করবে? লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে এমন জিনিস তোমাদের হাতের কাছেই আছে। ছোটো বড়ো স্পিকারের পিছনদিকে দেখবে চুম্বক লাগানো থাকে। এই কাজে এরকম একটা চুম্বক ব্যবহার করলেই হলো।

করে দেখো

খারাপ হয়ে যাওয়া স্পিকার থেকে একটা চুম্বক খুলে নাও। অন্য চুম্বকও নিতে পারো। একটা কাগজের উপর নুন ও লোহার গুঁড়ো মিশিয়ে নাও। তারপর ছবির মতো করে নুন ও লোহার গুঁড়োর মিশ্রণের উপর চুম্বকটা ধরে দেখত কী হয়? যা দেখলে তা নীচে লেখো।

কী দেখতে পেলে	আর কী কী মিশ্রণ চুম্বক দিয়ে আলাদা করা যাবে

4

শিলা ও খনিজ পদার্থ
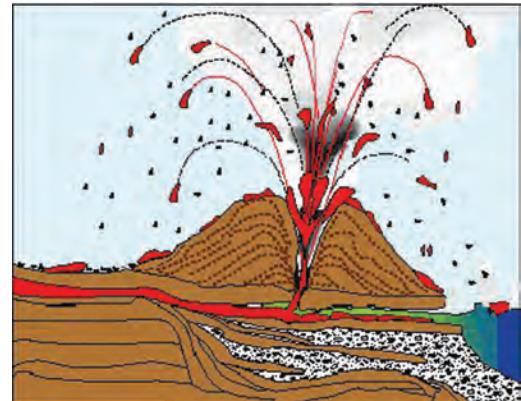
নানান ধরনের শিলা

আগ্নেয়শিলা

তোমরা কী রেললাইনের কালো পাথর কিংবা পিচের রাস্তা তৈরির পাথর দেখেছ? আগ্নেয়গিরি থেকে উঠে আসা লাভা শক্ত হয়ে এগুলো তৈরি। এখন আমরা দেখি পৃথিবীর ওপর পিঠটা শক্ত মাটি আর পাথরের তৈরি। কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টির পরেই এরকম ছিল কী? মনে করা হয় তখন পুরোটাই ছিল খুব গরম আর গলে যাওয়া পাথর দিয়ে তৈরি। আস্তে আস্তে পৃথিবী যত ঠান্ডা হতে থাকল ওপরের অংশটা ততই জমাট বাঁধতে লাগল। এই করেই পৃথিবীর ওপরের শক্ত খোলাটা তৈরি হয়েছে। মাটির যত গভীরে যাওয়া যায় চাপ এবং উষ্ণতা তত বাড়ে। পৃথিবীর গভীরের চাপ আর উষ্ণতা এতই বেশি যে সেখানে পাথর থাকে তরল অবস্থায়। একে বলে ম্যাগমা (Magma)। এই ম্যাগমা যখন কোনো পাথরের ফাটল বা, পাহাড়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন তাকে বলে লাভা (Lava)। বাইরে এসে লাভা জমে শক্ত হয়। এই জমাট-বাঁধা লাভাই হলো আগ্নেয়শিলা।

আগ্নেয়গিরি

তিন রকমের আগ্নেয়শিলা হলো—ব্যাসাল্ট, গ্রানাইট আর পিউমিস। রেললাইনের কালো পাথরগুলো হলো ব্যাসাল্টের টুকরো। পিউমিসকে বলে ঝামা পাথর। উত্তপ্ত ম্যাগমার উপরে ফেনার মতো অংশ তাড়াতাড়ি জমে গিয়ে পিউমিস তৈরি হয়। পিউমিস পাথরে অনেক ছিদ্র দেখা যায়, গ্রানাইটে তো তা দেখা যায় না। কেন? তরল ম্যাগমায় দ্রবীভূত গ্যাস ম্যাগমার মধ্যে দিয়ে বেরোবার সময় পিউমিস পাথরে ওই ছিদ্র সৃষ্টি হয়।

গ্রানাইট

ব্যাসাল্ট

পিউমিস

পাললিক শিলা

চুনাপাথর

হ্রদ, নদী, সমুদ্রের জলের নীচে পলি জমা হয়। ধীরে ধীরে সেই পলিস্তর মাটির নীচে চলে যেতে থাকে । মাটির নীচে গরমে আর চাপে লক্ষ লক্ষ বছরে সেই পলি থেকে পাললিক শিলা তৈরি হয়। জলের নীচে পাললিক শিলা তৈরি হয় তাই অনেক সময়েই এতে মাছ, শামুক ইত্যাদির পাথর হয়ে যাওয়া দেহাবশেষ (ফসিল) পাওয়া যায়। তিন ধরনের পাললিক শিলার উদাহরণ দেওয়া হলো— বেলে পাথর, শেল ও চুনাপাথর।

শেল

বেলেপাথর

পরিবর্তিত শিলা

স্লেট

আগ্নেয়শিলা এবং পাললিক শিলা মাটির গভীরে গরমে আর চাপে বদলে গিয়ে পরিবর্তিত শিলা তৈরি করে। পৃথিবীর ওপরের পিঠের বেশিরভাগটাই আগ্নেয় ও পরিবর্তিত শিলা দিয়ে তৈরি। মার্বেল পাথর একরকমের পরিবর্তিত শিলা যা চুনাপাথরের পরিবর্তনে তৈরি হয়। শেলের পরিবর্তনে তৈরি হয় স্লেট, গ্রানাইটের পরিবর্তনে তৈরি হয় নীস।

মার্বেল পাথর

নীস্

খনিজ পদার্থ ও আকরিক

তোমরা তৃতীয় অধ্যায়ে ধাতুদের কয়েকটি ভৌত ধর্মের কথা জেনেছ। এবার তোমাদের চেনা ছটি ধাতুর নাম দেওয়া হলো। এ দিয়ে তৈরি হয় এমন জিনিসের নাম লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্য নাও।

ধাতুর নাম	ধাতুটি দিয়ে তৈরি হয় এমন জিনিসের নাম
লোহা	
তামা	
অ্যালুমিনিয়াম	
দস্তা	
রুপো	
সোনা	

এত সব ধাতু প্রকৃতিতে কীভাবে পাওয়া যায়— মৌল অবস্থায় না যৌগ অবস্থায়?

তোমরা হয়তো লক্ষ করেছ কিছু কিছু ধাতুর তৈরি জিনিস খোলা হাওয়ায়, রোদে-জলে পড়ে থাকতে থাকতে নষ্ট হয়ে যায়। তোমরা দেখেছ জল লাগতে লাগতে চকচকে লোহার জিনিসে কীরকম লালচে রঙের মরচে পড়ে। তোমরা হয়তো দেখেছ পুরোনো তামার বাসনপত্রে কেমন সবুজ ছোপ ধরে। এর মানে কী? এর মানে হলো এরা খোলা হাওয়ায় নানান বিক্রিয়া করে নতুন যৌগ তৈরি করে। এই উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এদের প্রকৃতিতে যৌগ হিসাবে পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। একই কথা অ্যালুমিনিয়াম, দস্তার বেলাতেও প্রযোজ্য। সোনার আংটি কিন্তু জল লাগলে বা খোলা হাওয়ায় পড়ে থাকলে কোনো পরিবর্তন হতে দেখা যায় না। সেই কারণে প্রকৃতিতে সোনাকে মৌল অবস্থায় পাওয়া যায়।

প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধাতুর নানান যৌগ বালি-মাটি ইত্যাদির সঙ্গে মিশে থাকা অবস্থায় পাওয়া যায়। এদের ধাতুর খনিজ বা 'মিনার‍্যাল' (Mineral) বলে। খনিজ থেকে ধাতুকে আলাদা করে নেবার পদ্ধতিকে বলে ধাতু নিষ্কাশন। যে খনিজ থেকে ধাতুকে সস্তায় ও সহজে বার করা সম্ভব তাকে ধাতুর আকরিক বা 'ওর' (Ore) বলা হয়।

নিজেরা আলোচনা করো, প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও :

- "কোনো ধাতুর একাধিক খনিজ থাকলেও তার সবগুলোই আকরিক নাও হতে পারে" — ঠিক কিনা বিচার করো।

আমরা এবার খুব প্রয়োজনীয় তিনটি ধাতুর নাম আর আকরিক সম্বন্ধে কিছু কথা জেনে নেব:

ধাতুর নাম	ধাতুর প্রধান আকরিক	আকরিকে ধাতুর যৌগে প্রধানত কি কি মৌল থাকে
লোহা	হেমাটাইট	লোহা, অক্সিজেন
অ্যালুমিনিয়াম	বক্সাইট	অ্যালুমিনিয়াম, অক্সিজেন
তামা	কপার গ্লান্স	তামা, সালফার

নীচে তোমাদের তিনটি ধাতুর আকরিক ও ধাতুর নমুনার ছবি দেখানো হলো। লক্ষ করো আকরিক থেকে নিষ্কাশিত ধাতুকে আকরিকের মতো দেখতে নয়। এ থেকে বোঝা যায় ধাতু নিষ্কাশন একটি রাসায়নিক পরিবর্তন। নীচে ☐ এর মধ্যে ধাতুর নাম লেখো।

সংকর ধাতু

তোমরা নিশ্চয়ই কাঁসার থালা, পিতলের ঘন্টা বা মূর্তি দেখেছ। কাঁসা বা পিতল এরা একটা ধাতু নয়। এরা হলো মিশ্র ধাতু। ইতিহাসে তোমরা যে ব্রোঞ্জ ধাতুর কথা জেনেছ সে হলো তামা আর টিন মিশিয়ে তৈরি। পিতল তৈরি হয় তামা আর দস্তা মিশিয়ে।

তোমাকে কিছু শব্দ দেওয়া হলো। এগুলো ঠিকঠাকভাবে ব্যবহার করে তোমায় নীচের গল্প দুটো সম্পূর্ণ করতে হবে: শব্দভাণ্ডার— শক্ত/ভার/কমে যায়।

- লোহা আর সামান্য কার্বন মিশিয়ে ইস্পাত (স্টিল) তৈরি করা হয়। লোহা দিয়ে ব্রিজ তৈরি হলে তা গাড়ি চলাচলে ভেঙেই পড়ত। ইস্পাত দিয়ে তৈরি ব্রিজ কিন্তু সহজে ভেঙে পড়ে না। এর মানে হলো ইস্পাত লোহার চেয়ে .... এবং অনেক .... সহ্য করতে পারে।
- লোহার সঙ্গে ক্রোমিয়াম মিশিয়ে স্টেইনলেস স্টিল তৈরি হয়। লোহার কড়ায় মরচে পড়ে, স্টেইনলেস স্টিলের গ্লাসে কিন্তু মরচে পড়ে না। তাহলে ক্রোমিয়ামের সঙ্গে থাকলে লোহার রাসায়নিক বিক্রিয়া করার ক্ষমতা কিছুটা ....।

এবার কি আমরা মিশ্র ধাতুদের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারছি? মিশ্র ধাতুদের এমন সব গুণাগুণ আছে যা একটা ধাতুর নেই।

কোনো ধাতুর সঙ্গে অন্য ধাতু বা অধাতু বিশেষ মাত্রায় মিশিয়ে গলিয়ে নেওয়া হয়। তরল মিশ্রণ ঠান্ডা হলে সংকর ধাতু পাওয়া যায়। তোমাদের চেনা আরো কয়েকটি সংকর ধাতু হলো গয়নার সোনা, ইলেকট্রিকের ফিউজের তারের ধাতু আর ধাতুর জিনিস জোড়া দেওয়ার 'রাংঝাল'।

জীবাশ্ম বা ফসিল
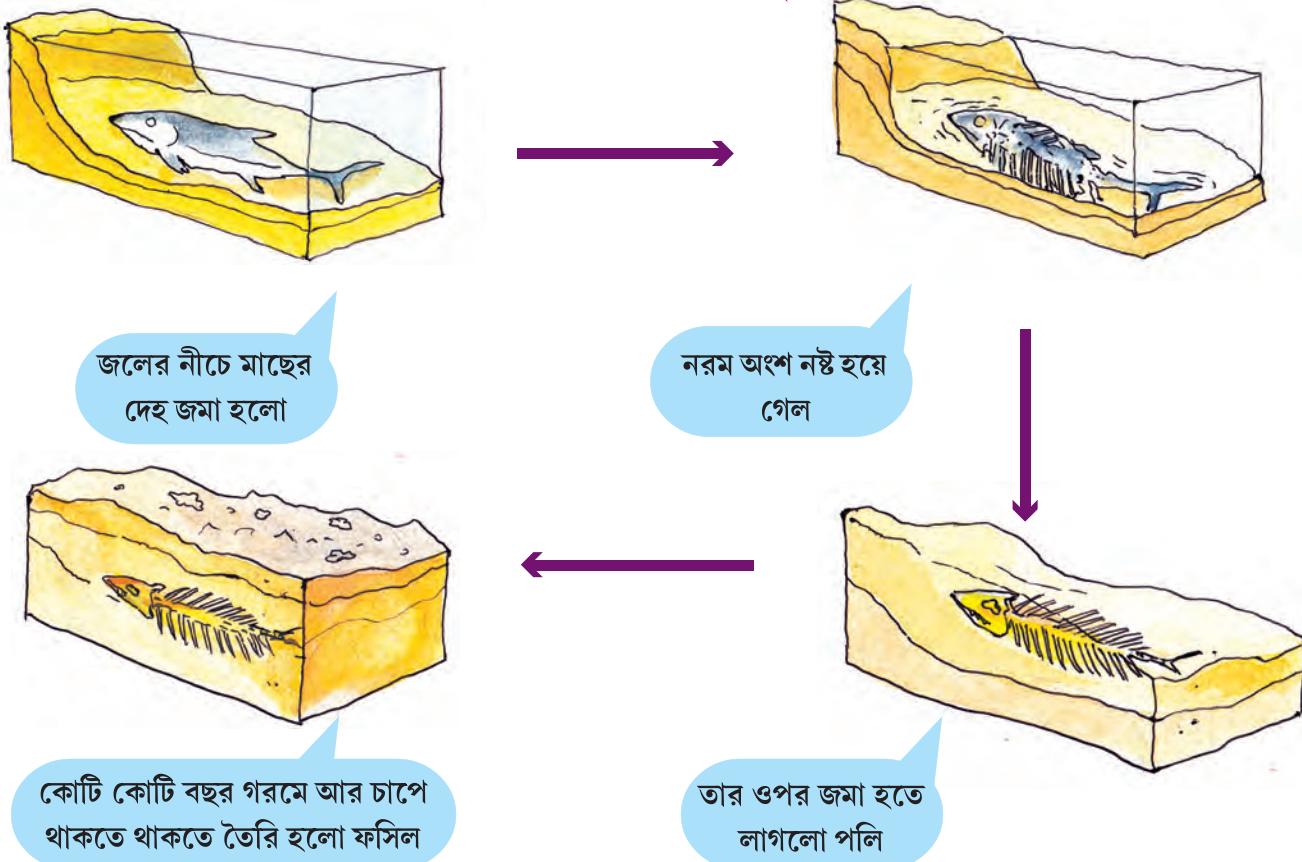
ছবিগুলো কীসের বলতে পারো? পাথরের মধ্যে প্রথমটা হলো একরকম সামুদ্রিক শামুকের খোলা, দ্বিতীয়টা একটা মাছের দেহাবশেষ। তৃতীয় ছবিতে একটা সাপের দেহাবশেষ দেখা যাচ্ছে।

এরা পাথরের মধ্যে এল কী করে?

আজ থেকে অনেক কোটি বছর আগে এই শামুক, মাছ আর সাপ এরা সবাই বেঁচেছিল। তারপরে একদিন এরা মারা গেল । মাটিতে বা জলের নীচে পড়ে থাকতে থাকতে এদের দেহাবশেষে নানান পরিবর্তন ঘটতে লাগল। প্রথমে দেহের নরম অংশগুলো নষ্ট হয়ে গেল। তারপর সেই পড়ে থাকা অংশের উপর ধীরে ধীরে জমতে লাগল আরো পলি। মাটির নীচে কোটি কোটি বছর ধরে নানান পরিবর্তন ঘটে এইসব দেহাবশেষ একসময় পাথরে পরিণত হলো । এই পাথুরে দেহাবশেষগুলো হলো জীবাশ্ম বা ফসিল (Fossil)। 'অশ্ম' মানে পাথর। তবে সব ফসিলই পাথুরে দেহাবশেষ নয়। লুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণীর পায়ের ছাপকেও ফসিল বলা হয়। গাছের জমাট বাঁধা রজনের মধ্যে আটকে পড়া পোকার দেহকেও আমরা ফসিল বলব।

ওপরে তোমরা যেসব প্রাণীদের ফসিলের ছবি দেখলে তারা কেউ এখন বেঁচে নেই, বহু আগেই তারা পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে। কিন্তু ফসিল দেখেই বিজ্ঞানীরা তাদের নানান কথা জানতে পারেন।

কী করে ফসিল তৈরি হয়

জলের নীচে মাছের দেহ জমা হলো

নরম অংশ নষ্ট হয়ে গেল

তার ওপর জমা হতে লাগলো পলি

কোটি কোটি বছর গরমে আর চাপে থাকতে থাকতে তৈরি হলো ফসিল

আমাদের চেনা আরো এক রকমের ফসিল

● পাশের ওই কালো পাথরের মতো জিনিসটা কী বলে মনে হয় ?.................................

● ওর মধ্যে কিসের ছাপ দেখতে পাচ্ছ?.......................
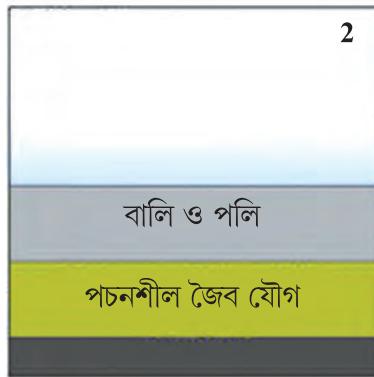
পাশের ছবিটা হল একটা কয়লার টুকরোয় গাছের পাতার ছাপ। এগুলো কোটি কোটি বছর আগের কিছু গাছের পাতার ফসিল। তখনকার পৃথিবীর চেহারাটা কিন্তু মোটেই আজকের মতো ছিল না। পৃথিবীতে তখন এমন অনেক গাছ জন্মাত যাদের অনেকেই আজ লোপ পেয়েছে। অগভীর জলা জায়গায় জন্মানো সেই সব গাছ এক সময় মাটির নীচের নড়াচড়ায় উপড়ে গেল। তারপর একসময় তারা মাটির নীচে চলে গেলো। তাদের উপর ক্রমশ জমতে লাগল আরো কাদা আর মাটি। কোটি কোটি বছর ধরে মাটির নীচের চাপে আর গরমে থাকতে থাকতে পাতার যৌগগুলোর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটল। তৈরি হলো কয়লা আর কয়লার মধ্যে রয়ে গেলো পাতাগুলোর ছাপ।

জীবাশ্ম জ্বালানি বা ফসিল ফুয়েল

যা জ্বালিয়ে বা পুড়িয়ে আমরা তাপ পাই তাই হলো জ্বালানি (Fuel)। নানা রকম জ্বালানির মধ্যে কিছু জ্বালানি আছে যাদের সম্প্রতি পাওয়া গেছে। যেমন ধরো কাঠ, খড়, কাগজ, গোবর ইত্যাদি। এদের কী তুমি ফসিল বলবে? এরা কী লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তৈরি হয়েছে? নিশ্চয়ই নয়। আবার দেখো, আরেক রকমের জ্বালানি হল কয়লা, পেট্রোলিয়াম আর প্রাকৃতিক গ্যাস। নানা ধরনের জীবের দেহাবশেষ থেকেই এগুলো তৈরি হয়েছে। জীবের দেহাবশেষ কিন্তু একশো-দুশো বছরেই জ্বালানিতে বদলে যায়নি, অনেক অনেক কোটি বছর সময় লেগেছে। সেই কারণে কয়লা, পেট্রোলিয়াম আর প্রাকৃতিক গ্যাসকে বলে জীবাশ্ম জ্বালানি বা ফসিল ফুয়েল।

কী করে পেট্রোলিয়াম আর প্রাকৃতিক গ্যাস তৈরি হয়

ছবি দেখে আর নীচের শব্দগুলো ঠিকঠাক ব্যবহার করে পেট্রোলিয়াম তৈরির পদ্ধতি বুঝতে পারো কিনা দেখো ঃ

শব্দভাণ্ডার : জীবের/চাপে/পলি/পাললিক

প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে অগভীর সমুদ্রে জলের নীচে................... মৃতদেহ এসে জমা হলো। দ্বিতীয় ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে তার উপর .... এসে জমা হচ্ছে। কোটি কোটি বছর ধরে মাটির নীচের গরমে আর .... পলি বদলে গিয়ে .... শিলা তৈরি হলো। জীবের দেহাবশেষের নানান পরিবর্তন ঘটে তৈরি হলো পেট্রোলিয়াম আর প্রাকৃতিক গ্যাস।

ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার

কয়লার ব্যবহার

(ক) জ্বালানি হিসেবে

তোমরা কী কয়লার উনুনে রান্না হতে দেখেছ? জামাকাপড় ইস্ত্রি করার দোকানে কিংবা চায়ের দোকানের উনুনগুলোই বা কীসে জ্বলে? —কয়লায়, তাইতো? কয়লা হলো মানুষের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত জীবাশ্ম জ্বালানি। এখন কিন্তু কয়লার প্রধান ব্যবহার বিদ্যুৎ তৈরিতে। কি করে জানো? তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা পুড়িয়ে তাপ পাওয়া যায়। সেই তাপ কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হয়।

(খ) রাসায়নিক পদার্থ তৈরিতে

বাতাসের অনুপস্থিতিতে কয়লাকে বেশি উষ্ণতায় গরম করা হলে কঠিন অবশেষ, তরল আর গ্যাস পাওয়া যায়। এই কঠিন অবশেষ ধাতু নিষ্কাশনের কাজে লাগে। তরলের মধ্যে প্রধান হল আলকাতরা । এ থেকে বহু দরকারি জৈব যৌগ আলাদা করা হয়। গ্যাস মিশ্রণকে শোধন করে নিয়ে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার

1.

2.

3.

4.

ওপরের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা জ্বালানি ব্যবহৃত হয়। তুমি কি বলতে পারো কোনটায় কি জ্বালানি লাগে?

1. .... 2. .... 3. .... 4. ....

এই যে চার রকম জ্বালানি এরা হলো যথাক্রমে কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল আর এল.পি.জি.। এরা এল কোথা থেকে? পেট্রোলিয়াম শোধন করার সময় আমরা এদের পাই।

পেট্রোলিয়াম কী আর কেনই বা তাকে শোধন করা দরকার

পেট্রোলিয়াম হলো চটচটে তরল একটা মিশ্রণ। এতে বহুরকমের যৌগ, জল, মাটি ইত্যাদি মিশে থাকে। একে সরাসরি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। জল মাটি ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থ দূর করার পর তবেই পেট্রোলিয়াম থেকে নানান জ্বালানি পাওয়া যায়। একে বলে পেট্রোলিয়াম শোধন করা। পেট্রোলিয়াম শোধনের সময় প্রোপেন ও বিউটেন গ্যাসীয় জ্বালানি পাওয়া যায়। আমরা যে রান্নার গ্যাসের এল.পি.জি. (লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস) সিলিন্ডার দেখি তাতে প্রধানত তরল প্রোপেন থাকে। জ্বালানি ছাড়াও পেট্রোলিয়ামজাত যৌগ থেকে নানা ধরনের প্লাস্টিক, দ্রাবক, ঘর্ষণ কমাবার তেল, রং ইত্যাদি বহু জিনিস তৈরি করা হয়।

প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার

সাধারণত তরল পেট্রোলিয়ামের উপরেই থাকে প্রাকৃতিক গ্যাস। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো মিথেন। শোধিত প্রাকৃতিক গ্যাসকে বেশি চাপে সিলিন্ডারে ভরে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। একেই বলা হয় কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস বা সি.এন.জি.। সি.এন.জি. দিয়ে এখন অনেক জায়গায় বাসও চালানো হচ্ছে। এতে দূষণের পরিমাণ ডিজেলচালিত বাসের চেয়ে কম।

সি. এন. জি. দিয়ে চালিত বাস

5 মাপজোক বা পরিমাপ

দৈনন্দিন জীবনে পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা ও পরিমাপের একক সমূহ

পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা
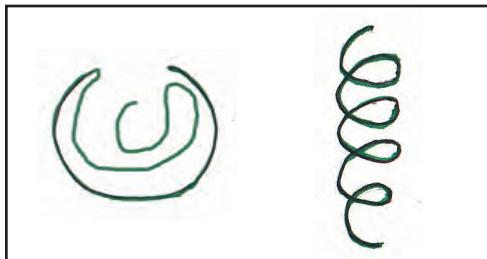
নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো।

(1) তোমার উচ্চতা কত?

(2) তোমার ওজন কত?

(3) তোমার জন্য একটা চুড়িদার বা জামা বানাতে কতটা কাপড় লাগে?

(4) তোমার বাড়িতে মাসে কতটা চাল লাগে?

(5) তোমার পড়ার ঘরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা কত?

(6) তোমার স্কুল কটা থেকে শুরু হয়?

(7) কারো জ্বর হয়েছে কিনা তুমি কীভাবে তা বোঝ?
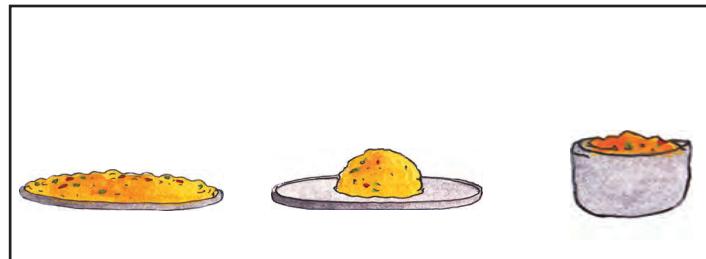
ওপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে তোমাকে যা যা করতে হবে তাকে আমরা বলি পরিমাপ।

তাহলে বুঝলে তো আমাদের প্রতিদিনের জীবনে **পরিমাপের গুরুত্ব** কতটা।

এবার নীচের ছবিগুলো মন দিয়ে দেখো ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো।
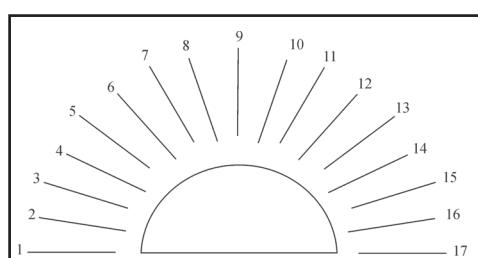
(1) কোনটা দৈর্ঘ্যে বড়ো ?

(2) কোন পাত্রে রাখা ভাত সবচেয়ে বেশি আছে?

(3) A ছবিটি কি B ফোটোফ্রেমে লম্বালম্বি ভাবে বাঁধানো যাবে?

(4) 1 থেকে 17 প্রতিটি সরলরেখাংশের দৈর্ঘ্য কি সমান?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ঠিকভাবে দিতে কি তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে ?

অসুবিধা দূর করতে তোমাকে কী কী বিষয় জানতে হবে?

তাহলে দেখা গেল, **পরিমাপ না করে** শুধু চোখে দেখে প্রশ্নগুলি উত্তর করা সম্ভব নয়।

নীচের সারণিটি পূরণ করো এবং কাজটি করতে কত সময় লাগল লেখো।

কী মাপলে	কী দিয়ে মাপলে
আমার বিজ্ঞান বই-এর	
দৈর্ঘ্য	....
চওড়া বা প্রস্থ	....
ভর (যাকে আমরা সাধারণত ওজন বলে থাকি)	**দাঁড়িপাল্লা বা তুলাদণ্ড**
টেবিলটা পূরণ করতে আমার সময় লেগেছে ....।	

তুমি তোমার বিজ্ঞান বই-এর যা যা পরিমাপ করলে সেগুলোকে বলে ভৌত বা প্রাকৃতিক রাশি। আর এই রাশিগুলো মাপতে লাগে কিছু না কিছু **যন্ত্র**। যা পরিমাপ করা যায় তাকেই বলা হয় **ভৌত রাশি বা প্রাকৃতিক রাশি**।

তুমি তোমার জ্যামিতি বাক্সটিকে নানাভাবে পরিমাপ করে উপরের মতো সারণি আকারে লেখো।

এবার পাশের **আয়তটিকে** নানাভাবে পরিমাপ করে নীচের সারণিতে লেখো।

রাশি	মান	একক
দৈর্ঘ্য		
প্রস্থ		
ক্ষেত্রফল= দৈর্ঘ্য × প্রস্থ		বর্গসেমি

ছবিতে দেওয়া এই আকারটিকে **আয়ত** বলা হয়।

পাশের সারণির কোন রাশিটিকে মাপার সময় তোমাকে অন্য রাশির সাহায্য নিতে হলো বা একই রাশিকে একাধিকবার ব্যবহার করতে হলো?

ওই রাশিটা মাপতে তুমি অন্য কতগুলো রাশির সাহায্য নিলে আর সেগুলি কী কী? বা, একই রাশিকে কতবার ব্যবহার করলে?

এরকম আর কয়েকটা রাশির নাম নীচে দেওয়া হলো।

আয়তন = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা

বেগ = দৈর্ঘ্য ÷ সময়

ঘনত্ব = ভর ÷ আয়তন

তাহলে বোঝা গেল, এমন কিছু রাশি আছে যারা **অন্য কোনো রাশির উপর নির্ভর করে না**। যেমন , দৈর্ঘ্য, ভর, সময় ইত্যাদি। এদের **মৌলিক বা প্রাথমিক রাশি বলে**।

আবার, এমন কিছু রাশি আছে যাদের **একাধিক মৌলিক রাশি** নিয়ে তৈরি করা হয়। যেমন, ক্ষেত্রফল, ঘনত্ব, আয়তন, বেগ ইত্যাদি। এদের **লব্ধ রাশি** বলে।

ওপরের সারণিতে লেখা রাশিগুলির পরিমাপ লেখার সময় তুমি কি কেবল সংখ্যাই লিখেছিলে, নাকি তার সঙ্গে অন্য কিছুও লিখেছ? যেমন, সেন্টিমিটার, মিটার, ফুট, ইঞ্চি, হাত, বিঘত, গ্রাম, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড, মিনিট — এরকম কিছু শব্দও লিখেছ কি? সংখ্যার পাশে লেখা ওই শব্দগুলিকে আমরা বলি একক। একক ছাড়া পরিমাপের কোনো অর্থ হয় না।

প্রাথমিক রাশির একক হলো প্রাথমিক একক এবং লব্ধ রাশির একক হলো লব্ধ একক। যেমন সময় একটি প্রাথমিক রাশি। এতএব সময়ের একক 'সেকেন্ড' হলো প্রাথমিক একক। আবার বেগ একটি লব্ধ রাশি। তাই বেগের একক 'মিটার/সেকেন্ড' একটি লব্ধ একক।

দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল, আয়তন, ভর ও সময়

দৈর্ঘ্যের পরিমাপ

(1) তোমাকে একটা ঘড়ি, একটা স্কেল আর কয়েকটি বাটখারা দেওয়া হলো। এবার বলা হলো একটা আলমারির উচ্চতা মাপতে।

তুমি কোন জিনিসটা ব্যবহার করবে? এবার একটু ভেবে দেখো তো বাকিগুলি তুমি ব্যবহার করলে না কেন?

তাহলে দেখা গেল, দৈর্ঘ্য রাশিটাকে পরিমাপের জন্য দৈর্ঘ্য-ই প্রয়োজন হয়, ভর বা সময় বা অন্য কোনো রাশি নয়।

তেমন সময়কে সময় দিয়েই, ভর-কে ভর দিয়েই মাপতে হয়।

অর্থাৎ কোনো রাশিকে পরিমাপ করতে সেই রাশিরই একটা সুবিধাজনক অংশ দিয়ে পরিমাপ করতে হয়। ওই সুবিধাজনক অংশটা হলো ওই **রাশির একক**।

বিজ্ঞানের স্যার রাতুল, বুদ্র আর ইকবালকে বললেন — 'একটা বেঞ্চকে **বিঘত** মেপে তা কতটা লম্বা প্রত্যেকে আলাদা করে আমায় জানাও।"

ভেবে বলো তো তিনজনের মাপ কি সমান হবে? না হলে কেন? আবার ধরো, একজন বেশ **'লম্বা'**, আর একজন বেশ **'বেঁটে'** মানুষকে একটা শাড়ি ক-হাত লম্বা, মেপে বলতে বলা হলো।

দুজনের মাপ কি সমান হবে? যদি না হয় তবে কেন?

তবে দেখা যাচ্ছে যে বিঘত বা **'হাত'** বা **'পায়ের পাতা'** ইত্যাদিকে দৈর্ঘ্যের একক (অর্থাৎ 'এক') ধরে একই বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপের সময় একেক জনের ক্ষেত্রে একেক পরিমাপ পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে গ্রিসে দৈর্ঘ্যের একক হিসাবে **বিঘত**-কে ব্যবহার করা হতো। আবার মিশরে দৈর্ঘ্যের একক হিসাবে ব্যবহৃত হতো **Cubit** বা **হাত**। তাহলে দেখো, দৈর্ঘ্যের পরিমাপ এক এক জায়গায় এক এক রকম ছিল।

বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, এইসব অসুবিধা দূর করতে এমন একক নিতে হবে যাকে পৃথিবীর সবাই নির্দ্বিধায় **'প্রমাণ'** বা Standard বলে মেনে নেবে। ব্যক্তি বা স্থানভেদে তা কখনও আলাদা হবে না।

পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতির জটিলতা এড়াতে 1960 সালে তৈরি করা হয় SI **একক**।

SI **পদ্ধতিতে** সাতটা প্রাথমিক একক।

রাশি	একক
দৈর্ঘ্য	মিটার (m)
ভর	কিলোগ্রাম (kg)
সময়	সেকেন্ড (s)
তড়িৎ প্রবাহ	অ্যাম্পিয়ার (A)
আলোর তীব্রতা	ক্যান্ডেলা (cd)
অণু-পরমাণুর পরিমান	মোল (mol)
উষ্ণতা	কেলভিন (K)

কোনো রাশিকে পরিমাপ করতে ওই রাশিরই একটা সুবিধাজনক অংশকে আন্তর্জাতিকভাবে **প্রমাণ বা Standard** বলে ধরে নেওয়া হয় — ওই প্রমাণ বলে গৃহীত অংশই ওই রাশির একক। কোনো রাশি তার এককের কতগুণ, তা হিসাব করে, ওই রাশিকে মাপা হয়।

যেমন, 25 মিটার লম্বা পুকুর মানে — পুকুরটার দৈর্ঘ্য হলো দৈর্ঘ্যের প্রমাণ SI একক 1 মিটারের 25 গুণ।

হাতেকলমে

তুমি একটি মিটার-স্কেল দিয়ে মেপে 1 মিটার লম্বা একটা সুতো নাও। এখন নীচের AB সরলরেখাংশের দৈর্ঘ্য ওই সুতো দিয়ে মাপো।

A ├──────────────────┤ B

তোমার কি মনে হচ্ছে ওই মাপ নেওয়ার জন্য সুতোটা একটু বেশি বড়ো ?

এবার সুতোটাকে সমান দশ অংশে কেটে ফেলো ও তা থেকে একটি অংশ নিয়ে AB দৈর্ঘ্যটিকে মাপো। এবার মাপতে কি সুবিধা হলো? অতএব, দেখা গেল, AB $= \frac{1}{10}$ মিটার অর্থাৎ 1 মিটারের 10 ভাগের 1 ভাগ। এটাকে আমরা 1 ডেসিমিটার বলে থাকি। এভাবে 10 দিয়ে ভাগ করে করে আমরা SI পদ্ধতির ছোটো মানের রাশির একক পাই। একে বলে Sub-multiple unit বা উপগুণিতক একক।

এবার ওই 1 মিটারের সুতো দিয়ে যদি তোমায় তোমার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব বা দুটো রেল স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব মাপতে বলা হয়, তখন কি কাজটা তোমার কাছে সহজ হবে। তোমার কি মনে হচ্ছে ওই দূরত্ব মাপার জন্য 1মিটারের সুতোটা খুবই ছোটো?

এভাবে কলকাতা থেকে দিল্লির দূরত্ব = 1305000 মিটার হয়।

এক্ষেত্রে ওই দূরত্বটা লেখা যায় 1305 × 1000 m = 1305 km.

অর্থাৎ 1 মিটারের 1000 গুণ = 1 কিলোমিটার।

জেনে রাখো		
10 mm	=	1 cm
10 cm	=	1 dm
10 dm	=	1 m

টেবিল 1

জেনে রাখো		
100 cm	=	1 m
1000 m	=	1 km

টেবিল 2
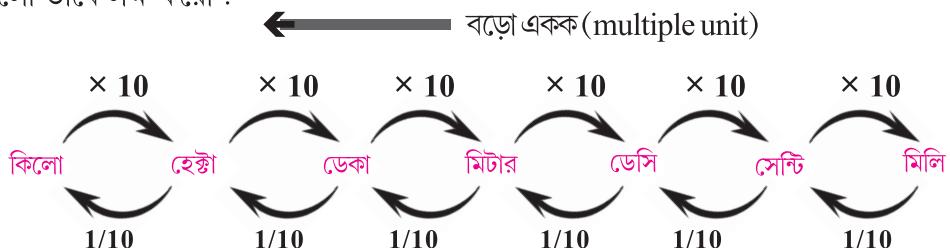
- **আন্তর্জাতিক প্রমাণ মিটার কাকে ধরা হয়?**

1889 সালে ফ্রান্সের প্যারি শহরে ‘ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অফ ওয়েটস অ্যান্ড মেজার্স’ নামক সংস্থায় 0^0C- তাপমাত্রায় রাখা প্লাটিনাম (90 %) ও ইরিডিয়াম (10 %) - এর সংকর ধাতুর তৈরি একটা দণ্ডের দু-প্রান্তের দুটি নির্দিষ্ট দাগের মাঝের দূরত্বকে সারা বিশ্বে **প্রমাণ বা** Standard 1 **মিটার ধরা হয়**।

এই প্রমাণ 1 মিটার থেকে তার গুণিতক ও উপগুণিতক এককগুলি তৈরি করা হয়। এভাবে 10 দিয়ে গুণ করে আমরা SI পদ্ধতির বড়ো একক পেতে পারি। একে বলে **গুণিতক একক বা** Multiple unit। উপরের টেবিল 1 এ SI পদ্ধতিতে দূরত্ব মাপার বড়ো থেকে ক্রমশ ছোটো উপগুণিতক এককগুলো (Submultiple Unit) লক্ষ করো। ওপর থেকে পরপর প্রথমটার 10

গুণ হলো দ্বিতীয়টা। আবার, নীচ থেকে ওপরে পরপর প্রথমটার $\frac{1}{10}$ গুণ হলো দ্বিতীয়টা।

ভালো ভাবে লক্ষ করো :

একক	চিহ্ন
কিলোমিটার	km
হেক্টোমিটার	hm
ডেকামিটার	dam
মিটার	m
ডেসিমিটার	dm
সেন্টিমিটার	cm
মিলিমিটার	mm

1 km = 1 × 10 hm = 10 hm

= 100 dam

= ....? cm

আবার, 1 m = $\frac{1}{10}$ da m = 0.1 dam

= $\frac{1}{1000}$ km = 0.001 km

= ..... ? hm

এই পদ্ধতির সুবিধা হলো এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন খুব ক্ষুদ্র মানের রাশি অন্যদিকে অনেক বড়ো মানের রাশিকেও মাপা যায়।

যেমন — একটা সরু তারের ব্যাস মাপা যায় মিলিমিটারে, আবার কলকাতা থেকে দিল্লির দূরত্ব মাপা যায় কিলোমিটার -এ।
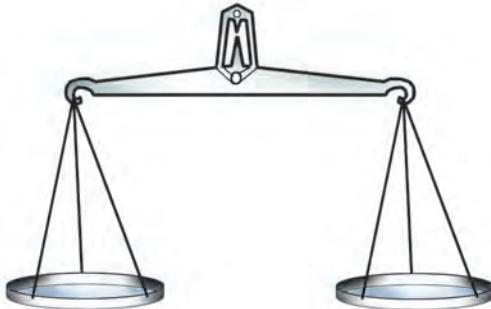
হাতেকলমে

তুমি দোকানদারকে 1 কেজি ডাল দিতে বললে। দোকানদার **দাঁড়িপাল্লা** দিয়ে ডাল মেপে তোমায় দিল।

এখানে যে রাশিটার পরিমাপ করা হলো তার নাম কী?

মনে করে দেখো SI পদ্ধতিতে কোন রাশির একক কিলোগ্রাম। ওই রাশি মাপার জন্য দোকানদার যে যন্ত্র ব্যবহার করল সেটা হলো **দাঁড়িপাল্লা**। ভর মাপার এই যন্ত্রের আর একটা নাম হলো **সাধারণ তুলা যন্ত্র**।

তুলা যন্ত্রের এক পাত্রে বাটখারা রাখা হয়, অপর পাত্রে থাকে বস্তু। পরিমাপ ঠিক হলে সূচক সাম্যাবস্থায় আসে।

ক্ষেত্রফলের পরিমাপ

তোমার বিজ্ঞান বইটা টেবিলের উপর রাখো। এবার একটা চক দিয়ে বইটার চারধার ঘেঁষে টেবিলের উপর দাগ কাটো।

টেবিলের উপর যেখানে বইটা আছে সেখানে বইটাকে না সরিয়ে অন্য কোনো কিছু কি রাখা সম্ভব?

এবার বইটা তুলে নাও। দেখো বইটা টেবিলের উপর এতক্ষণ যে জায়গা দখল করে রেখেছিল সেই জায়গাটা কোনটা?

তাহলে চকের রেখা টেবিলের উপরিতলের যে জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে সেটাই এতক্ষণ বইটা দখল করে রেখেছিল সেই জায়গাটা হলো বইটার **নীচের তলের ক্ষেত্রফল**। এই ক্ষেত্রফল পরিমাপ করার জন্য স্কেলের সাহায্যে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ নেওয়া হয় ও তারপর নীচের সম্পর্কটি ব্যবহার করা হয়। ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ
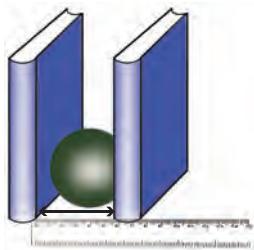
একটি ফুটবলকে হাত দিয়ে ধরো। তোমার হাত ফুটবলটার ওপরের যে জায়গাটাকে স্পর্শ করতে পারবে, বা ফুটবলটার ওপর হাত বুলিয়ে তুমি যে তলটাকে অনুভব করতে পারো সেই সমগ্র তলটা ফুটবলটির উপরিতল।

এখন তুলি (brush) দিয়ে ঐ পুরো তলটাকে রং করা হলো।

তুমি বলের যে জায়গাটি রং করলে তার পরিমাপ হলো ওই বলটির **ওপরের তলের ক্ষেত্রফল**। এই ক্ষেত্রফল পরিমাপ করার জন্য ফুটবলের ব্যাস পরিমাপ করা হয় ও নীচের সম্পর্কটি ব্যবহার করা হয়।

ক্ষেত্রফল = π × ব্যাস × ব্যাস। [π (উচ্চারণ ‘পাই’) একটি সংখ্যা, এর মান প্রায় 3.14]

বলটাকে একটা সমতলের ওপর রেখে তার দুপাশে স্পর্শ করে দুটো বই রাখো এবার বইদুটোর দূরত্ব স্কেলের সাহায্যে মাপো। এই মাপই হলো বলটির ব্যাস। (পাশের ছবিতে দেখো)

আয়তনের পরিমাপ

একটা থালা আর একটা কাচের গ্লাস নাও। কাচের গ্লাসটা থালার উপর রেখে সাবধানে গ্লাসটায় কানায় কানায় জল ভরো।

এবার গ্লাসে তোমার হাতের কোনো একটা আঙুল ডুবিয়ে দাও। কী দেখতে পেলে? কেন এমন হলো, ভাবো।

যে জলটা উপচে পড়ল, সেই জল কোথায় ছিল? সেই জলের জায়গায় কি অন্য কিছু এসেছে? এলে সেটা কী?

তাহলে, তোমার আঙুলই জলের জায়গা নিয়েছে। তাই জল উপচে পড়েছে।

তাহলে বলা যায়, আঙুল কিছুটা জায়গা দখল করে।

এবার আঙুলের বদলে একটা চামচ ডুবিয়ে পরীক্ষাটা প্রথম থেকে করে দেখো, একই ঘটনা ঘটে কিনা?
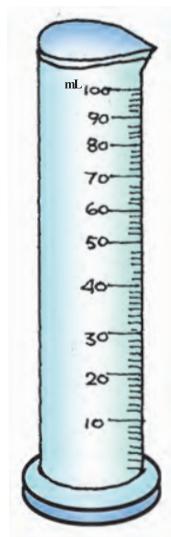
তাহলে বলা যায় যে, বস্তু মাত্রই কিছু স্থান দখল করে থাকে। কোনো বস্তু যতটা স্থান দখল করে থাকে তাকে ওই বস্তুর **আয়তন** বলে।

তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় একটি পাত্র। পাত্রটি কাচ বা অন্য কোন স্বচ্ছ বস্তু দিয়ে তৈরি করা হয়। পাত্রটির গায়ে একটা স্কেল থাকে। ওই স্কেল থেকেই তরলের আয়তন মাপা হয়। এই পাত্রকে বলে **আয়তন মাপনি চোঙ।**

এসো আমরা একটি পাত্রে কিছু তরল নিয়ে তাকে **আয়তন মাপনি চোঙের** সাহায্যে পরিমাপ করি।

একটা শুকনো আয়তন মাপনি চোঙ নাও। চোঙটাকে টেবিলের উপর খাড়াভাবে রাখো। এখন যে তরলের আয়তন মাপতে হবে, সেটির পুরোটাই খুব সাবধানে ও ধীরে ধীরে চোঙটার মধ্যে ঢালো। তরলটা স্থির অবস্থায় এলে, তরলের ওপরতল চোঙের দেয়ালের স্কেলের যে দাগ স্পর্শ করবে তার পাঠ নাও। ওই পাঠই হলো ওই তরলের আয়তন।

SI পদ্ধতিতে আয়তনের একক ‘ঘন মিটার’। আয়তনের আরও প্রচলিত একক আছে যেমন ঘন সেন্টিমিটার (cc), লিটার (L) ইত্যাদি।

জেনে রাখো — 1000 ঘন সেন্টিমিটার = 1ঘন ডেসিমিটার = 1লিটার 1 লিটার = 1000 মিলিলিটার

1 ঘন সেন্টিমিটার =1 মিলিলিটার

সময় পরিমাপ

তোমার বাড়ি থেকে স্কুল হেঁটে যেতে কত সময় লাগে? সাইকেল করে যেতে কত সময় লাগে?

কোনক্ষেত্রে কম সময় লাগল ? তুমি কীভাবে বুঝলে? কোন যন্ত্রের সাহায্য নিলে?

সঠিক ঘড়ির মজাটা হলো, সে সবসময় ঘোরে একইভাবে। অর্থাৎ ওর সেকেন্ডের কাঁটা একবার পুরো ঘুরতে প্রতিবারই 1 মিনিট সময় নেয়। তেমন মিনিটের কাঁটা একবার পুরো ঘুরে আসতে 1 ঘন্টা সময় নেয়। আর ঘন্টার কাঁটা একবার পুরো ঘুরতে 12 ঘন্টা সময় লাগে।

তাহলে, **প্রথমবারের** চেয়ে **দ্বিতীয়বার** তোমার কম '**সময়**' লেগেছে। কিন্তু সময় বলতে কী বোঝায়? — স্কুলে যাওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করা আর স্কুলে পৌঁছোনো এই ঘটনা দুটির মাঝে যতক্ষণের ব্যবধান (interval) সেটাই '**সময়**'।

কোন দুটি ঘটনার মধ্যে যতক্ষণের ব্যবধান তাকেই আমরা '**সময়**' বলি।

অসীমা জিজ্ঞেস করল— কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্যকে আমরা চোখে দেখতে পাই, তাই দৈর্ঘ্যের প্রমাণ মাপ একটি প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম দণ্ড নিয়ে ঠিক করা হয়। কিন্তু সময়কে তো চোখে দেখা যায় না তাহলে সময়ের প্রমাণ মাপ ঠিক করা হবে কী করে?

ঈশান বলল— ঠিক কথা। বরং বিষয়টা দিদিমণিকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

দিদিমণি ক্লাসে ঢুকতেই অসীমা আর ঈশান প্রশ্নটা করল।

দিদিমণি বললেন— খুব ভালো প্রশ্ন করেছ। সত্যিই সময় আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু তাই বলে চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। উপায় খুঁজে নিতে হবে। আসলে সময় মাপা হয় সৌরদিনের সাহায্যে।

অসীমা বলল— সৌরদিন কী?

দিদিমণি বললেন— দিনের বেলায় যখন তোমার জানালা দিয়ে রোদ এসে প্রথম মেঝেতে পড়েছে তখন থেকে আবার পরদিন ঠিক ওই জানালা দিয়ে মেঝের ঐ জায়গায় সূর্যের আলো আসার মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান তাকেই '**এক সৌরদিন**' বলে।

অসীমা বলল— বাঃ, এ তো খুব সোজা ব্যাপার।

হ্যাঁ এবার সারা বছরের সৌরদিন যোগ করে, যোগফলকে 365 দিয়ে ভাগ করে আমরা পাই '**গড় সৌরদিন**'। আর এই গড় সৌরদিনকে আমরা 24 দিয়ে ভাগ করে পাই **1 ঘন্টা**।

ঈশান বলল— আর, ওই 1 ঘন্টাকে 60 দিয়ে ভাগ করে পাব **মিনিট**। তাই না!

—একদম ঠিক।

অসীমা বলল— তাহলে 1 মিনিটকে 60 দিয়ে ভাগ করে আমরা নিশ্চয় পাব **1 সেকেন্ড**।

ঠিক বলেছ। এ ভাবেই সময়ের প্রমাণ মাপ ঠিক করা হয়, আর সেইমতো আমাদের ঘড়িগুলো তৈরি করা হয়।

জেনে রাখা দরকার

1 বছর	=	365 দিন
1 দিন	=	24 ঘণ্টা
1 ঘণ্টা	=	60 মিনিট
1 মিনিট	=	60 সেকেন্ড

পিছনে ফিরে তাকাই

সময় মাপার যন্ত্র হলো ‘ঘড়ি’। আজ তুমি যে ঘড়ি ব্যবহার করছ তা কিন্তু বহু বছরের গবেষণার ফল।

তোমরা স্পোর্টসের মাঠে স্যার বা দিদিমণির কাছে নিশ্চয়ই একটা অন্য ধরনের ঘড়ি দেখেছ যেটা দিয়ে কোনো দৌড় প্রতিযোগী দৌড় শেষ করতে কত সময় নিল তা জানতে পারা যায়। এই ধরনের ঘড়িকে বলে **স্টপ ওয়াচ বা স্টপ ক্লক।**

এই ঘড়ির কাঁটা প্রথম অবস্থায় **‘0’** (শূন্য)-র ঘরে থাকে। কাজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে সুইচ অন (switch on) করলে কাঁটা (hand) ঘুরতে থাকে। আবার, কাজ শেষের সঙ্গে সঙ্গে সুইচে চাপ দিলে কাঁটাটা ওই জায়গাতেই থেমে যায়। ফলে কাজটা করতে কত সময় লাগল তা জানা যায়। এরপর সুইচে চাপ দিলে কাঁটা আবার **‘0’** (শূন্য)-র ঘরে ফিরে আসে।

আজকাল আরো আধুনিক **‘ডিজিটাল স্টপ ওয়াচ’** ব্যবহার করা হয়। এই ঘড়িতে কাঁটা থাকে না। ঘড়ির স্ক্রিনে ফুটে ওঠে **সংখ্যা বা Digit**। এই ঘড়ি দিয়ে আরও সূক্ষ্মভাবে সময় মাপা যায়। এই ঘড়ি **0.01 সেকেন্ড** পর্যন্ত সময় মাপতে পারে।

আধুনিক জীবনে সময়ের সূক্ষ্ম পরিমাপ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

এমন কোনো কাজের কথা ভাবো তো যেখানে সময়ের খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাপও দরকার হয়ে পড়ে।

(i) ....

(ii) ....

খেলার মাঠে প্রতিযোগীদের বিভিন্ন খেলার নির্ভুল সময় মাপতে যে ইলেকট্রনিক ঘড়ি ব্যবহার হয় তাতে 1 সেকেন্ডের 100 ভাগের 1 ভাগ সময়ও মাপা যায়।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার কাজে যে ঘড়ি ব্যবহার করা হয় তা দিয়ে 1 সেকেন্ডের 1 কোটি ভাগের 1 ভাগ সময়ও মাপা যায়।

পরিমাপে অনুমানের গুরুত্ব

আমাদের জীবনে সবসময় **পরিমাপের** যন্ত্র দিয়ে সঠিক **পরিমাপ** করে কাজ করা সম্ভব হয় না। তখন আমাদের **অনুমানের** উপর নির্ভর করতে হয়।

কারণ

কোনো কোনো কাজ করার জন্য সবসময় আমাদের হাতে না থাকে প্রয়োজনীয় সময়, না থাকে প্রয়োজনীয় যন্ত্র। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে তখন আনুমানিক পরিমাপ করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা থাকে না।

(1) অনিমেষের সেদিন স্কুলে যেতে বাড়ি থেকে বেরোতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল।

আজ আমি ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছোতে পারব তো? আমায় আজ একটু জোরে পা চালাতে হবে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। জোরে হেঁটে অনিমেষ ঘেমে নেয়ে স্কুলে গিয়ে পৌঁছোল।

যাক দেরি হয়নি। ঠিক সময়েই পৌঁছোতে পেরেছি।

অনিমেষ বাড়ি থেকে দেরিতে বেরিয়েও কী করে স্কুলে ঠিক সময়ে পৌঁছোতে পারল?

অনিমেষ তার চলার বেগ কতটা বাড়ালে ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছোতে পারবে তা কী করে হিসাব করল?

(2) তোমার বাড়িতে যিনি রান্না করেন অথবা তোমার বিদ্যালয়ে যিনি বা যাঁরা মিড-ডে মিল রান্না করেন তিনি বা তাঁরা রান্নায় কি নুন, লঙ্কা, মশলা বা তেল নির্দিষ্ট যন্ত্রে পরিমাপ করে ব্যবহার করেন?

তাহলে তিনি বা তাঁরা কীভাবে ওগুলো রান্নায় পরিমাণ মতো ব্যবহার করেন?

তাতে কি রান্নায় কোনো সমস্যা হয়?

(3) সেদিন স্কুলে ক্লাস চলাকালীন জয়িতার শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। দিদিমণিকে সে কথা বললে, দিদিমণি ওর গায়ে হাত দিয়ে বললেন — 'ইস, তোমার তো জ্বরে গা একদম পুড়ে যাচ্ছে।'

তারপর থার্মোমিটার এনে দেখা গেল, জয়িতার শরীরের উষ্ণতা সত্যিই স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি।

দিদিমণি কী করে বুঝেছিলেন জয়িতার শরীরের উষ্ণতা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি?

(4) ক্রিকেট খেলার সময় নিশ্চয়ই দেখে থাকবে যে, কখনো-কখনো ফিল্ডার দৌড়ে এসে প্রায় বাউন্ডারি লাইনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটাকে আটকে দেন।

ফিল্ডার কী করে বলের থেকে নিজের দূরত্ব ইত্যাদি হিসাব করেন? নিজের বেগ কতটা বাড়ালে তবে বাউন্ডারি লাইনের আগেই বলটা আটকানো যাবে তা বুঝতে পারেন?

(5) তুমি যখন সাইকেল চালাও তখন তুমি ঠিক যে জায়গায় থামতে চাও তার কিছুটা আগে থেকে তোমার সাইকেলে ব্রেক কষো আর ঠিক সেই জায়গায় সাইকেল এসে থামে।

এ কাজটা কীভাবে সম্ভব?

যে-কোনো গাড়ির ক্ষেত্রেও তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে ড্রাইভার এমনভাবেই ব্রেক কষে যথাস্থানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেন।

তাহলে বুঝতে পারছ, আমাদের জীবনে **আনুমানিক পরিমাপ** বা **আন্দাজ** করার গুরুত্ব কতটা।

তোমরা দলে এরকম কয়েকটা কাজ নিয়ে আলোচনা করো যাতে আনুমানিক পরিমাপ করার প্রয়োজন হয়।

হাতেকলমে

1) তোমার শ্রেণিকক্ষের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা অনুমান করে নীচে লেখো।

আমার শ্রেণিকক্ষের দৈর্ঘ্য = ...m, প্রস্থ = ... m, উচ্চতা = ... m

এবার স্কেল বা ফিতে দিয়ে মেপে দেখত তোমার অনুমান মোটামুটি ঠিক কিনা।

2) তুমি যে বেঞ্চিতে বসো সেই বেঞ্চির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা অনুমান করে লেখো।

আমার বেঞ্চির দৈর্ঘ্য = ... m, প্রস্থ = ... m, উচ্চতা = ... m

এবার আগের মতো আবার স্কেল দিয়ে মেপে তোমার অনুমান যাচাই করো।

3) কয়েকটা পাথর জোগাড় করো। এবার ওই পাথরগুলোর ভর কত হতে পারে অনুমান করে লেখো।

প্রথম পাথরের ভর = ... g

দ্বিতীয় পাথরের ভর = ... g

তৃতীয় পাথরের ভর = ... g

এবার ওই পাথরগুলোর ভর, ভরমাপার যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করিয়ে তোমার অনুমান যাচাই করে নাও।

রাজমিস্ত্রি কাজের আগে ওই কাজের জন্য কী কী জিনিস কতটা পরিমাণে লাগবে তার আনুমানিক হিসাব দেন। বিষয়টা নিয়ে দলে আলোচনা করো।

তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, জীবনে **সঠিক পরিমাপেরও খুব দরকার আছে।**

একটা ওষুধ তৈরি করতে কোন উপাদান কতটা লাগবে তা যথেষ্ট সচেতনতার সঙ্গে সূক্ষ্ম হিসাব করার দরকার হয়।

ওষুধ তৈরির সময় কোনো উপাদান একটু বেশি হলে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

এরকম আরও উদাহরণ নিয়ে দলে আলোচনা করো।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির পরিমাপ

কদিন আগে অনুরাধা আম খেয়ে আঁটিটা মাঠের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আজকে হঠাৎই সে দেখল যে, আঁটিটা থেকে একটা ছোট্ট আমগাছের চারা বেরিয়েছে। আবার কয়েক বছর পর ওই চারাগাছই হয়ে উঠবে একটা ফলন্ত আমগাছ।

অনুরাধার বাড়ির পাশে রমাদিদের গোয়াল ঘরে বছরকয়েক আগে বাছুরটা জন্মেছিল। আজ সে একটা বড়োসড়ো গোরু। পড়ার টেবিলে রাখা ছোট্টবেলার ছবিটা দেখে অনুরাধা ভাবে, আজ সে কতটা বড়ো হয়ে গেছে!

অনুরাধা ওদের বাগানের শিউলি গাছটায় গত শরতে দেখেছিল, গিজগিজ করছে কত শুঁয়োপোকা। অথচ এরাই তো প্রজাপতি হয়ে ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায়!

গতকালও জবাগাছের যে কুঁড়িগুলো অনুরাধা দেখেছিল, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে সবকটাই ফুল হয়ে গেছে।

এভাবে সব জীবের বৃদ্ধি হয়, বৃদ্ধি হয় জীবের বিভিন্ন অঙ্গের অথবা জীবের শরীর যা যা দিয়ে তৈরি তাদের।

কোনো ব্যক্তির বৃদ্ধি তার উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য আর দেহের ওজন দিয়ে বোঝা যায়। প্রত্যেক মানুষের বয়স অনুযায়ী উচ্চতা ঠিকঠাক না হলে বুঝতে হবে সেই ব্যক্তি অপুষ্টিতে ভুগছেন। উদ্ভিদ বা প্রাণীর পুষ্টি ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা নানা ভাবে বোঝা যায়। মানুষের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ওজন মাপলে যদি দেখা যায় বয়স অনুযায়ী ওজন ঠিক আছে, তবে বলা যেতে পারে তার পুষ্টি স্বাভাবিক। এছাড়াও উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে জীবের পুষ্টি ঘটে। পুষ্টি হলো একটি শারীরিক প্রক্রিয়া আর তার ফলাফল হলো স্বাস্থ্য। পুষ্টি ভালো হলে স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলোও ভালো হয় (যেমন - মসৃণ ও উজ্জ্বল ত্বক, দুর্গন্ধহীন নিঃশ্বাস, কম মেদ, সুগঠিত পেশি, দৃঢ় ও মজবুত হাড়, ভালো ঘুম, কায়িক শ্রমে সহজে ক্লান্তি না আসা ইত্যাদি)। মাছ, মাংস, ডিম, ফল, দুধ ইত্যাদি প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ লবণ-সমৃদ্ধ খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে খেলে স্বাভাবিক পুষ্টি ঘটে। ফলে জীবের দেহ গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ যথাযথ হয়। সুগঠিত দেহ ভালো স্বাস্থ্যকে নির্দেশ করে। আর স্বাস্থ্য ভালো না খারাপ তা ধরা পড়ে বিভিন্ন বৃদ্ধিসূচক পরিমাপের সময় (ওজন, উচ্চতা পরিমাপ, মাথা ও বুকের পরিধি পরিমাপ, মধ্যবাহুর পরিধি পরিমাপ ইত্যাদি)।

উদ্ভিদের বৃদ্ধির পরিমাপ
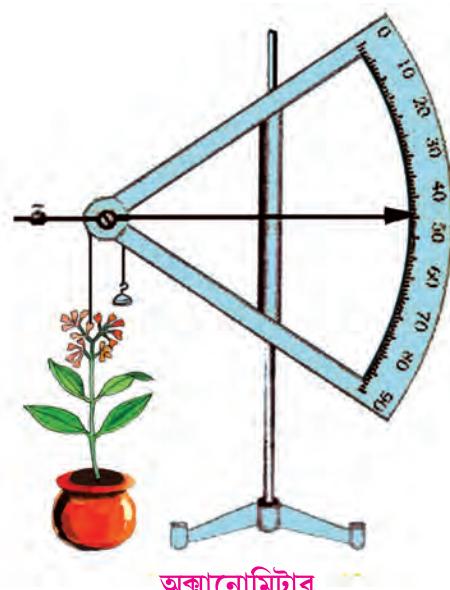
তোমরা কি জানো উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপের যন্ত্রের কথা? এসো একটু পরিচয় করে নিই। উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপ করা হয় — 'অক্সানোমিটার' বা ' আর্ক অক্সানোমিটার' যন্ত্র দিয়ে।

গ্রিক শব্দ ' *auxein*' কথার অর্থ To grow অর্থাৎ বৃদ্ধি হওয়া আর *metroe* কথার অর্থ To measure বা পরিমাপ করা।

পরের পাতায় আর্ক অক্সানোমিটার-এর ছবিটা ভালো করে লক্ষ করো।

$$\text{বৃদ্ধির হার} = \frac{\text{বৃদ্ধি}}{\text{সময়}}$$

উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধির পরিমাপ খুব জরুরী, চাষের কাজে ফলের বাগান তৈরির সময় তা কাজে লাগে। উদ্ভিদের কাণ্ডের গায়ে যে গাঁটের মতো অংশ থাকে সেগুলো হলো পর্ব। দুটো পর্বের মধ্যবর্তী অংশ হলো পর্বমধ্য। পর্ব

অক্সানোমিটার

থেকে পাতা বের হয়। পর্বের সংখ্যা, পর্বমধ্যের দৈর্ঘ্য, পাতার সংখ্যা, পাতার পরিমাপ থেকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

আচ্ছা, একটা চারা গাছের কোন অংশটা কেমন করে বাড়ে? দেখবে? এসো নিজেরা করে দেখি।

একটা টবে লাগানো ছোটো গাছ নাও। একটা ছোলা বা মটর চারা হতে পারে, আবার একটা ছোটো ফুলের চারা বা তুলসীগাছও হতে পারে। আর লাগবে একটা মাপার ফিতে, আর একটা মার্কার পেন।

* প্রথমে গাছটার কাণ্ডে কটা পর্ব আছে গুনে নাও।
* এবার নীচ থেকে প্রথম দুটি পর্বমধ্য কতটা লম্বা মেপে নাও।
* এবার ওই দুটি পর্বের প্রতিটিতে কয়টি পাতা আছে গুনে নাও।
* প্রতিটি পাতা কতটা লম্বা আর কতটা চওড়া মেপে নাও।
* আবার ওপর থেকে প্রথম দুটি পর্বমধ্য কতটা লম্বা মাপো।
* ওই দুটি পর্বের প্রতিটিতে কয়টি পাতা আছে গুনে নাও।
* প্রতিটি পাতা কতটা লম্বা আর কতটা চওড়া মেপে নাও।

এরকমভাবে সাত দিন অন্তর তিনবার মাপ নাও। এবং তা নীচের সারণিতে লেখো।

	বিষয়	প্রথম মাপ (প্রথম দিন)	দ্বিতীয় মাপ (7 দিন পরে)	তৃতীয় মাপ (14 দিন পরে)
	মোট পর্ব			
কাণ্ডে মার্কার পেন দিয়ে দেওয়া দাগের ওপরের অংশ	পর্বমধ্যের দৈর্ঘ্য			
	পর্বে পাতার সংখ্যা			
	পাতার দৈর্ঘ্য			
	পাতার প্রস্থ			
কাণ্ডে মার্কার পেন দিয়ে দেওয়া দাগের নীচের অংশ	মোট পর্ব			
	পর্বমধ্যের দৈর্ঘ্য			
	পর্বে পাতার সংখ্যা			
	পাতার দৈর্ঘ্য			
	পাতার প্রস্থ			

এবার এসো, মজাটা দেখি।

বলো তো, প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় ধাপে পর্বের মোট সংখ্যা কত ?

....

তাহলে, পর্বের সংখ্যা বেড়েছে, না কমেছে?

....

পর্বের সংখ্যা কোন দিকে বেড়েছে, নীচে না ওপরে?

....

বলতে পারো, গাছের কোন্ অংশ থেকে নতুন পর্ব তৈরি হয়?

.... (প্রয়োজনে বন্ধুদের বা শিক্ষক/শিক্ষিকাকে জিজ্ঞাসা করো।)

সব পর্বমধ্যগুলোই কি লম্বায় বেড়েছে? বেড়ে থাকলে, কোনগুলো বাড়েনি? আর কোনগুলো বেড়েছে?

....

তেমনি দেখত, সব পাতাগুলো লম্বা চওড়ায় বেড়েছে কিনা? না বেড়ে থাকলে, কোনগুলো বেড়েছে, আর কোনগুলো বাড়েনি?

....

....

তাহলে, গাছের কোন অংশটা বাড়ে, আর কোন অংশটা বাড়ে না, লেখো।

প্রয়োজনে, তোমার বন্ধুদের আর শিক্ষক/শিক্ষিকাকে জিজ্ঞাসা করে নাও।

এবার এসো জেনে নিই উদ্ভিদের - 'ভর' কী করে পরিমাপ করবে।

হাতেকলমে

এই হাতেকলমে কাজটা শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গেই করবে।

সজীব উদ্ভিদের ভর পরিমাপ (Measuring fresh weight of a plant)।

1) খুব সাবধানে একটা জীবন্ত চারাগাছ মাটি থেকে তুলে নাও। খেয়াল রাখো যাতে গাছটার শিকড় ছিঁড়ে না যায়।

2) এবার জল দিয়ে ভালো করে সমস্ত মাটি ধুয়ে ফেলো।

3) এবার একটা নরম তোয়ালে দিয়ে ভালোভাবে সমস্ত জল মুছে ফেলো।

4) সঙ্গে সঙ্গে (সময় নষ্ট না করে) চারা গাছটার ভর সূক্ষ্ম তুলাযন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করো। (গাছে থাকে প্রচুর পরিমাণ জল, দেরি হলে গাছ শুকিয়ে যেতে পারে, তাতে পরিমাপে ভুল হবে।)

এবার পরিমাপ করা গাছের 'ভর' নীচে লিখে ফেলো। এভাবে চারাগাছটার ছ -মাসের তালিকা তৈরি করো।

ভর পরিমাপ

'ভর' পরিমাপ করা হয় সাধারণ তুলা-র সাহায্যে। অধুনা স্প্রিং তুলা যন্ত্র দিয়েও ভর মাপা হচ্ছে। পাশে এমন কয়েকটা যন্ত্রের ছবি দেওয়া হলো। মানুষের ক্ষেত্রে ভর মাপার যন্ত্র আকারে ছোটো ও অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে যন্ত্রের আকারটা বড়ো হয়।

প্রাণীর বৃদ্ধির পরিমাপ

মানুষসহ সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির হার পরিমাপের পদ্ধতি একই। পরিমাপের যন্ত্রও এক, কিন্তু আকৃতির পার্থক্য থাকে। উচ্চতা সাধারণত 'সেন্টিমিটার স্কেলে' মাপা হয়।
পাশের ছবিটা খেয়াল করো, এমন উচ্চতা মাপার যন্ত্র তোমরা খেলার (sports) মাঠে দেখে থাকবে।
উচ্চতা মাপার সময়, পরিমেয় ব্যক্তিকে মেরুদণ্ড টান টান করে, দু-পা জোড়া করে পাদানির উপর দাঁড়াতে হবে। (অনেক যন্ত্রে পাদানি থাকে না)। সূচকটিকে মাথার তালুর সঙ্গে লাগিয়ে মাপ নিতে হবে।

তোমরা বন্ধুরা একসঙ্গে মিলে তোমাদের উচ্চতা মাপো। দেখো তো, উচ্চতার কী পরিচয় পাও। হ্যাঁ, তোমাদের বয়সটাও সেইসঙ্গে লেখো।

ক্রম.	নাম	বয়স	উচ্চতা (সেমি)

দেখে বলো, তোমাদের মতো বয়সে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর উচ্চতা কতটা হয়ে থাকে?

....

এর চেয়ে বেশি বা কম উচ্চতা কতজনের আছে?

....

বেশি : ....

কম : ....

এবার এসো, একটা মজার জিনিস দেখি। এর জন্য অবশ্য তোমাকে বাড়িতে কাজ করতে হবে। তোমার ভাই-বোন, বন্ধুদের ভাই-বোন, হয়তো বা পাড়ার ছোট্ট বাচ্চাদের শরীরের মাপ নিতে হবে।

কাদের মাপ নেবে?

(1) শিশু : 2-3 বছরের কোনো বাচ্চার মাপ নাও।

(2) বালক/বালিকা : 4-6 বছরের কোনো ভাই বা বোনের মাপ নাও।

(3) কিশোর/কিশোরী : 11-14 বছরের কোনো সমবয়সি বন্ধু বা দাদা বা দিদির মাপ নাও।

কীভাবে মাপ নেবে?

(1) মাথা : ভ্রূ-র ঠিক ওপর দিয়ে মাথা বেড় দিয়ে মাপ নিতে হবে।

(2) দেহকাণ্ড : কাঁধ থেকে তলপেট পর্যন্ত দেহকাণ্ড। পিঠের দিকে শিরদাঁড়া বরাবর। কাঁধ থেকে নীচ পর্যন্ত মাপ নিতে হবে।

(3) হাত: কাঁধ থেকে আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত।

এসো এবার সারণিতে ফেলে দেখি।

	ক্রম	নাম	বয়স	পরিমাপ (সেমি)			মাথা :দেহকাণ্ড
				মাথা	দেহকাণ্ড	হাত	
শিশু							
বালক/বালিকা							
কিশোর/কিশোরী							

শিশুদের মাথা আর দেহকাণ্ডের মাপের অনুপাত কত থেকে কত?

....

বালকদের/বালিকাদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত কত থেকে কত?

....

কিশোরদের/কিশোরীদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত কত?

....। পরে একসময় দেহকাণ্ড ও হাতের অনুপাতও মিলিয়ে দেখো।

এবারে বাড়িতে বাছুর, ছাগলছানা, বেড়ালছানা, হয়তো খরগোশ বা গিনিপিগ ছানার বৃদ্ধি মেপে দেখত, কী পেলে? অনুপাতগুলো মিলিয়ে দেখে বলো, দেহের কোন অংশটা তুলনায় সবচাইতে বেশি বেড়েছে?

....

আর কোনটা বেড়েছে সবচাইতে কম?

....

এবার তাহলে দেহের অংশগুলোকে (মাথা, হাত, দেহকাণ্ড) তাদের বৃদ্ধির হার হিসেবে কম থেকে বেশির দিকে সাজাও (মানে প্রথমে লেখো, যেটা বাড়ে সবচেয়ে কম আর শেষে লেখো, যেটা বাড়ে সবচেয়ে বেশি)

(1) .... → (2) .... → (3) ....

তাহলে এবার বলো, বেড়ে ওঠার সময় সব অঙ্গগুলো কি একই হারে বেড়ে ওঠে?

....। এটাই প্রাণীদের বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য।

এসো, এবার একই রকমের ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের ভর মেপে দেখি কীভাবে দেহের ভর বয়সের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

	ক্রম	নাম	বয়স	ভর (কিগ্রা)	গড় ভর (কিগ্রা)
শিশু					
বালক					
কিশোর					
প্রাপ্তবয়স্ক					

এবার মিলিয়ে দেখি, কোন বয়সে ওজন বেশি বাড়ে:

ওপরের চার্টটি থেকে নীচের ফাঁকা স্থানে গড় বয়সগুলো লেখো?

শিশু : .... কিগ্রা।
বালক : .... কিগ্রা।
কিশোর: .... কিগ্রা।
প্রাপ্তবয়স্ক : .... কিগ্রা।
তাহলে ওজন বাড়ল কতটা? বিয়োগ করে বলো।
শিশু থেকে বালক হবার সময়ে .... কিগ্রা।
বালক থেকে কিশোর হবার সময়ে .... কিগ্রা।
কিশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হবার সময়ে .... কিগ্রা।
কোন বয়সে ওজন বাড়ল সবচেয়ে বেশি?
শিক্ষক / শিক্ষিকাকে জিজ্ঞেস করে বুঝে নাও, শতাংশে ভর বৃদ্ধি কতটা হলো।

6 বল ও শক্তির প্রাথমিক ধারণা

স্থিতি, গতি ও শক্তির ধারণা

রবিন স্কুলে যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। বাড়ির সামনে একটা প্রকান্ড বটগাছ। বটগাছের পাশে একটা গোরু ঘাস খেতে খেতে মনের সুখে মাঠের উপর চরে বেড়াচ্ছে। রাস্তা দিয়ে হুস করে চলে গেল একটা অটোরিকশা, বাইক আর সাইকেল। রাস্তার পাশ দিয়ে ওর স্কুলের আরও কত ছাত্রছাত্রী যাচ্ছে স্কুলের দিকে। আকাশে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে পাখি। রাস্তার পাশে কত ছোটো বড়ো বাড়ি।
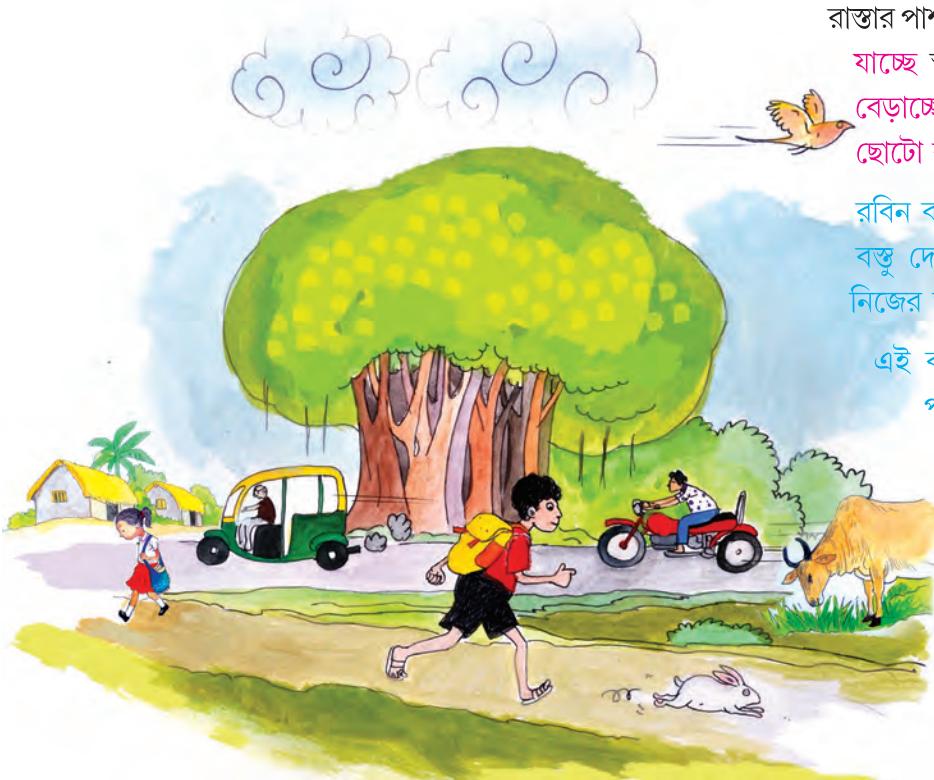
রবিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এমন কোন কোন বস্তু দেখল যারা চলাচল করছে না, অর্থাৎ নিজের জায়গাতেই স্থির আছে?

এই বস্তুগুলো কি সময়ের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করছে?

যে বস্তু সময়ের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে না তাকে '**স্থির বস্তু**' বলে।

এই মুহূর্তে তোমার চারপাশে যেসব স্থির বস্তু রয়েছে তাদের নাম খাতায় লেখো।

এখন রবিনের দেখা 'স্থির বস্তু' নয় এমন অন্যান্য বস্তুগুলোর নাম লেখো।

এবার বলো এই বস্তুগুলো কি সময়ের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করছে?

যে বস্তুগুলো সময়ের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে, তাদের বলে **গতিশীল বস্তু**।

এই মুহূর্তে তোমার চারপাশে যে বস্তুগুলো গতিশীল তাদের নাম খাতায় লেখো।

তুমি চলন্ত ট্রেনে বা বাসে জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকালে বাইরের বস্তুগুলোকে কি রকম অবস্থায় দেখতে পাও? স্থির না চলমান?

ট্রেনের জানালার পাশে বসে পপির দেখা দৃশ্য

তুমি যদি ট্রেনের বাইরে মাঠে বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে তাহলে ওই বস্তুগুলোকে তুমি কেমন দেখতে? স্থির না চলমান?
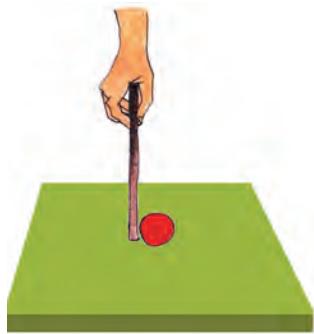
আবার ট্রেন বা বাসের ভিতরে বসে ভেতরের দিকে তাকালে যখন বসার সিট, মেঝে বা ছাদ দেখো তখন তাদের কীরকম দেখো? সচল না স্থির?

যদি ট্রেনের বাইরে মাঠে বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে তুমি ট্রেনের ভেতরের ওই জিনিসগুলোকে দেখতে পেতে, তাহলে তাদের কেমন দেখাত? সচল না স্থির?

তাহলে, কোনো বস্তু ‘স্থির’ না ‘গতিশীল’ -তা যে দেখছে তার অবস্থার উপর নির্ভর করে।
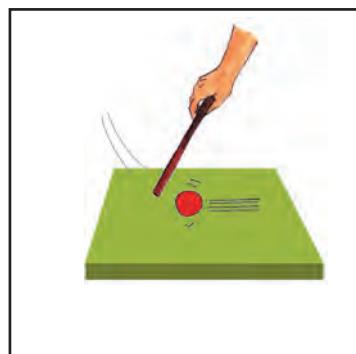
বলের ধারণা ও একক

হাতে কলমে
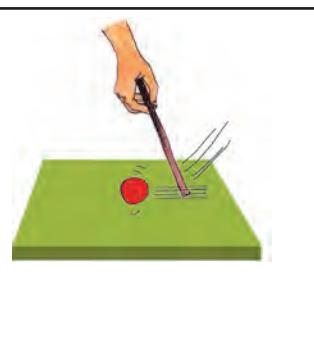
1. মসৃণ মেঝের উপর একটা ছোটো রাবারের বল রাখো। এবার একটা লাঠি দিয়ে আস্তে বলটাকে ধাক্কা দাও।

বলটা কি স্থির থেকে সচল হলো?
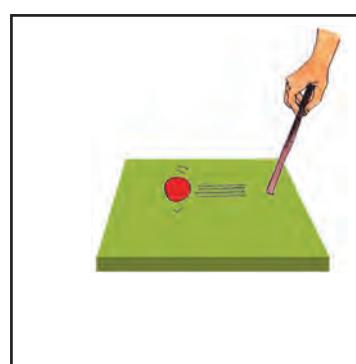
2. বলটাকে আবার সচল করো। চলন্ত বলটাকে এবার বলটা যে দিকে যাচ্ছে সেই দিক করে ওই লাঠি দিয়ে ধাক্কা দাও।

বলটার বেগ কী বেড়ে গেল?
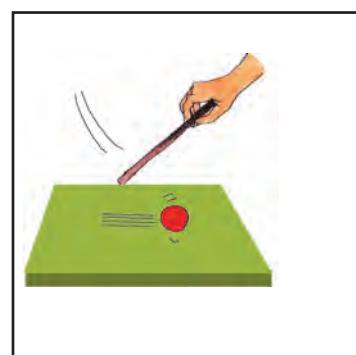
3. বলটাকে আবার সচল করো। এবার বলটা যে দিকে যাচ্ছে তার উলটোদিক থেকে বলটাকে এমনভাবে আস্তে ধাক্কা দাও যাতে বলটা থেমে না গিয়ে ওই একই দিকে গতিশীল থাকে।

বলটার বেগ কী কমে গেল?

4. এবার ওই চলন্ত বলটাকে পাশ থেকে ধাক্কা মারো।

কী দেখতে পেলে? বলটা যে দিকে চলছিল, ধাক্কার পরেও কি সেই দিকেই চলছে, না চলার দিক বদলে গেছে?

5. বলটাকে আবার সচল করো। এবার, বলটাকে লাঠিটা দিয়ে একেবারে থামিয়ে দাও।

উপরের এইসব পরীক্ষা থেকে তুমি কী দেখলে? কোনো স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে বা গতিশীল বস্তুর বেগ বাড়াতে,

কমাতে বা শূন্য করে দিতে বা গতির দিক বদল করতে বাইরে থেকে ওই বস্তুর ওপর ক্রিয়া করতে হয়।

ক্রিকেট বা ফুটবল খেলার মাঠে বল প্রয়োগের এমন উদাহরণ খুঁজে পাও কিনা আলোচনা করো।

নীচের ছকে আমাদের প্রতিদিনের কিছু কাজের কথা লেখা আছে। কোন কাজে টানা, কোন কাজে ঠেলা আর কোন কাজে টানা বা ঠেলা দুটি দরকার। প্রতিটি কাজের পাশে ফাঁকা জায়গায় টিক '✓' চিহ্ন দাও।

কাজ	টানা	ঠেলা
ড্রয়ার বের করলে		
ড্রয়ার বন্ধ করলে		
ফুটবলে কিক করলে		
জামার বোতামের ফুটো দিয়ে তুমি বোতাম ঢোকালে		
দরজা খুললে		
দরজা বন্ধ করলে		
টেবিলকে সরালে		
গাছ থেকে ফুল তুললে		
বঁটি দিয়ে একটা ফল কাটলে		
কুঁয়ো থেকে জল তুললে		
ব্যাগের চেন খুললে		
ব্যাগের চেন আটকালে		
প্লাগ পয়েন্টে প্লাগ গুঁজলে		
প্লাগ পয়েন্ট থেকে প্লাগ খুলে নিলে		
জামার টিপ বোতাম খুললে		
কোল্ড ড্রিংকের বোতলের ছিপি খুললে (বটল ওপেনার দিয়ে)		

তাহলে, সারাদিন নানা কাজে আমাদের কখনও জিনিস টানতে বা কখনও ঠেলতে হয়। এই টানা বা ঠেলা হলো বল প্রয়োগ করা।

বলের প্রভাব

হাতেকলমে

একটা রাবার ব্যান্ড নাও। এবার দু-পাশ থেকে টান দাও

কী দেখতে পেলে?

রাবার ব্যান্ড প্রসারিত হলো কেন?

একটা স্পঞ্জ-এর টুকরো নাও। এখন স্পঞ্জটাকে হাতের তালুর উপর রাখো। এবার হাত জোরে মুঠো করো।

হাত মুঠো করার পর স্পঞ্জটার কী হলো?

স্পঞ্জ চুপসে গেল কেন?

এবার একটা স্প্রিং নাও।

স্প্রিং-এর দু-পাশ থেকে ছবির মতো চাপ দাও।

কী দেখতে পেলে? স্প্রিংটার আকৃতির কী পরিবর্তন হলো?

এখন ছবির মতো করে স্প্রিংটাকে দু-পাশ থেকে টান দাও।

কী দেখতে পেলে? স্প্রিংটা কি প্রসারিত হয়ে দৈর্ঘ্যে বেড়ে গেল?

তাহলে সংকোচন বা প্রসারণ ঘটানোর জন্য বল প্রয়োগের প্রয়োজন।

তাহলে, বল কোনো বস্তুর আকৃতি বা আয়তন পরিবর্তন করতে পারে।

তোমরা দেখেছ যে, কোনো স্প্রিং-কে দু-দিক থেকে জোরে চেপে ধরলে সেটা যতটা সংকুচিত হয়, আলতো করে চাপলে ততটা সংকুচিত হয় না।

তেমনি থেমে থাকা কোনো ফুটবলকে পা দিয়ে ধাক্কা দিলে সেই ফুটবল অনেক দূর এগোবে যদি ধাক্কা জোরালো হয়। আর যদি আলতো করে ধাক্কা দাও তাহলে সেই ফুটবল বেশি দূর যাবে না।বোঝা গেল যে, বলের মান যত বেশি, বলের প্রভাবে সংঘটিত ঘটনার মাত্রাও তত বেশি।
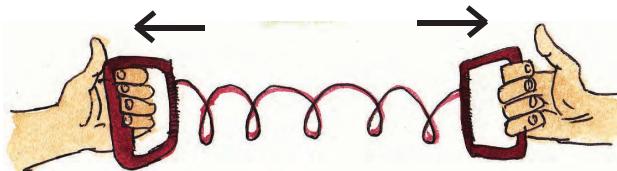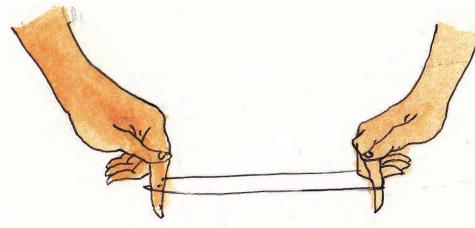
বলের মান বেশি না কম, তা আন্দাজ বা পরিমাপ করার জন্য বলের প্রয়োগের ফলাফল দেখা বা পরিমাপ করা হয়।

তাহলে বলা যায় — বাইরে থেকে প্রযুক্ত যে কারণের ফলে স্থির বস্তু সচল হয় অথবা সমবেগে গতিশীল বস্তু থেমে যায় বা তার বেগ বাড়ে বা কমে বা বেগের দিক পরিবর্তন হয় অথবা ওই বস্তুর আকৃতি বা আয়তনের পরিবর্তন হয় সেই কারণকে **বল (Force)** বলে।

SI পদ্ধতিতে বলের একক **নিউটন**। অন্য আর এক পদ্ধতিতে বলের একক **ডাইন**।

স্পর্শহীন বল

হাতে কলমে

নীচের সারণিটা পূরণ করো।

ঘটনা	কী দিয়ে বল প্রয়োগ করছ ?	কীসের উপর বল প্রয়োগ করছ?	তারা একে অপরকে স্পর্শ করছে কি?	স্পর্শ না করলে কী হতো?
তুমি পা দিয়ে ফুটবলে ধাক্কা দিচ্ছো				
হাতুড়ি দিয়ে পেরেক পুঁতছ				
পেন দিয়ে লিখছ				

ওপরের সারণি থেকে আমরা কী দেখতে পেলাম? সারণিতে উল্লেখ করা প্রতিটি ক্ষেত্রেই বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করার জন্য বস্তুকে স্পর্শ করতে হয়। কিন্তু তুমি যদি একটা চুম্বক নিয়ে তার কাছাকাছি একটা লোহার পেরেক রাখো, তবে কী দেখতে পাবে?

দেখা যাবে পেরেকটাকে স্পর্শ না করেও চুম্বকটা পেরেকটাকে আকর্ষণ করছে। তাহলে স্পর্শ না করেও বস্তুর ওপর বলপ্রয়োগ করা যায়, এই পরীক্ষাটা তা প্রমাণ করে।

তবে চুম্বক কিন্তু সব বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করতে পারে না। চুম্বক নির্দিষ্ট কিছু পদার্থের ওপরই বল প্রয়োগ করতে পারে। সেই পদার্থগুলোকে বলে চৌম্বক পদার্থ। যেমন লোহা, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি।

একটা রবারের বলকে হাত থেকে ছেড়ে দাও। বলটা নীচের দিকে পড়তে শুরু করল। কেউ বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে কি কোনো স্থির বস্তু নিজে থেকে চলতে শুরু করে? তাহলে কে রবারের বলটির ওপর নীচের দিকে বল প্রয়োগ করল?

এক্ষেত্রে এই বল প্রয়োগ করেছে পৃথিবী। কোনো স্পর্শ ছাড়াই এই বল ক্রিয়া করেছে। এই বলের নাম অভিকর্ষ। এই বলেরই আরেক নাম হলো ‘ওজন’। যেহেতু ওজন একটি বল **(Force)** তাই **SI** পদ্ধতিতে ওজনের একক ‘নিউটন’।

ওজনকে পরিমাপ করা হয় স্প্রিং তুলা যন্ত্রের সাহায্যে। সূচকযুক্ত একটা স্প্রিং-এর পাশে একটা ওজন নির্ণায়ক স্কেল থাকে। সূচকটি প্রাথমিকভাবে স্কেলের শূন্য দাগকে সূচিত করে। স্প্রিং-এর নীচের দিকের খোলা প্রান্তে যুক্ত থাকা আংটায় বস্তুকে ঝুলিয়ে দিলে স্প্রিং প্রসারিত হয়। তখন স্কেলের ওপর সূচকের অবস্থান থেকে বস্তুর ওজন জানা যায়।

শক্তির ধারণা, প্রকারভেদ, উৎস ও শক্তি সমস্যা

খেলার মাঠে বা পার্কে অনেকক্ষণ খেলাধুলা করে যখন তুমি ঘরে ফেরো, অথবা সারাক্ষণ স্কুল করে যখন তুমি বাড়ি ফেরো অথবা সারাদিন পিকনিক করে যখন তুমি বাড়ি ফেরো —

তখন কি তোমার শরীরে কাজ করার সামর্থ্য থাকে?

তাহলে ভেবে বলো তো পরিশ্রম করলে আমাদের দেহ থেকে কী খরচ হয়ে যায় যার জন্য আমাদের কাজ করার সামর্থ্য কমে যায়?

অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকলেও কি তোমার এমন হয়? তখনও কাজ করার সামর্থ্য কি তোমার থাকে?

পরিশ্রম করলে আমাদের দেহ থেকে শক্তি খরচ হয়, যা আমরা পাই খাদ্য থেকে। কাজ করার সামর্থ্যই হলো শক্তি।

শক্তির প্রকারভেদ

একটা পোড়া- মাটির ভাঁড় (মিষ্টির ভাঁড়) নাও। একটা পাথর দিয়ে ভাঁড়টাকে স্পর্শ করো।

ভাঁড়ের কি কোনো ক্ষতি হলো বা সরে গেল?

এবার ভাঁড়টাকে মাটির উপর রেখে দূর থেকে জোরে ভাঁড়টাকে লক্ষ করে ওই পাথরটাকে ছুঁড়ে মারো।

এবার কী ভাঁড়টা ভেঙে গেল অথবা সরে গেল?

প্রথম ক্ষেত্রে ভাঁড়ের কোনো ক্ষতি হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হলো কেন?

তাহলে কি পাথরটার গতিই পাথরটার মধ্যে বাড়তি সামর্থ্য জুগিয়ে ছিল?

গতিশীল অবস্থায় বস্তুর মধ্যে কাজ করার যে সামর্থ্য বা শক্তি আসে, তাকে বলে গতিশক্তি (Kinetic Energy)।

তোমার বিদ্যালয়ের ঘন্টাটা এক হাতে ঝোলাও। অন্য হাতে একটা হাতুড়ি নাও। এবার হাতুড়িটি ঘন্টার গায়ে ছুঁয়ে রাখো।

কোনো শব্দ হলো কি?

এবার হাতুড়িটা ঘন্টা থেকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে জোরে ঘন্টার গায়ে আঘাত করো।

এবার শব্দ উৎপন্ন হলো কেন?

প্রথমবার হাতুড়ি স্থির থাকায় তার মধ্যে কোনো গতিশক্তি ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হাতুড়ি গতিশীল থাকায় হাতুড়ির মধ্যে কাজ করার সামর্থ্য তৈরি হয়েছে। তাই দ্বিতীয় বার শব্দ উৎপন্ন হয়েছে।

ঝড়ে কখনো-কখনো বাড়ির ছাউনি উড়িয়ে নিয়ে যায়, ঘর-বাড়ি ভেঙে ফেলে, গাছ বা গাছের ডাল ভেঙে ফেলে।

ঝড়ের প্রচণ্ড গতির জন্য তার মধ্যে গতিশক্তির জোগান হয়। ফলে তা কাজ করার সামর্থ্য লাভ করে।

বায়ুর গতি শক্তি কাজে লাগিয়ে পাল তোলা নৌকা চালানো হয়।

এক বালতি জল নাও। এবার বালতিটা হেলিয়ে ওই জল নরম মাটিতে বা বালির উপর ঢেলে দাও।

মাটিতে বা বালির উপর কি গর্ত তৈরি হলো?

এবার জলসুদ্ধ বালতিটা বেশ কিছুটা উপরে তুলে বালতি থেকে নরম মাটির উপর ক্রমাগত জল ঢালতে থাকো।

কী দেখতে পেলে?

এবার কি জল ঢালার জায়গাটা গর্ত হয়ে গেল? কেন হলো?

আসলে জলসুদ্ধ বালতিকে তুমি উপরে তোলায় জলসুদ্ধ বালতির মধ্যে কাজ করার শক্তির জোগান হয়েছিল। এই শক্তিকে স্থিতিশক্তি বলে। ওই স্থিতিশক্তি পড়তে থাকা জলের গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে জলের কাজ করার সামর্থ্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

একটা পিংপং বল টেবিলের ওপর রাখো। এবার একটা স্টিলের স্কেল ওই বলটার গায়ে স্পর্শ করে রাখো।

বলটা কি সরে বা ছিটকে গেল?

এবার ছবির মতো করে স্টিলের স্কেলটাকে বাঁকিয়ে দু-হাতে ধরে তার সামনে একটা পিংপং বল রাখো এবং ছবির মতো করে বাঁহাতটা ছেড়ে দাও।
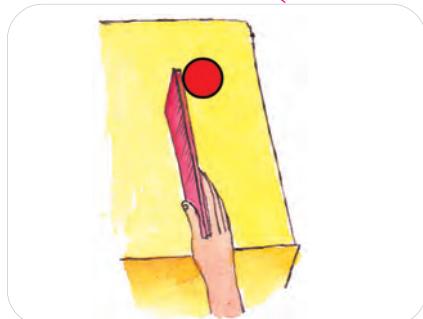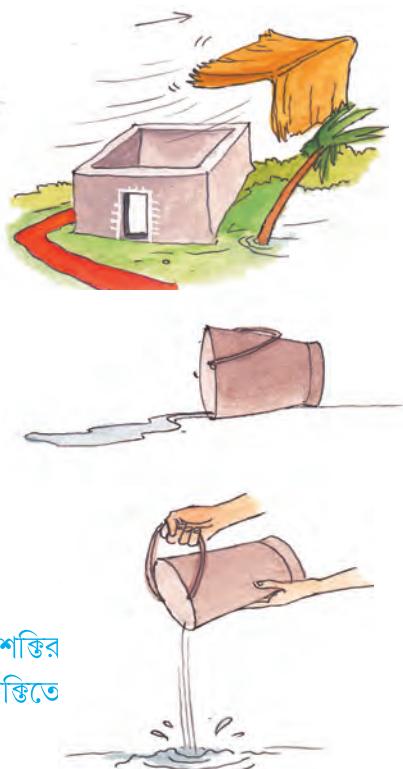
কী দেখতে পেলে?

পিংপং বলটা ছিটকে গেল। কেন?
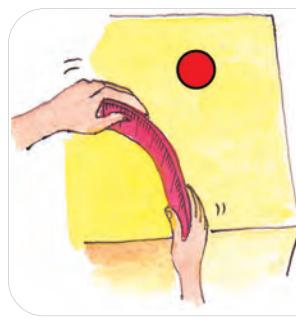
প্রথম ক্ষেত্রে স্কেলটার আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। বলটি স্থির আছে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্কেলটার আকৃতির পরিবর্তন হয়েছে ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলটা ছিটকে গেছে।

তবে নিশ্চয়ই স্কেলটার আকৃতি পরিবর্তন করাতেই তার মধ্যে কাজ করার সামর্থ্যে জোগান হয়েছিল। তাই বলটা ছিটকে গিয়েছিল।

প্রথম ক্ষেত্র

দ্বিতীয় ক্ষেত্র
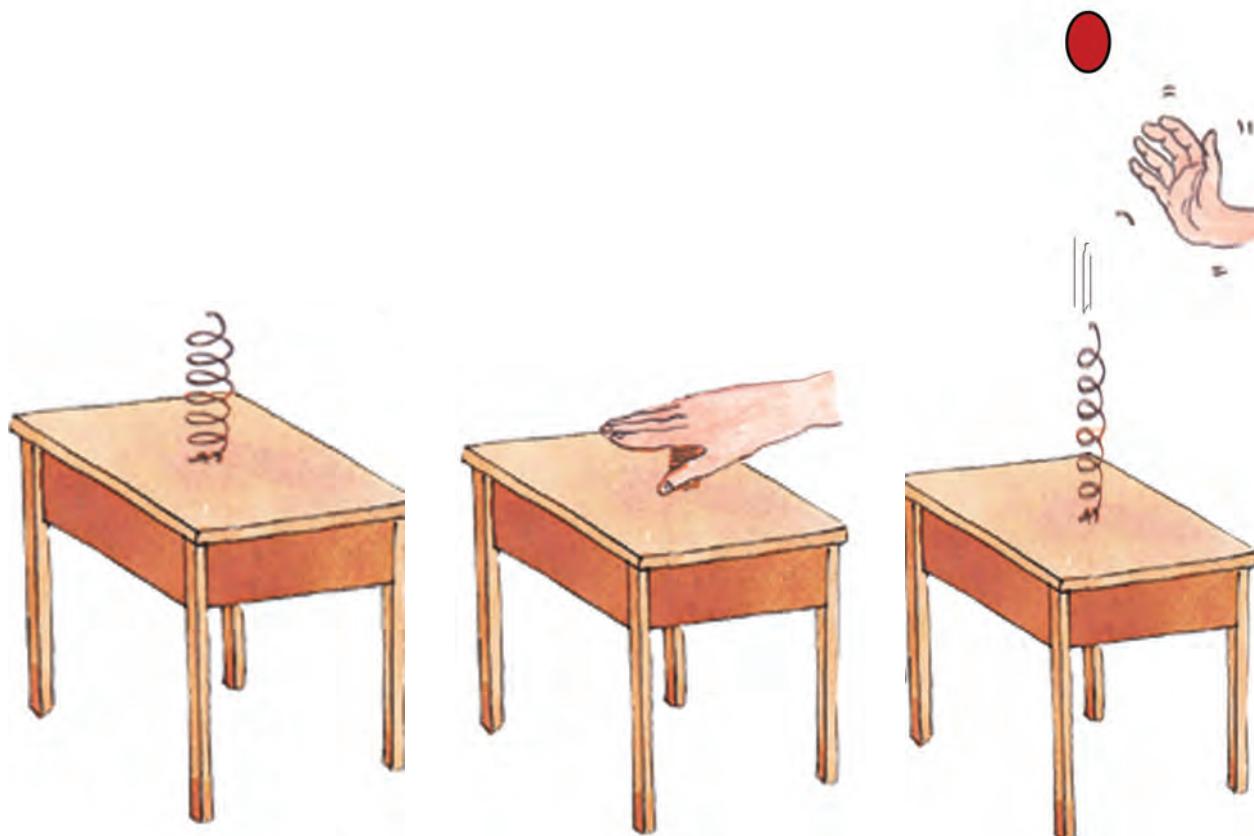
তাহলে, বস্তুর আকৃতির পরিবর্তন ঘটালে বস্তুর মধ্যে কাজ করার সামর্থ্য বা শক্তির জোগান হয়। এই শক্তিকে স্থিতি শক্তি বলে।

একটা স্প্রিংকে টেবিলের উপর ছবির মতো করে আটকে দেওয়া হলো।

এবার স্প্রিংটার উপর একটা ক্যাম্বিস বল রাখা হলো। এবার বলসুদ্ধ স্প্রিংটাকে জোরে চেপে সংকুচিত করো। তারপর হাত সরিয়ে নাও।

কী দেখতে পেলে ? বলটা ছিটকে গেল কেন?

স্প্রিংটাকে চাপ দেওয়ায় তার আকৃতির পরিবর্তন হয়। স্প্রিংটা সংকুচিত হয়ে পড়ে। ফলে স্প্রিং-এর মধ্যে স্থিতি শক্তির জোগান হয় এবং তার মধ্যে কাজ করার সামর্থ্য আসে। তাই হাত তুলে নিলে বলটা ছিটকে যায়। বস্তুর আকৃতির পরিবর্তন ঘটালে বস্তুর মধ্যে কাজ করার সামর্থ্য বা শক্তির জোগান হয়। এই শক্তিকেও স্থিতিশক্তি বলে। স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তিকে একত্রে যান্ত্রিক শক্তি বলে।
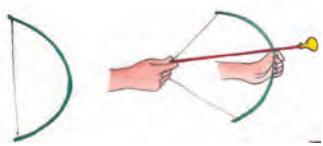
শক্তির রূপান্তর

শক্তি প্রকৃতিতে নানা রূপে থাকতে পারে। এক ধরনের শক্তি অন্য ধরনের শক্তিতে রূপ বদলে নেয় মাত্র।

এমন একটা গাছের বাঁকানো ডাল নাও যা সহজে ভাঙে না ।এবার গাছের ডালটা আরও একটু বাঁকিয়ে সেটার দু-প্রান্তে একটা দড়ির দু-প্রান্ত টাইট করে বেঁধে দাও। আর একটা সরু ও শক্ত লাঠি নাও। লাঠির ডগায়ে একটা ছোটো রবারের বল ফুটো করে লাগিয়ে নাও। এটা তোমার তির। তোমার তির ধনুক তৈরি। এবার ফাঁকা মাঠে গিয়ে ছবির মতো করে তির ছোঁড়ো।

তিরটা ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। খেয়াল করে দেখো যখন তুমি ধনুকের দড়িতে টান দিলে তখন ধনুকের আকৃতির পরিবর্তন হলো। ফলে তার মধ্যে স্থিতিশক্তির জোগান হলো কিন্তু যখন তিরটা ছুটে গেল তখন তিরের মধ্যে গতিশক্তির জোগান হলো।
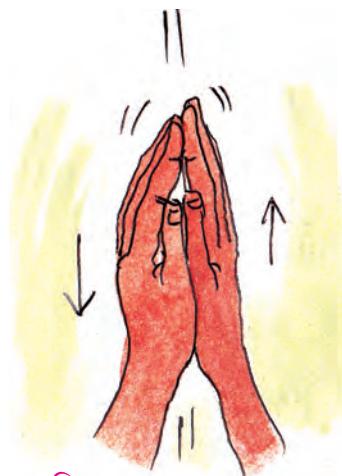
তির কোথা থেকে পেল এই গতিশক্তি?

তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে ধনুকের স্থিতিশক্তি তিরের মধ্যে গতিশক্তিতে রূপ বদলাল।

শক্তির অনেক প্রকার :

1) যান্ত্রিক শক্তি, 2) তাপ শক্তি, 3) শব্দ শক্তি, 4) আলোক শক্তি,

5) তড়িৎ শক্তি, 6) চৌম্বক শক্তি, 7) রাসায়নিক শক্তি ও 8) পারমাণবিক শক্তি।

নমস্কারের ভঙ্গিতে দু-হাত জোড় করে রাখো।

এবার জোরে জোরে দু-হাতের তালু পরস্পর ঘষো।

এবার দু-হাতের তালুতে কী অনুভব করলে?

এই তাপ কোথা থেকে এল?

প্রথম ক্ষেত্রে কোনো তাপ উৎপন্ন হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাপ উৎপন্ন হলো কেন?

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুই তালুর মধ্যেকার ঘর্ষণ বলের বিরুদ্ধে হাত গতিশীল হয়েছে যা প্রথম ক্ষেত্রে হয়নি।

অতএব যান্ত্রিক শক্তিই তাপ-শক্তিতে রূপ বদলেছে।

একটা লাঠিকে 'ঢাক' বা 'টেবিলের' উপর স্পর্শ করে রাখো।
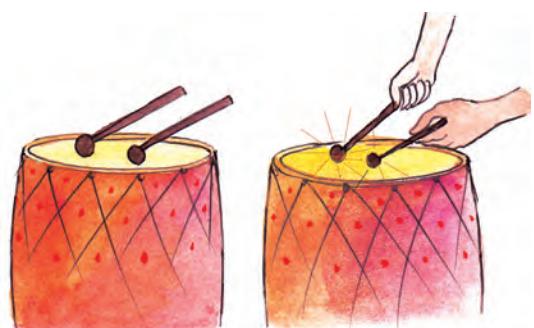
কোনো শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে কি?

এবার লাঠিটা দিয়ে 'ঢাক' বা 'টেবিলের' উপর আঘাত করো।

এবার 'শব্দ' উৎপন্ন হলো কি? কেন?

যান্ত্রিক শক্তিই এখানে শব্দ শক্তিতে রূপ বদলেছে।

এবার পরের পাতায় ঘটনাগুলো নিয়ে দলে আলোচনা করে দেখো সেগুলো যান্ত্রিক শক্তি শব্দ শক্তিতে রূপ বদলের উদাহরণ কিনা।

আর এটাও দেখো কোনটা 'যান্ত্রিক শক্তি' আর কোনটা 'শব্দ শক্তি'।

(1) ঘন্টা বাজানো হচ্ছে, 2) তবলা বাজানো হচ্ছে, (3) রেললাইনের উপর দিয়ে রেলগাড়ি যাওয়ার সময় ঘড়ঘড় শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে, (4) তুমি হাততালি দিচ্ছ।
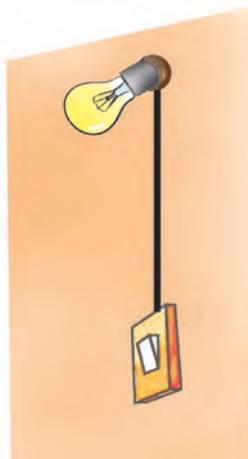
এরকম তোমরা তোমাদের চারপাশের পরিবেশে দেখা আরও ঘটনা নিয়ে আলোচনা করো।

বৈদ্যুতিক পাখার সুইচটা 'অন' করো।

পাখাটা কি চলতে আরম্ভ করল?

পাখাটার সুইচ এবার 'অফ' করে দাও।

পাখাটার চলা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল কেন?

তাহলে পাখাটার সুইচ 'অন' করলে কোন শক্তি পাখাটাতে সরবরাহ হয়? সুইচ 'অফ' করলে সেই শক্তি সরবরাহ কি বন্ধ হয়ে যায়?

অতএব বোঝা গেল বৈদ্যুতিক শক্তিই পাখাটাকে চলতে সাহায্য করল। তাই এক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপ বদলাল।

বালব বা টিউবের সুইচ 'অন' করলে বালব বা টিউব জ্বলে অর্থাৎ আলো দেয়।

এক্ষেত্রে কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপ বদলাল বলতে পারো?

নীচের পরীক্ষাটা তুমি নিজে করবে না। শিক্ষক / শিক্ষিকারা করে দেখাবেন।

অল্প পরিমাণে পোড়া চুন একটা স্টিলের ছড়ানো বাটিতে নেওয়া হবে। তারপর ওই বাটিতে অল্প জল (প্রয়োজন মতো) ঢালা হবে।

কী দেখতে পাচ্ছ?

খুব সাবধানে বাটির গায়ে হাত দাও।

কী অনুভব করলে? এই তাপ এল কোথা থেকে?

পোড়া চুন আর জলের মধ্যে 'রাসায়নিক বিক্রিয়া' হয়। এর ফলে উৎপন্ন হয় তাপ।

তাহলে এক্ষেত্রে 'রাসায়নিক শক্তি' তাপ শক্তিতে রূপ বদলেছে।

একটা চুম্বক নাও। চুম্বকটাকে একটা পেরেকের কাছে নিয়ে যাও।

লোহার পেরেকটা চুম্বকের দিকে এগিয়ে এল কি? কেন এগিয়ে এল?

চুম্বকের আকর্ষণ ধর্মের জন্য চুম্বকটা লোহার পেরেকটাকে আকর্ষণ করেছে। লোহার পেরেকটা চুম্বকের চেয়ে হালকা তাই তা চুম্বকের দিকে এগিয়ে গিয়ে চুম্বকের গায়ে আটকে গেছে।

এক্ষেত্রে চৌম্বক শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে (পেরেকের চুম্বকের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় উৎপন্ন গতি শক্তিতে) রূপ বদলেছে।

হাতেকলমে

নীচের টেবিলটা পূরণ করো। (প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও)

ঘটনা	কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপ বদলাচ্ছে
ইলেকট্রিক ইস্ত্রি চালু করা হলো	তড়িৎ শক্তি ⟶ তাপ শক্তি
মোমবাতি জ্বালানো হলো	
ব্যাটারিচালিত রেডিয়ো চালানো হলো	
কয়লা পোড়ানো হলো	
সৌর কুকার চালু করা হলো	
মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হলো	
একটা স্টিলের পাত্র মাটিতে পড়ে ঝন ঝন শব্দ হলো	
তারাবাজি জ্বালানো হলো	
একটা ক্যাম্বিস বলকে ওপরে ছোঁড়া হলো	
একটা ক্যাম্বিস বলকে ওপর থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো	

ওপরের আলোচনা থেকে তাহলে বলা যায় শক্তিকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। শুধুমাত্র এক প্রকার শক্তি অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে মাত্র। একে শক্তির নিত্যতা সূত্র বলে।

শক্তির উৎস

তোমরা জেনেছ যে আমাদের প্রতিদিনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আমরা খাবার থেকে পাই।

এবার প্রতিদিন তুমি যা যা খাও তার কয়েকটা নীচে লেখো।

....,

.... ।

এখন ওই খাবারের মধ্যে তুমি যা যা প্রাণীদেহ আর উদ্ভিদ থেকে পাও তা নীচের সারণিতে লেখো।

প্রাণীজ উৎস	উদ্ভিজ্জ উৎস

প্রাণীজ উৎসের খাবারগুলো যে যে প্রাণীর দেহ থেকে আসে সেই প্রাণীদের মধ্যে যারা সরাসরি উদ্ভিদ খায় এসো তাদের তালিকা করি।

....,

....।

বাকি প্রাণীরা অন্য কোন প্রাণীদের খায় আর তারাই বা কী খায়?

এভাবে চিন্তা করতে থাকো। দেখো তো, শেষে তুমি সেই উদ্ভিদকেই পাচ্ছ কিনা?

তাহলে একথা বলা যায় পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণীর খাদ্যের উৎস সবুজ উদ্ভিদ।

তোমরা তো জানো সবুজ উদ্ভিদ সূর্যের আলো ও অন্যান্য উপাদানের সাহায্যে নিজের দেহে খাদ্য তৈরি করে।

ভেবে দেখো তো উদ্ভিদ তার দেহে যে খাদ্য তৈরি করে সেই খাদ্যের শক্তির উৎস কী?

তাহলে, দেখা গেল পৃথিবীতে সব খাবারের শক্তির উৎস সূর্য। সূর্যের সৌর শক্তি খাদ্যের মধ্যে রাসায়নিক শক্তি বা স্থিতিশক্তি রূপে জমা থাকে।

আমরা যে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করি তা উৎস ভেদে মূলত দু-রকম

(1) তাপবিদ্যুৎ শক্তি ও (2) জলবিদ্যুৎ শক্তি।

ভেবে লেখো দেখি, মূলত কী কী পুড়িয়ে আমরা তাপবিদ্যুৎ শক্তি পাই?

ক) .... খ) ....

এখন বলো এই উৎসগুলো আমরা পাই কোথা থেকে? সেখানে এগুলো এল কোথা থেকে?

বহু কোটি বছর আগের গাছপালার অবশেষ মাটির নীচে চাপা পড়ে ধীরে ধীরে গরমে আর চাপে ‘কয়লা’য় পরিণত হয়। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ পাললিক শিলার নীচে থাকতে থাকতে বহু কোটি বছর পরে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসে পরিণত হয়। পেট্রোলিয়াম থেকেই আমরা ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি জ্বালানি পাই।

তাহলে, কয়লা ও পেট্রোলিয়ামে জড়ো হওয়া শক্তির উৎসও সূর্য।
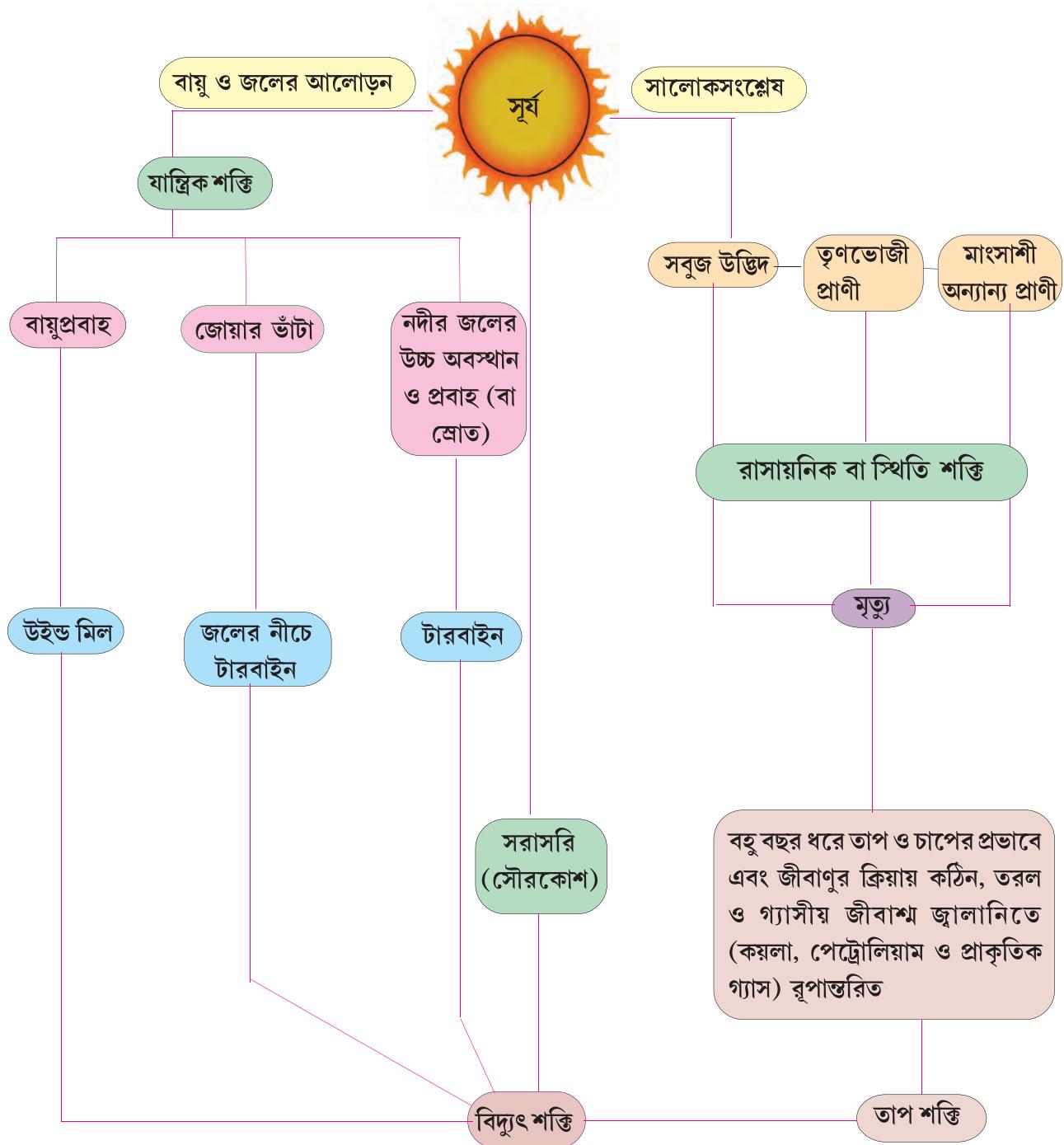
এবার রইল জলবিদ্যুৎ শক্তি।

খরস্রোতা নদীর স্রোতে টারবাইন যন্ত্র বসিয়ে দিলে কী হবে? টারবাইনটা যখন খুব জোরে ঘুরবে, তখন সেই যান্ত্রিক শক্তির রূপ বদলে আমরা পাব বিদ্যুৎ শক্তি।

বৃষ্টি বা পর্বতের মাথায় জমে থাকা বরফই বা কী করে তৈরি হলো?

চিন্তা করো, বৃষ্টি তৈরি আর পর্বতের উপর জমা জলের উৎস যে জলীয় বাষ্প, সেই জলীয় বাষ্প তৈরিতে সূর্যের কী ভূমিকা।

তাহলে, দেখা গেল জলবিদ্যুৎ শক্তি তৈরিতেও মূল ভূমিকা পালন করে সূর্য।

সূর্য
বায়ু ও জলের আলোড়ন
সালোকসংশ্লেষ
যান্ত্রিক শক্তি
সবুজ উদ্ভিদ
তৃণভোজী প্রাণী
মাংসাশী অন্যান্য প্রাণী
বায়ুপ্রবাহ
জোয়ার ভাঁটা
নদীর জলের উচ্চ অবস্থান ও প্রবাহ (বা স্রোত)
রাসায়নিক বা স্থিতি শক্তি
মৃত্যু
উইন্ড মিল
জলের নীচে টারবাইন
টারবাইন
সরাসরি (সৌরকোশ)
বহু বছর ধরে তাপ ও চাপের প্রভাবে এবং জীবাণুর ক্রিয়ায় কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় জীবাশ্ম জ্বালানিতে (কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস) রূপান্তরিত
বিদ্যুৎ শক্তি
তাপ শক্তি

শক্তি শৃঙ্খলের ধারণা

তোমরা আগে প্রাণীজ উৎসের খাদ্য তালিকা তৈরি করেছিলে। সেখানে দেখেছো কিছু প্রাণীরা সরাসরি উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

এরা হলো প্রথম শ্রেণির খাদক।

এবার দেখো তো বাকি প্রাণীদের মধ্যে এমন কোনো প্রাণী পাও কিনা যারা প্রথম শ্রেণির খাদকদের খায়।

এসো তাদেরও একটা তালিকা তৈরি করি। ....।

যাদের তালিকা তৈরি হলো তারা হলো দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক।

আবার এমন কিছু প্রাণীও আছে যারা সরাসরি উদ্ভিদকে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির খাদককেও খায়। এসো, এমন কয়েকটি প্রাণীর তালিকা তৈরি করি।

মানুষ, কাক ....।

এরা হলো সর্বভুক।

উদ্ভিদ নিজেই নিজের খাদ্য দেহে তৈরি করে .... এর আলোর সাহায্যে। (ফাঁকা জায়গায় উপযুক্ত শব্দ বসাও)

নিজের দেহে নিজেই খাদ্য উৎপন্ন করে বলে উদ্ভিদকে বলে উৎপাদক।

তাহলে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় শক্তি পায় কোথা থেকে ?

....।
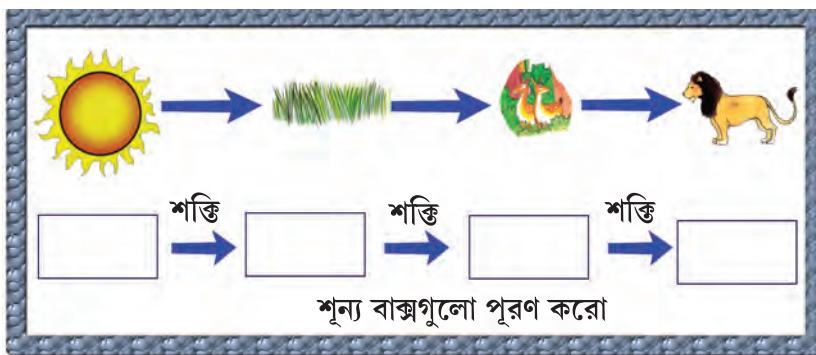
উদ্ভিদকে সরাসরি খায় **প্রথম শ্রেণির খাদক**। তাহলে প্রথম শ্রেণির খাদক কোথা থেকে তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি পায়?

....।
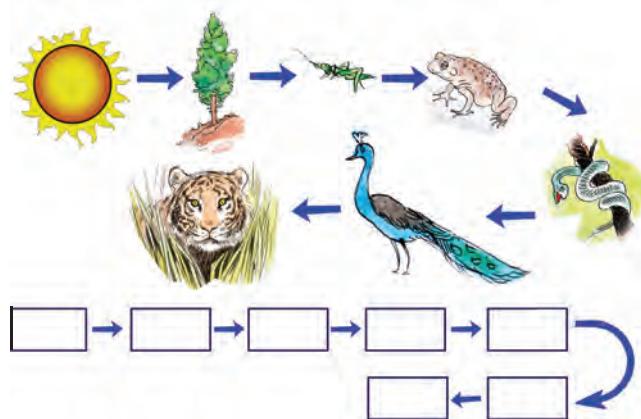
প্রথম শ্রেণির খাদককে খাবার হিসাবে খায় **দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক**। তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি কোথা থেকে পায়? ....।
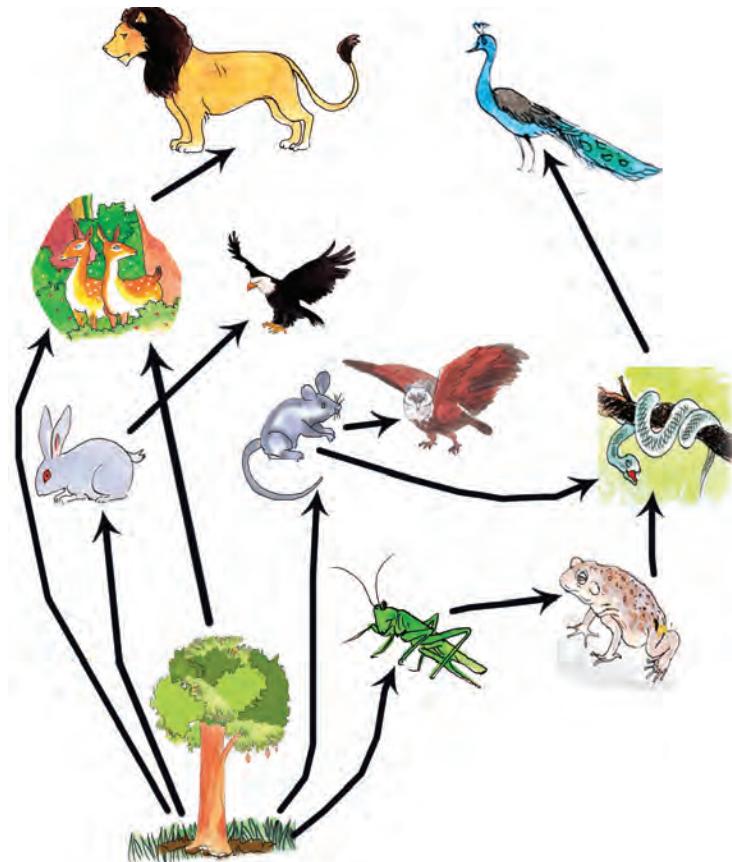
তাহলে যারা সর্বভুক তারা তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি কোথা থেকে পায়? ....।

এসো, এবার একটা খাদ্য শৃঙ্খল (chain) তৈরি করি।
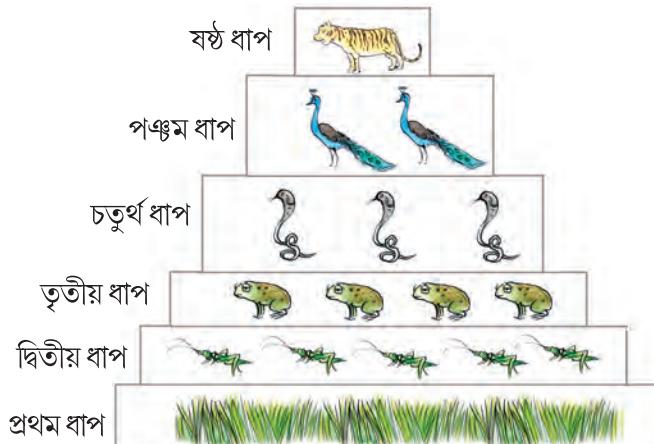
তাহলে তোমরা দেখতে পেলে যে খাদ্যশৃঙ্খলে একটা প্রাণী একবার অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে। তখন সে খাদক। আবার পরে সেই প্রাণীটা নিজেই হয়তো অন্য কোনো প্রাণীর খাদ্য হবে। এরকম পর্যায়ক্রমিক খাদ্য-খাদক সম্পর্কযুক্ত শৃঙ্খলকেই বলা হয় খাদ্য শৃঙ্খল। উপরের খাদ্য শৃঙ্খলে যুক্ত এক জীব থেকে অন্য জীবে পর্যায়ক্রমে শক্তি প্রবাহিত হয়।

ওপরের ছবিটা ভালো করে দেখো। ওপরের ছবিতে কতগুলো খাদ্যশৃঙ্খল দেখতে পাচ্ছ, গুনে লেখার চেষ্টা করো।

....

ছবিতে তাহলে কী দেখলে? একই উদ্ভিদ বা প্রাণী, খাদ্য-খাদক সম্পর্কে যুক্ত হওয়ায় খাদ্যশৃঙ্খলগুলি একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা জালের মতো দেখতে ছবি তৈরি করেছে। পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন খাদ্যশৃঙ্খলগুলো মিলে জালের মতো যে ছবি তৈরি করে সেটাই হলো খাদ্যজাল।

এবারে নীচের ছবিটা ভালো করে দেখো।

1. প্রথম ধাপে যারা আছে তাদের প্রকৃতি কী? ....।

2. দ্বিতীয় ধাপে যারা আছে তাদের প্রকৃতি কী? প্রথম শ্রেণির খাদক।

3. তৃতীয় ধাপে যারা আছে তাদের প্রকৃতি কী? ....।

4. চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ধাপে যারা আছে তাদের প্রকৃতি কী কী? ....।

5. প্রথম ধাপ আর দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ ধাপে যেসব জীবেরা আছে তাদের মধ্যে কী মিল বা অমিল আছে? সেগুলি লেখার চেষ্টা করো। ....।

6. দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ ধাপে যেসব জীবেরা আছে তাদের মধ্যে কী মিল আছে সেগুলো ভেবে লেখার চেষ্টা করো।

তোমরা দেখতে পেলে যে খাদ্যশৃঙ্খলের জীবদের এক একটা আলাদা আলাদা ধাপে রাখা হয়েছে। একটা শৃঙ্খলের উদ্ভিদ আর প্রাণীদের এইভাবে নীচ থেকে ওপরে ধাপে ধাপে সাজানোর ফলে একটা ছবি তৈরি হয়। এই ছবিটাই হলো খাদ্য পিরামিড।

খাদ্য পিরামিডের এক একটা ধাপই হলো এক একটা পুষ্টিস্তর বা ট্রফিক লেভেল (Trophic level)।

প্রাণীরা খাবার কেন খায়? শক্তি পাওয়ার জন্য। আচ্ছা বলো তো প্রথম ধাপে উদ্ভিদের দেহে যা শক্তি জমা ছিল ঘাসফড়িংরা উদ্ভিদদের খাবার হিসেবে গ্রহণ করে কি সেই শক্তি পুরোটাই পায়? আবার একটা ঘাসফড়িং-এর দেহে যতটা শক্তি জমা আছে, একটা ব্যাং ওই ঘাস ফড়িংকে খেয়ে কি সেই শক্তির পুরোটাই পাচ্ছে?

তোমার কী মনে হয় তা খাতায় লেখো। ....।

আসলে উদ্ভিদেরা নিজেদের দেহে খাদ্য তৈরি করার সময় সূর্যের শক্তির যে অংশ শোষণ করে, তার প্রায় দশ শতাংশ (10%) নিজেদের দেহে জমা করে রাখতে পারে বা তাদের দেহ গঠনের কাজে লাগে। উৎপাদক বা সবুজ উদ্ভিদের দেহে জমা থাকা এই

প্রায় দশ শতাংশ শক্তিই পরবর্তী ট্রফিক লেভেলের তৃণভোজী প্রাণীরা খাবার খাওয়ার মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারে। আবার এই তৃণভোজী প্রাণীরা উদ্ভিদদের খাবার হিসেবে গ্রহণ করে যে শক্তি অর্জন করল তার প্রায় দশ শতাংশ সে তার নিজের দেহ গঠনে কাজে লাগায় বা দেহে জমা করে রাখতে পারে। তৃণভোজী প্রাণীদের দেহে জমা থাকা এই দশ শতাংশ (প্রায়) শক্তিই পরের ট্রফিক লেভেলে থাকা মাংসাশী প্রাণীরা খাবারের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারে। তাহলে এর ফলে কী বোঝা গেল? প্রতিটা ট্রফিক লেভেলে মোট গৃহীত শক্তির প্রায় দশ শতাংশ দেহ গঠনের কাজে লাগে। আর কেবলমাত্র এই শক্তিটুকুই পরবর্তী ট্রফিক লেভেলে থাকা প্রাণীরা সংগ্রহ করতে পারে। এক ট্রফিক লেভেলে থেকে অন্য ট্রফিক লেভেলে স্থানান্তরণের সময় শক্তির কতটা অপচয় ঘটে— সেটা একজন বিজ্ঞানী রেমণ্ড লিন্ডেম্যান দেখিয়েছিলেন। তাঁর এই ব্যাখ্যাকে দশ শতাংশ সূত্র (Law of ten percent) বলা হয়।

লিন্ডেম্যানের দশ শতাংশের সূত্র (Law of ten percent)

প্রতিটি ট্রফিক লেভেলে গৃহীত শক্তির প্রায় দশ শতাংশ ওই পুষ্টিস্তরের জীবদের দেহ গঠনের কাজে লাগে যা পরবর্তী ট্রফিক লেভেলের জীবেরা গ্রহণ করতে পারে।

তোমাদের মনে এমন প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে বাকি প্রায় 90 শতাংশ শক্তি কোথায় গেল?

ভেবে লেখার চেষ্টা করো।

1. এক পুষ্টিস্তর থেকে পরবর্তী পুষ্টি স্তরে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময়, শক্তির একটা অংশ নানান শারীরবৃত্তীয় কাজে খরচ হয়। শক্তির এই অংশটুকু আর পরের পুষ্টিস্তরে পৌঁছোতে পারে না।
2. পুষ্টিস্তরের অন্তর্গত জীবরা মরে যায়। মরার পর পচা গলা মৃতদেহ মাটিতে মিশে গেলে পরবর্তী পুষ্টিস্তরের জীবরা ওই শক্তি ব্যবহার করতে পারে না।
3.
4.

পুকুরে, ঘাসজমিতে বা তোমার চেনা কোনো পরিবেশের কী ধরনের খাদ্যের পিরামিড হতে পারে তা একটি ছবি এঁকে দেখাও।

শক্তি সমস্যা

এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো জ্বালানি সমস্যা। জ্বালানী বলতে কয়লা আর পেট্রোলিয়াম, পৃথিবীতে এগুলো আর বেশি নেই, খুব তাড়াতাড়ি শক্তির এই দুই উৎস শেষ হয়ে যাবে। তাহলে উপায়?

এই উপায় খুঁজতেই গোটা দুনিয়া আজ ব্যস্ত।

শক্তির উৎস দুরকম।

(1) **অনবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস :** গোটা বিশ্বেই শক্তির এই উৎস খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। যেমন — কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস।

(2) **নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস :** বলা হয়, শক্তির এই উৎসগুলো কোনোদিন ফুরোবে না। আসলে তা নয়, সব উৎসেরই শেষ আছে। তবে এই উৎস থেকে শক্তি আমরা অনেক অনেক বেশি দিন ধরে পেতে পারি। যেমন - সৌর শক্তি, জোয়ার-ভাঁটার শক্তি, বায়ু শক্তি, জৈবগ্যাস শক্তি ইত্যাদি।

আজ তাই ভারতসহ বিশ্বের সমস্ত দেশ নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস নিয়ে গবেষণা করছে।

খাদ্যের রাসায়নিক শক্তি

রাসায়নিক পরিবর্তনে অণুর গঠন বদলে যায়। অণুর গঠন বদলানোর সময় কখনও কিছুটা শক্তি মুক্ত হয়, কখনও কিছুটা শক্তি বাইরে থেকে শোষিত হয়। খাদ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের সময় খাদ্যের নানা পদার্থের অণুর গঠনে অনেক পরিবর্তন ঘটে এবং কিছুটা শক্তি উৎপন্ন হয়। একেই আমরা খাদ্যের রাসায়নিক শক্তি বলতে পারি। আমরা বহুক্ষেত্রে একেই খাদ্যস্থিত রাসায়নিক শক্তি বা খাদ্যের রাসায়নিক স্থিতিশক্তি বলে থাকি।

তোমরা জেনেছ যে, আমাদের প্রতিদিনের কাজের জন্য দরকারি শক্তি আমরা **খাবার** থেকে পাই।

এসো, এবার একটা তালিকা তৈরি করি।

তুমি প্রতিদিন যা যা খাবার খাও নীচে তা লেখো।

....।

এখন তোমার লেখা উপরের তালিকা থেকে তুমি নীচের তালিকা পূরণ করো।

উদ্ভিদ থেকে পাওয়া খাদ্য	প্রাণীর দেহ থেকে পাওয়া খাদ্য

প্রাত্যহিক জীবনে ঘর্ষণ বল

হাতেকলমে

একটা ফুটবলকে বড়ো একটা মাঠে নিয়ে যাও। এবার বলটা মাঠের ওপর গড়িয়ে দাও।

কী দেখতে পেলে?

বলটার বেগ কি ক্রমশ কমতে লাগল?

শেষে কি বলটা থেমে গেল?

তাহলে কি বলটা চলার সময় প্রতি মুহূর্তে বাধা পাচ্ছিল?

কে এই বাধা দিল?

মাঠই (বল আর মাঠের তলের সংযোগস্থলে) বলের গতির ঠিক উলটোদিকে বাধা দিয়েছে। তাই ফুটবলের গতি কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত শূন্য হয়ে যায়। তাই বলটা থেমে যায়। এই বাধাকেই বলে ঘর্ষণ।

এরকম আরও কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করো। (নীচের টেবিলটা পূরণ করো।)

ঘটনা	কোন দুটি তলের মধ্যে ঘর্ষণ বল কাজ করছে	ঘর্ষণ বলের দিক
মেঝের উপর দিয়ে চাকাযুক্ত খেলনা গাড়িকে উত্তর থেকে দক্ষিণদিকে ঠেলে দাও।		
ইকবাল টেবিলের উপর রাখা বিজ্ঞান বইটা সুনন্দার দিকে ঠেলে দিল।		

হাতেকলমে

হাত ভেজা থাকলে ভালোভাবে শুকিয়ে নাও। এবার দু-হাতের তালু নমস্কারের ভঙ্গিতে জুড়ে ভালোভাবে ঘষো।

দু-হাতের তালুতে তুমি কি গরম অনুভব করছ?

এই উষ্ণতা এল কোত্থেকে?

তুমি একটা ধাতুর তৈরি চাবির রিং নাও। এবার মেঝের উপর রিংটা কিছুক্ষণ ঘষো।

এবার হাত দিয়ে রিংটা ধরো।

কী অনুভব করছ?

রিংটা গরম হলো কেন?

দেশলাই কাঠির বারুদের দিকটা দেশলাই বাক্সের গায়ে বারুদ অংশে ঘষলে দেশলাই কাঠি জ্বলে ওঠে কেন?

দেশলাই বাক্সের দু-পাশে বারুদের খরখরে প্রলেপ দেওয়া থাকে। ফলে দেশলাই কাঠির বারুদ ওই জায়গায় ঘষলে উয়্নতা বেড়ে যায়। ফলে যে উয়্নতায় বারুদ জ্বলে ওঠে, সেই উয়্নতায় বারুদ পৌঁছে যায়। তাই আগুন জ্বলে ওঠে।

উপরের প্রতিক্ষেত্রেই যে তলদুটোর মধ্যে ঘর্ষণ হয়েছে, সেই তলদুটো গরম হয়ে গেছে। অর্থাৎ ঘর্ষণের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়।

ঘর্ষণের ফলে উয়্নতা বাড়ে — এর আরও কয়েকটা উদাহরণ নিয়ে বলাবলি করো।

তোমার পেনসিলের দাগ মোছার ইরেজার অনেক দিন ব্যবহারের ফলে তার কী অবস্থা হয়?

ইরেজারের ভর, আয়তন সব কমে যায় কেন?

ইরেজার একটা নরম রাবার মাত্র। পেনসিলের দাগ মোছার সময় তুমি ইরেজারটা নিয়ে কী করো?

এর ফলে ইরেজারের কী ক্ষতি হয়?

অতএব সিদ্ধান্তে আসা যায় ঘর্ষণের ফলে বস্তুর ক্ষয় হয়।

এই কারনেই গাড়ির টায়ারের সঙ্গে রাস্তার ঘর্ষণের ফলে টায়ারের ক্ষয় হতে থাকে।

তুমি একটা রাবারের বল নিয়ে ঘাস আছে এমন মাঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে দাও। এবার ফিতে দিয়ে মেপে দেখো বলটা কতদূর গড়াল।
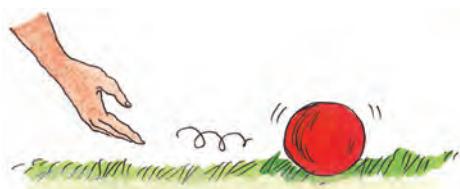
এখন বলটাকে আন্দাজমতো সমান জোরে একটা মসৃণ সিমেন্টের মেঝের উপর গড়িয়ে দাও।

আবার ফিতে দিয়ে মেপে দেখো বলটা কতদূর গড়াল।

এবার ভেবে বলো মেঝের উপর দিয়ে বলটা বেশি গড়াতে পারল কেন?
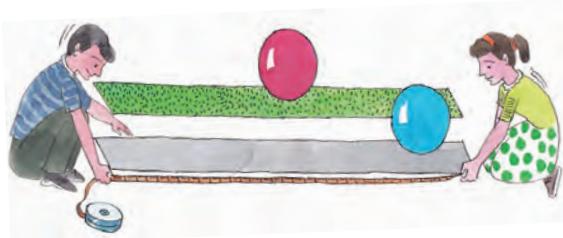
তাহলে কি মাঠের উপর দিয়ে গড়াবার সময় বলটা ঘর্ষণজনিত বাধা বেশি পেয়েছে? কেন?

সমান সিমেন্টের মেঝের উপর দিয়ে গড়াবার সময় বলটা ঘর্ষণজনিত বাধা কম পেল কেন?

মাঠের তল আর মসৃণ মেঝের তলের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

কোন তলটা বেশি মসৃণ?
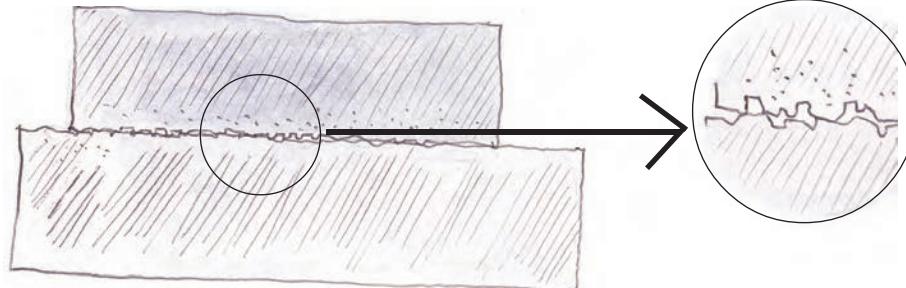
তবে কি মসৃণ তলে ঘর্ষণ কম হয়?

তাহলে, তলের প্রকৃতি (মসৃণ বা অমসৃণ) ঘর্ষণের উপর প্রভাব ফেলে। তলের মসৃণতা যত বেশি হয় ঘর্ষণ তত কম হয়।

যে-কোনো তলের উপরিভাগে অসংখ্য উঁচুনীচু বা এবড়োখেবড়ো

অংশ থাকে। ওই উঁচুনীচু কখনও এত কম যে, চোখে ধরা পড়ে না। ওই তলের উপর দিয়ে যখন কোনো বস্তু চলতে চায় তখন ওই উঁচুনীচু অংশগুলো চলন্ত বস্তুর স্পর্শতলের উঁচুনীচু অংশে বাধা পায়। এটাই ঘর্ষণ।

কোনো তলই সম্পূর্ণ মসৃণ নয়। খালি চোখে কোনো তলকে যতই মসৃণ বলে মনে হোক না কেন, ওই তলকে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, ওই তলের উপরিভাগে অসংখ্য উঁচুনীচু অংশ আছে। সুতরাং, ওই তলও সম্পূর্ণ মসৃণ নয়।

ঘর্ষণ বল যে দুই তলের মধ্যে ক্রিয়াশীল সেই তলদুটো প্রত্যেকে আলাদাভাবে একে অপরকে ঘর্ষণ বল প্রদান করে। অর্থাৎ প্রথম তল দ্বিতীয় তলকে ও দ্বিতীয় তল প্রথম তলকে ঘর্ষণ বল প্রদান করে।

নীচের ছবির মতো একটা কাঠের ব্লক নাও। এবার ওই ব্লকটা দেয়ালের গায়ে চেপে ধরো। এখন বন্ধুকে বলো ব্লকটাকে উপর থেকে নীচের দিকে ঠেলে সরাতে।

তোমার বন্ধু কি ব্লকটা সরাতে পারল?

এবার তুমি আরো জোরে ব্লকটাকে চেপে ধরো। বন্ধুকেও আগের চেয়ে জোরে ঠেলতে বলো।

কী দেখতে পেলে, বন্ধু কি সফল হতে পারল?

বন্ধু যদি সফল হয়ে থাকে, তবে আগের বারের চেয়ে এবারে বন্ধুকে কি বেশি বল প্রয়োগ করতে হয়েছে?

এই পরীক্ষাটিতে তুমি দেখলে যে, যদি কোনো বস্তুকে কোনো একটি তলের ওপর জোরে চেপে রাখা হয় তাহলে দুই তলের মধ্যে ঘর্ষণ বল বেশি হয়। টেবিলের উপর বই রেখে সেটিকে যদি টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করো, দেখবে যে যদি ওই বই -এর ওপর আরো কয়েকটা বই রাখা থাকে তবে তোমাকে অনেক জোরে ঠেলতে হবে। বাড়তি বই থাকলে বইও টেবিলের সংযোগস্থলে বেশি পরিমাণ বল প্রয়োগ করে এবং বইটা টেবিলের সঙ্গে বেশি জোরে চেপে যায়— ফলে ঘর্ষণ বল বেড়ে যায়।

7 তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের স্থিতি ও গতি

চাপের ধারণা

হাতেকলমে

এস কয়েকটা পরীক্ষা করা যাক :

উপকরণ : একটা গ্লাস, দু-টুকরো কাগজ, একটা রাবার ব্যান্ড ও পেছনটা ভোঁতা এমন একটা ডটপেন।

ছবির মতো করে, কাগজের টুকরোটাকে রাবার ব্যান্ড দিয়ে গ্লাসের মুখে ভালো করে আটকাও। গ্লাসের মুখে কাগজটা যেন টান টান থাকে।

এখন ছবির মতন করে প্রথমে পেনের পেছন দিক দিয়ে কাগজের টুকরোটাকে ফুটো করার চেষ্টাকর।

এবার দ্বিতীয় কাগজটা নিয়ে একইভাবে পরীক্ষাটা আবার করো। তবে এবার পেনের নিব অংশ দিয়ে কাগজটা ফুটো করার চেষ্টা করো।

ভেবে বলো তো, একই জোরে বলপ্রয়োগ করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কাগজ সহজে ফুটো হয়েছে কেন?

পেনের নিব অংশের ছাপ

এখন পেনের পেছনটাতে একটু যে-কোনো রং বা কালি লাগাও। একটা সাদা কাগজে ওই অংশের ছাপ নাও। এবার সামনের নিব অংশ দিয়েও (আগের ছাপের পাশে) ছাপ নাও। (পাশের ছবির মতো)

দেখত, কোন ছাপটা চেহারায় বড়ো। যেটার চেহারা বড়ো তার ক্ষেত্রফলও বেশি।

তাহলে কি পেন ও কাগজের **স্পর্শতলের ক্ষেত্রফলের** সঙ্গে সহজে ফুটো হওয়ার কোনো সম্পর্ক আছে?

হাতেকলমে

একটা ভোঁতা মুখ ও আর একটা সুচালো মুখের পেরেক নাও। হাতুড়ি দিয়ে একইজোরে আঘাত করে দুটো পেরেককেই একটা কাঠের টুকরোর মধ্যে প্রবেশ করাবার চেষ্টা করো।

কী দেখলে?
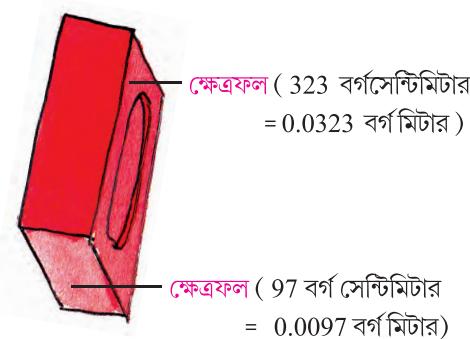
সরু মুখের পেরেকটা সহজেই কাঠে প্রবেশ করল। কিন্তু ভোঁতা মুখের পেরেক একইজোরে ঘা দেওয়া সত্ত্বেও, কাঠে প্রবেশই করল না। অথবা করলেও অতি সামান্য।

এবার দেখো তো কোন পেরেকের মুখের স্পর্শতলের ক্ষেত্রফল বেশি?

তাহলে দুটি পরীক্ষাই একই দিকে ইঙ্গিত করছে। **দু-ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, বল ঠিক ততটুকু জায়গায় প্রযুক্ত হচ্ছে, তার ক্ষেত্রফল বিভিন্ন হলে একই বল প্রয়োগ করা সত্ত্বেও বলের ফলাফল বিভিন্ন হয়।**

হাতেকলমে

একটা ইটকে দু-ভাবে (ছবিতে দেখো) একই উচ্চতা থেকে বালির ওপর ফেলা হলো। দু-ক্ষেত্রেই বালিতে তৈরি হওয়া গর্তের গভীরতা চোখের আন্দাজে তুলনা করো।

একই ওজনের ইট একই উচ্চতা থেকে বালির ওপর পড়লে যেভাবেই পড়ুক, সমান বল (ধরা যাক প্রায় 25 নিউটন বল) প্রয়োগ করবে।

তুমি হিসেব করে দেখো, কোন ক্ষেত্রে $\frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$ এর মান বেশি ।

প্রথম ক্ষেত্রে , $\frac{25 \text{ নিউটন}}{0.0097 \text{ বর্গমিটার}} = 2577.32$ নিউটন / বর্গমিটার।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে , $\frac{25 \text{ নিউটন}}{0.0323 \text{ বর্গমিটার}} = 773.99$ নিউটন / বর্গমিটার।

এবার দেখো তো, যেক্ষেত্রে $\frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$ এর মান বেশি, সেই ক্ষেত্রেই কি বালিতে তৈরি হওয়া গর্ত বেশি গভীর?

এই $\frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$-কেই চাপ বলা হয়। অর্থাৎ একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রযুক্ত বলই হলো চাপ। অতএব, একই ক্ষেত্রফলের ওপর যদি বলের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে চাপের পরিমাণ বেশি হবে। আবার, একই পরিমাণ বল কম ক্ষেত্রফলের ওপর প্রযুক্ত হলে চাপের পরিমাণ বেশি হবে।

SI পদ্ধতিতে চাপের একক $= \frac{1 \text{ নিউটন}}{1 \text{ বর্গমিটার}}$

= 1 পাস্কাল বা 1 Pa

চাপের বড়ো একক হলো

1 কিলো পাস্কাল = 1000 পাস্কাল।

তাহলে জানা গেল, একই বল প্রযুক্ত হলে বলের প্রয়োগ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যত কমবে চাপও তত বাড়বে।

সুচ, পেরেক, স্ক্রু, ছুরি, কাটারি, বঁটি ইত্যাদি বস্তুতে এই নীতিকে কাজে লাগানো হয়েছে। এদের কার্যকরী অংশের ক্ষেত্রফল কমাতে সেই অংশ সরু অথবা ধারালো করা হয়েছে।

চাপের প্রভাব

হাতেকলমে
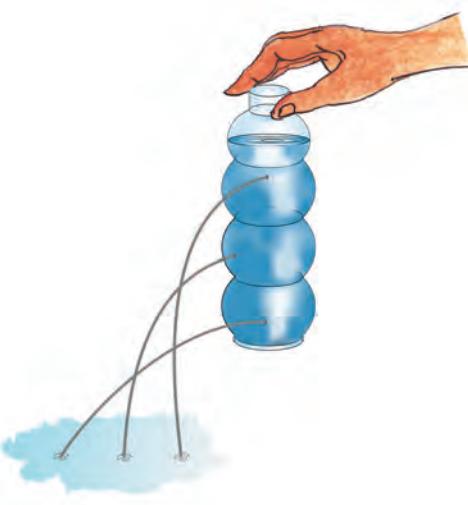
একটি এক লিটারের জলের বোতল নাও। বোতলের গায়ে বিভিন্ন উচ্চতায় তিনটে ফুটো করো। ফুটো তিনটি যেন একই সরলরেখায় না থাকে। এবার তাতে জল ভরতি করো। এবার ছবির মতো করে বোতলটিকে ধরে রাখ। দেখো তো কোন ফুটো দিয়ে জল বেশি জোরে বেরিয়ে আসছে ও বেশি দূরে যাচ্ছে?

তাহলে, যেখানকার জল বেশি দূরে যাচ্ছে সেখানে নিশ্চয়ই জলের চাপ বেশি।

এবার বলো তো জলের গভীরতা বাড়লে চাপ বাড়ে না কমে?
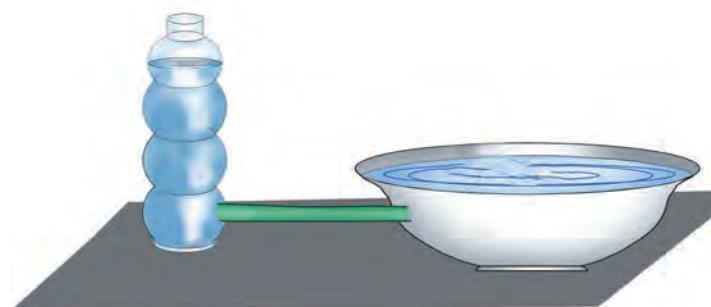
এই কারণেই জলের চাপ কাটিয়ে সহজে চলার জন্য কোনো কোনো মাছ চ্যাপটা হয়।

এবার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে বলো— নদী বাঁধের তলদেশ চওড়া হয় কেন?

হাতেকলমে

একটি বড়ো 2 লিটারের জলের প্লাস্টিক বোতল নাও। বোতলটি জলে ভরতি করো। এবার একটি বড়ো ছড়ানো গামলা নাও। গামলাটিতে ওই জলের বোতলের প্রায় চার বোতল জল যাতে ধরে। বোতল ও গামলাটিকে মেঝের উপর রাখো। একটা প্লাস্টিক বা রাবারের নল দিয়ে পাত্র দুটো যুক্ত করো (ছবির মতো)। পাত্র দুটো এবং নলটির সংযোগস্থল দিয়ে যেন জল বাইরে বেরিয়ে না যায়। ছবি দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, জল বেশি ধরলেও গামলায় জলের উচ্চতা বোতলের জলের উচ্চতার চেয়ে কম।

বলতে পারো, জল বোতল থেকে গামলার দিকে, না গামলা থেকে বোতলের দিকে প্রবাহিত হবে?

নিজে হাতে পরীক্ষাটি করলেই দেখতে পাবে যে বোতল থেকে জল গামলায় যাচ্ছে, যদিও গামলায় জলের পরিমাণ বেশি। এ থেকে বোঝা যায় যে তরলের প্রবাহ তরলের পরিমাণ দিয়ে ঠিক হয় না, তরলের উচ্চতা দিয়ে ঠিক হয়। বোতলের জলের পরিমাণ কম কিন্তু উচ্চতা বেশি। আর যেখানে উচ্চতা বেশি সেখানে গভীরতাও বেশি— তাই চাপও বেশি। বোতল থেকে গামলায় জল প্রবাহিত হয়েছে কারণ গামলায় জলের উচ্চতা বোতলের চেয়ে কম।
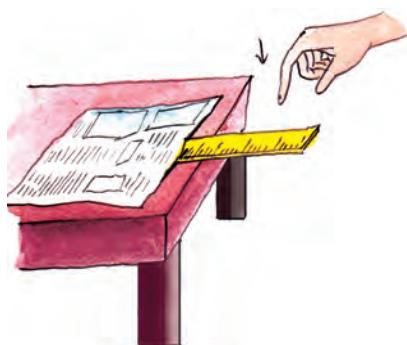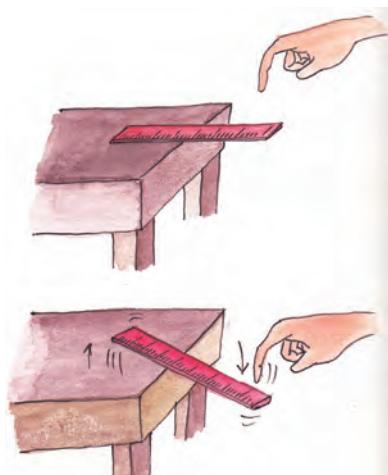
কোনো তরল বা গ্যাসের দুই স্থানে যদি চাপ অসমান হয় তবে, বেশি চাপের স্থান থেকে কম চাপের স্থানে তরল বা গ্যাস প্রবাহিত হয়।

হাতেকলমে

1) একটা টেবিলের ওপর কাঠ বা প্লাস্টিকের একটা বড়ো স্কেল রাখো। স্কেলটার কিছু অংশ টেবিলের বাইরে থাকবে। বেশিরভাগ অংশ টেবিলের ওপর থাকবে। ছবিতে দেখো।

এখন টেবিলের বাইরে থাকা অংশে স্কেলটার ওপর হঠাৎ করে চাপ দাও (সামান্য জোর দিলেই হবে)। কী দেখতে পেলে? স্কেলটা চট করে টেবিল থেকে উঠে গেল।

এবার, আবার স্কেলটা আগের মতো করে টেবিলের ওপর রাখো। এখন একটা বড়ো কাগজ (যেমন খবরের কাগজ), টেবিলের ওপর টান টান করে বিছিয়ে দাও ও তার ওপর হাত বুলিয়ে টেবিলের গায়ে চেপে দাও। খেয়াল রাখো যাতে টেবিলের ওপর রাখা স্কেলের পুরো অংশটা ঢেকে যায়।

এবার, আবার স্কেলটার যে অংশ টেবিলের বাইরে আছে তার ওপর হঠাৎ করে চাপ দাও। এবার কি স্কেলটা চট করে উঠে আসতে পারল?

তাহলে কি স্কেলটাকে কেউ ওপর থেকে চাপ দিয়ে আটকে রেখেছিল?

স্কেলটার ওপরের হালকা কাগজটাই কি তাহলে স্কেলটাকে চাপ দিয়েছিল? যদি তাই হয়, তবে কাগজটাকে কে চেপে রেখেছিল? বায়ু ছাড়া তো কাগজের ওপর কিছু ছিল না।

তাহলে কি বায়ুই এই চাপ সৃষ্টির কারণ?

বড়ো ক্ষেত্রফলের ওপর চাপের প্রভাবে বেশি পরিমাণ বল ক্রিয়া করে এটা তোমরা জেনেছ (চাপ × ক্ষেত্রফল = বল)।

স্কেলের ওপর চাপা দেওয়া কাগজের ক্ষেত্রফল যেহেতু স্কেলের চাইতে বেশি, তাই কাগজের ওপর বায়ুর দেওয়া বল যথেষ্ট বেশি। বায়ুর চাপের ফলেই এই বলের সৃষ্টি হয়েছে।

2) বিছানার ওপর চাদরটা টান টান করে পাতা আছে। তুমি চাদরটাকে টান দিয়ে তুলে ফেলার চেষ্টা করো দেখি।
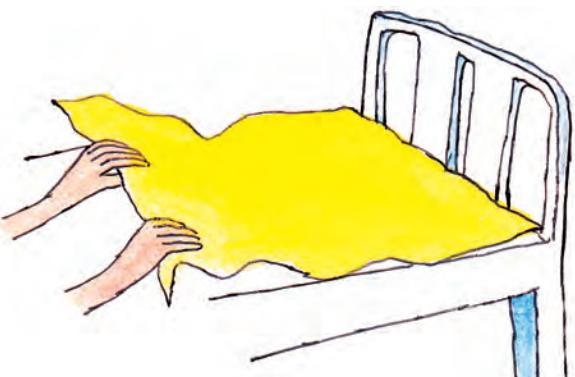
কী দেখতে পেলে?

পুরো চাদরটাই কি সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে এল?
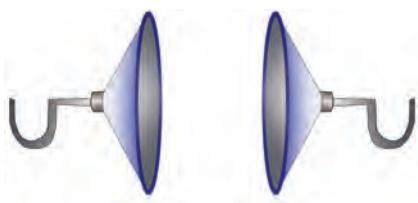
চাদরের কিছুটা অংশ বিছানার সঙ্গে লেগে থাকতে চাইছে কেন?

তাহলে কি ওপর থেকে চাদরটার ওপর চাপ পড়ছে? চাদরের ওপরে তো বায়ু ছাড়া কিছু নেই।

আসলে, বায়ু ওপর থেকে নীচের দিকে চাদরটার ওপর চাপ দেওয়ার ফলেই ঘটনাটা ঘটেছে।
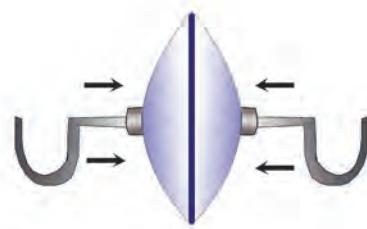
3) ট্রেনে বা বাসে ফেরিওয়ালার কাছে অথবা রকমারি জিনিসের দোকানে প্লাস্টিকের তৈরি এক ধরনের হুক পাওয়া যায় যার পেছনের অংশ রাবারের তৈরি। যেটা দেয়ালে বা কোনো মসৃণ তলে চেপে ধরলেই আটকে যায়। আঠা বা পেরেক ছাড়াই। তারপর সেখানে জামা বা হালকা কিছু ঝোলানো যায়। ছবিতে এরকম হুক দেখানো হয়েছে। ওইরকম দুটো হুক নিয়ে চলো একটা পরীক্ষা করা যাক। ছবির মতো করে হুক দুটোর পেছন দিক (রবারের অংশ) এক সঙ্গে স্পর্শ করে চাপ দাও।

এবার দু-দিক থেকে আংটা দুটোকে জোরে টেনে খোলার চেষ্টা করো।

আংটা দুটো খুলছে না কেন?

এক্ষেত্রেও বায়ুর চাপের জন্যই ঘটনাটা ঘটেছে। হুক দুটোর পেছন দিক একসঙ্গে স্পর্শ করে চাপ দেওয়ার সময় রাবারের অংশ দুটো গায়ে গায়ে লেগে যায় ও তাদের ভেতরের বায়ু বেরিয়ে যায়। বাইরের বায়ু ওই রাবারের অংশ দুটির ওপর যে চাপ দেয় তাতে হুক দুটো জোরে আটকে যায়।

বন্ধু ও শিক্ষক -শিক্ষিকার সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করো।

বারনৌলির নীতির ধারণা
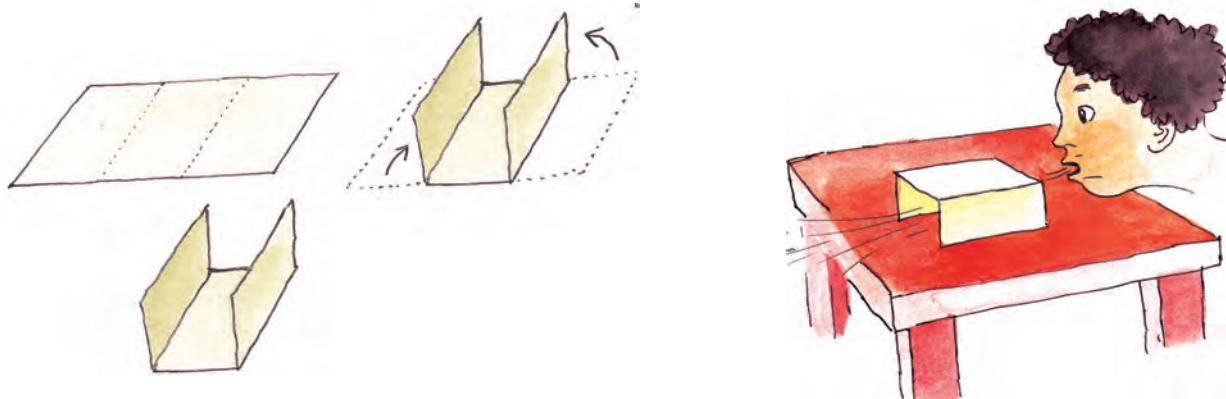
1) একটা খাতার পৃষ্ঠা নাও। পৃষ্ঠাটির দু-পাশ সমান মাপে ভাঁজ করো (নীচের ছবি দেখো)। তৈরি হলো একটা ব্রিজ।

এখন ওই খেলনা ব্রিজটা টেবিলের ওপর রাখো (ছবিতে দেখো)।

এখন, ওই ব্রিজটার তলা দিয়ে জোরে জোরে ফুঁ দিয়ে ব্রিজটাকে টেবিল থেকে ফেলে দাও দেখি। কিন্তু ব্রিজের দেয়ালে সরাসরি ফুঁ দেওয়া চলবে না।

কি , পারা গেল না তো। এবার চিন্তা করো, পারা গেল না কেন?

তাহলে, নিশ্চয়ই তোমার দেওয়া ‘ফুঁ’ ব্রিজের দেয়ালে তেমনকোনো বল প্রয়োগ করতে পারেনি।

আসলে, কোনো গ্যাস বা তরল গতিশীল হলে যে স্থানে ওই তরল বা গ্যাসের বেগ বেশি সেই স্থানে ওই গ্যাস বা তরলের

চাপ কম হয়। — **বিজ্ঞানী বারনৌলি তাঁর নীতিতে এই কথাই বলেছেন**। তাই ফুঁ দেবার সময় ব্রিজের তলার অংশে চাপ কমে গেছে, এবং ব্রিজের ওপরে বায়ুর দেওয়া চাপ তখন তলার চাপের চাইতে বেশি। ফলে ব্রিজের ছাদ নীচের দিকে চেপে বসেছে ও ব্রিজটা পড়ে যায়নি।

2) তোমার খাতার পৃষ্ঠার মতো একটা কাগজ নাও। এবার পাশের ছবির মতো করে জোরে জোরে ফুঁ দাও। থামো। আবার ফুঁ দাও।

(ক) (খ)

কী দেখতে পেলে? যতক্ষণ ফুঁ দিচ্ছিলে, ততক্ষণ কাগজটা সামনের দিকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে (চিত্র-ক)। কিন্তু যেই তুমি ফুঁ দেওয়া বন্ধ করছ, কাগজটা হাত থেকে নীচের দিকে ঝুলে যাচ্ছে। (চিত্র-খ)

এমনটা কেন হচ্ছে? তাহলে কি নীচ দিক থেকে ওপরের দিকে কাগজটার ওপর কোন বল প্রযুক্ত হচ্ছে?

আসলে, তোমরা আগের পরীক্ষা থেকে জেনেছ কোনো গতিশীল গ্যাস বা তরল, যে স্থানে বেশি বেগ নিয়ে চলে সেই স্থানে ওই গ্যাস বা তরলের চাপ কম হয়।

এই কারণে তুমি যখন কাগজের ওপর দিয়ে জোরে ফুঁ দিচ্ছিলে, তখন ওই স্থানে গতিশীল বায়ুর চাপ কমে গিয়েছিল। কাগজের নীচের বায়ুর চাপ তখন উপরের বায়ুর চাপের চাইতে বেশি। ফলে নীচের বায়ু কাগজের নীচ থেকে ওপরের দিকে যে বল প্রয়োগ করেছে তা কাগজের উপরের তলের উপর বায়ুর বলের চেয়ে বেশি। তাই কাগজ নীচে নামতে পারেনি।

3) খাতার পৃষ্ঠার মতো দুটো কাগজ ছবির মতো করে তোমার মুখের কাছে ধরো।

দুই কাগজের মাঝে সামান্য ফাঁক থাকবে।

এবার জোরে কাগজ দুটোর মধ্যে দিয়ে ফুঁ দিতে থাকো।

কী দেখতে পেলে?

জোরে ফুঁ দিলেই কাগজ দুটো জোড়া লেগে যাচ্ছে কেন? ফুঁ-এর ধাক্কায় তো তাদের দূরে সরে যাওয়ার কথা।

দুই কাগজের মধ্য দিয়ে ফুঁ-এর বায়ু যখন বেগে প্রবাহিত হচ্ছে তখন ওই জায়গায় বায়ুর চাপ কমে যাচ্ছে। ফলে কাগজের দুই পাশের বায়ু কাগজ দুটোর ওপর লম্বভাবে যে চাপ দেয় তা ভেতরে ফুঁ-এর জায়গার বায়ুর চাপের চেয়ে বেশি। তাই কাগজ দুটো জোড়া লেগে যায়।

হৃৎপিণ্ড

তোমরা পঞ্চম শ্রেণিতে তোমাদের বানানো যন্ত্র দিয়ে হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনেছ। এবারে এসো দেখি, হৃৎপিণ্ডের শব্দটা ঠিক কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারি কিনা। জোগাড় করো: একটা প্লাস্টিকের ফানেল (ফাঁদি, কাপা বা কুপো), আর একটা পিচবোর্ড বা মোটা রাবারের নল, যা ওই ফানেলটার নলে লাগানো যাবে। ফানেলটার নলের সঙ্গে রাবারের নলটা আটকে দাও। তোমার বানানো এই ছোট্ট যন্ত্রটার মতো যন্ত্র কাকে ব্যবহার করতে দেখেছ, বলো তো?

এবার হৃৎপিণ্ডের শব্দ খুঁজে বার করো। কীভাবে টের পাবে হৃৎপিণ্ডটা কোথায় আছে? ....

- শিক্ষক/শিক্ষিকার উপস্থিতিতে প্রথমে তোমার ডান হাতের চেটো নিজের বুক আর বন্ধুর পিঠের ওপর রেখে দেখো তো, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনটা কোথায় সবচেয়ে বেশি।
- তারপর ওই ছোট্ট যন্ত্রটা নাও। তোমার একটা কানে নলটা লাগাও। ফানেলটাকে বুকে আর পিঠে বিভিন্ন জায়গায় রেখে দেখত, কোথায় হৃৎপিণ্ডের শব্দটা সবচেয়ে ভালো বোঝা যাচ্ছে।
- এবার হাতে আর নলে যা অনুভব করলে আর শুনলে, তা নীচের ছকে লেখো :

হৃৎপিণ্ডের অবস্থান সবচেয়ে ভালো বোঝা যাচ্ছে : (লেখো : ভালো, খুব ভালো, সবচেয়ে ভালো, খারাপ, একেবারে খারাপ, বোঝা যাচ্ছে না ইত্যাদি।)

অবস্থান	বুক	পেট
সামনে ডানে (উপর/নীচ)		
সামনে মাঝে (উপর/নীচ)		
সামনে বাঁয়ে (উপর/নীচ)		
পেছনে ডানে (উপর/নীচ)		
পেছনে মাঝে (উপর/নীচ)		
পেছনে বাঁয়ে (উপর/নীচ)		

বলো তো, হৃৎপিণ্ডটা ঠিক কোথায় আছে? ....।

— তুমি কী থেকে হৃৎপিণ্ডের অবস্থানটা বুঝতে পারলে? (একের বেশি জায়গায় টিক দিতে পারো)

— হৃৎপিণ্ডটা চোখে দেখা যায়/হৃৎপিণ্ডটা শব্দ করে/হৃৎপিণ্ডটা নড়াচড়া করে/হৃৎপিণ্ড থেকে শ্বাস বেরোয়।

তাহলে এসো দেখি, হৃৎপিণ্ডটা ঠিক কোন জায়গায় আছে।

তোমার নিজের বুকের মাঝখানে হাত দাও। কী অনুভব করেছ? ....।

বুকের মাঝখানে যে শক্ত হাড় বুঝতে পারছ তাই হলো বক্ষাস্থি (Sternum)।
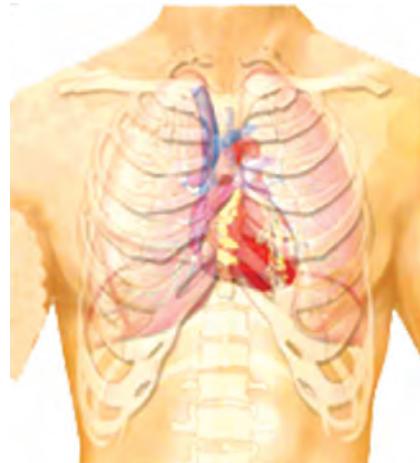
তোমার নিজের পিঠের মাঝ বরাবর ঘাড়ের নীচ থেকে হাত নীচে নামাও। কী অনুভব করছ? ....।

পিঠের মাঝ বরাবর যে শক্ত হাড় বুঝতে পারছ তা হলো শিরদাঁড়া (Vertebral Column)।
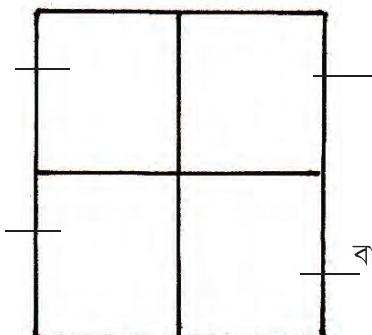
হৃৎপিণ্ড থাকে মূলত বুকের মাঝখানে থাকা সেই বক্ষাস্থি ও শিরদাঁড়ার মাঝের অংশে।

এই হৃৎপিণ্ড অনেকটা দোতলা বাড়ির মতো দেখতে। যার ওপর তলায় দুটো ঘর বা কুঠুরি। আর নীচের তলায় দুটো ঘর বা কুঠুরি। প্রত্যেকটা ঘর একে অপরের থেকে আলাদা থাকে মেঝে বা দেয়াল দিয়ে।
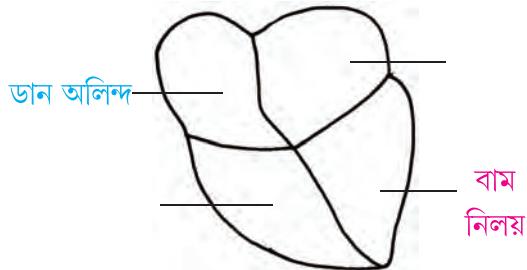
টুকরো কথা

হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত সারা দেহে যে নলগুলো দিয়ে যায় তার নাম হলো ধমনি। তেমনি সারা দেহ থেকে আবার যে নলগুলো দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে সেগুলোর নাম শিরা।
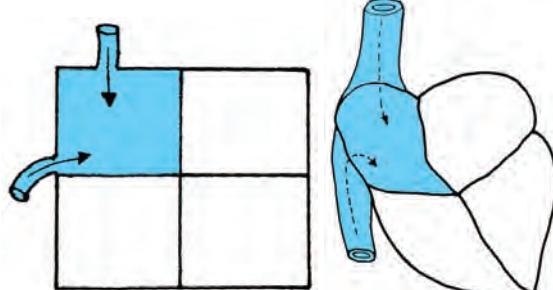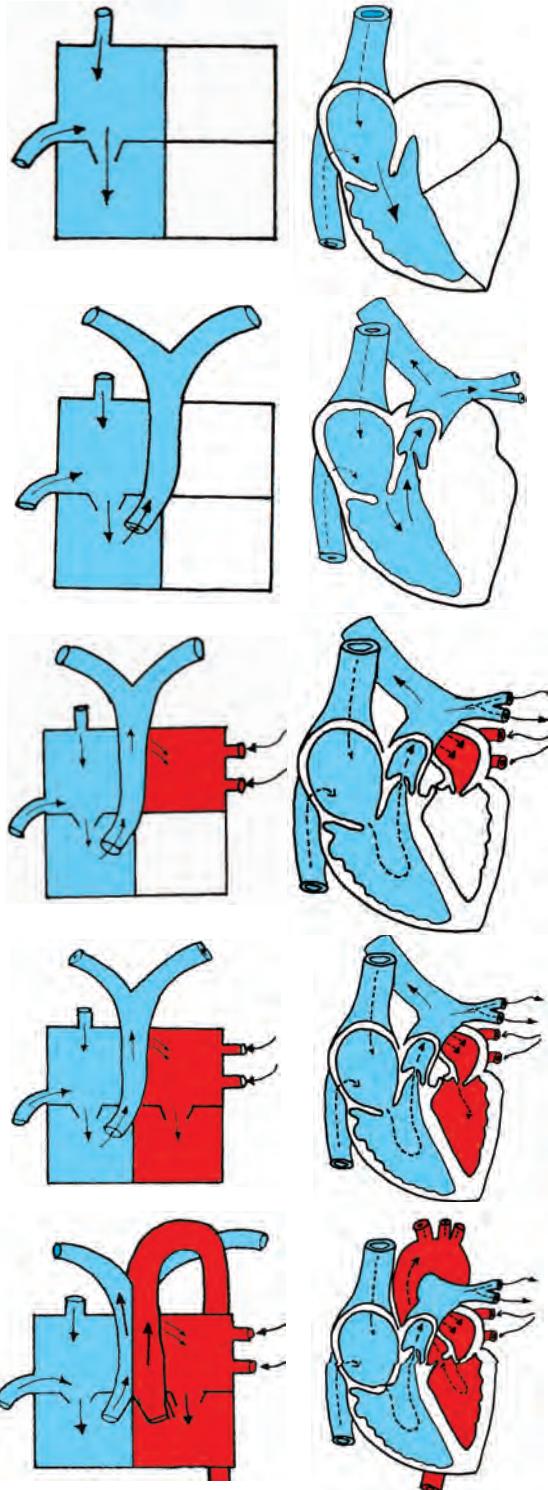
ওপরের ফাঁকা জায়গাগুলির কোনগুলি বাম ও কোনগুলি ডান তা তির চিহ্ন দিয়ে দেখাও। একই সঙ্গে তোমার হৃৎপিণ্ডেরও কোনটি বাম ও ডান দিক তাও ছবিতে তির চিহ্নের সাহায্যে দেখাও।

চলো-হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্ত কীভাবে চলাচল করে সেটাই ধাপে ধাপে দেখি—

সারা শরীর থেকে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা দিয়ে অবিশুদ্ধ রক্ত (বেশি CO_2 মেশানো রক্ত) পৌঁছোয় দোতলার ডানদিকের ঘর বা ডান অলিন্দে।

দোতলার ডানদিকের ঘর ডান অলিন্দ থেকে সেই CO_2 যুক্ত রক্ত দোতলার মেঝের একটা একমুখী দরজা বা ত্রিপত্র কপাটিকা দিয়ে এসে পড়ে একতলার ডান নিলয়ে।

ডান নিলয় এবার সেই রক্তকে নিজে সংকুচিত হয়ে ফুসফুসীয় ধমনি দিয়ে পাঠিয়ে দেয় ফুসফুসে বিশুদ্ধ বা শোধন করার জন্য।

ফুসফুসে এই অবিশুদ্ধ রক্ত থেকে অনেকটা CO_2 বেরিয়ে যায়। আবার তেমনই ফুসফুস থেকে O_2 চলে এসে রক্তকে বিশুদ্ধ করে তোলে। বিশুদ্ধ রক্ত (যে রক্তে CO_2 কম, O_2 বেশি) আবার ফুসফুসীয় শিরা দিয়ে পৌঁছোয় দোতলার বামদিকের ঘর বা বাম অলিন্দে।

বাম অলিন্দ সংকুচিত হয়ে সেই রক্ত বাম অলিন্দের নীচে (দোতলার বামদিকের ঘরের মেঝে) থাকা দ্বিপত্রক কপাটিকা নামের একমুখী দরজা দিয়ে পৌঁছোয় একতলার বামদিকের ঘর বা বাম নিলয়ে।

হৃৎপিণ্ডের এই বাম নিলয়টিই হলো সবথেকে বড়ো কুঠুরি। আবার নিজে সংকুচিত হয়ে পাম্প করার ক্ষমতা ধরলে সবথেকে শক্তিশালীও বটে। এবার একতলার বামদিকের ঘর, বাম নিলয় সংকুচিত হলে সেই বিশুদ্ধ রক্ত (O_2 বেশি, CO_2 কম) মহাধমনি দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে।

জেনে রাখো : ডান ও বাম অলিন্দে একই সঙ্গে রক্তে ঢোকে। আবার ডান ও বাম অলিন্দ থেকে একই সঙ্গে রক্ত ডান ও বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। ডান ও বাম নিলয় থেকে রক্ত একই সঙ্গে যথাক্রমে ফুসফুসীয় ধমনী ও মহাধমনীতে প্রবেশ করে। তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য ছবিতে ধাপে ধাপে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কুঠুরিতে রক্তের প্রবেশ ও বের হওয়া দেখানো হয়েছে।

হৃৎপিণ্ডটা নড়াচড়া করে; একবার বড়ো হয় (প্রসারিত হয়) আবার তার পর ছোটো হয় (সংকুচিত হয়)। একবার প্রসারণ, আর একবার সংকোচনকে একসঙ্গে হৃৎস্পন্দন বলে।

বুকে হাত দিয়ে গোনার চেষ্টা করত, মিনিটে কতবার তোমার হৃৎস্পন্দন হচ্ছে? ভালোভাবে পারছ না? নাড়ি গুনে বলো। বন্ধুদের নাড়িও গুনে দেখো।

(1) তোমার হৃৎস্পন্দন মিনিটে 72-80 বার।
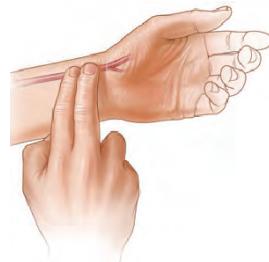
(2) .... এর হৃৎস্পন্দন মিনিটে .... বার।

নাড়ি পাচ্ছ না? খুব সহজ। খুঁজে দেখি এসো।

বাম হাত চিত করে রাখো। কবজিতে বুড়ো আঙুলের নীচ বরাবর মোটা হাড়টার ঠিক ভেতরের দিকে ডান হাতের তর্জনী এবং মধ্যমা রাখো। অনুভব করার চেষ্টা করো।

কী টের পাচ্ছ? ....

কী নড়াচড়া করছে? ....

এটাই হলো নাড়ি (Pulse)।

নাড়ি কী, কেন হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে তার যোগ, পরে জানবে। তোমার হৃৎস্পন্দন বা নাড়ির গতি মিনিটে কতবার তা শোনার চেষ্টা করো। বন্ধুদেরও নাড়ির গতি মাপার চেষ্টা করো। এভাবে পাঁচ-ছয়জনের দেখো। প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দন মোটামুটি কত থেকে কত বার হচ্ছে?

(1) .... (2) .... (3) .... (4) ..... (5) ..... (6) .....

এবার এসো, নীচের কর্মপত্রগুলি পূরণ করি।

প্রথম কর্মপত্র: নাড়ির অবস্থান ও প্রকৃতি

দেহের আর কোথায় কোথায় নাড়ি পেলে (জায়গাগুলোর নাম লেখো)	নাড়ির স্পন্দন কী হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে চলছে?	কারণ কী?
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

কোন নাড়িটা সবচেয়ে স্পষ্ট? ....। এর কারণ কী? ....।

তোমার বন্ধুর বিশ্রামের সময় নাড়ির গতি মাপো। এবার তাকে একটা বেঞ্চের ওপর ওঠানামা করতে বলো। প্রত্যেক এক মিনিট বাদে বাদে তার নাড়ির গতি মাপো। পাঁচ মিনিট বাদে তাকে বিশ্রাম করতে দিয়ে আবার প্রতি মিনিটে তার নাড়ির গতি মাপো।

দ্বিতীয় কর্মপত্র: কাজের সময়ে নাড়ির গতি

বিশ্রামকালে নাড়ির গতি/মিনিট	
এক মিনিট কাজ করার পরে নাড়ির গতি/মিনিট	
দুই মিনিট কাজ করার পরে নাড়ির গতি/মিনিট	
তিন মিনিট কাজ করার পরে নাড়ির গতি/মিনিট	
চার মিনিট কাজ করার পরে নাড়ির গতি/মিনিট	
পাঁচ মিনিট কাজ করার পরে নাড়ির গতি/মিনিট	
এর কারণ কী?	
কাজ শেষ হবার পরে প্রথম মিনিটে নাড়ির গতি/মিনিট	
কাজ শেষ হবার পরে দ্বিতীয় মিনিটে নাড়ির গতি/মিনিট	
কাজ শেষ হবার পরে তৃতীয় মিনিটে নাড়ির গতি/মিনিট	
কাজ শেষ হবার পরে চতুর্থ মিনিটে নাড়ির গতি/মিনিট	
কাজ শেষ হবার পরে পঞ্চম মিনিটে নাড়ির গতি/মিনিট	
এর কারণ কী?	
কতক্ষণে নাড়ির গতি স্বাভাবিক হলো?	

তোমার বন্ধুটির শ্বাসকষ্ট, হৃৎপিণ্ডের কোনো রোগ অথবা অন্য কোনো শারীরিক দুর্বলতা থাকলে, তাকে দিয়ে এই কাজ করিও না।

হৃৎপিণ্ডের সমস্যা

1. রবীনের ছোটো বোন রীনা খুব কমজোরী। খেলতে গেলেই হাঁপিয়ে যায়। তাই ও চুপ করে বসে থাকতে ভালোবাসে। ওর মা বলেছে রীনার নাকি হৃৎপিণ্ডে একটা ফুটো আছে। ডাক্তারবাবু জানিয়েছেন সেটা অপারেশন করতে হবে।

2. রহিমের দাদু নাকি দু-তিনবার মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে ডাক্তার বলেছেন ওনার নাকি হৃদযন্ত্রের সঙ্কোচন মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। পেসমেকার বসানো দরকার। না হলে হৃৎস্পন্দন কখনো-কখনো বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

3. নিমাই মুর্মুর বাবার গতমাসে বুকে খুব ব্যথা হয়েছিল, খুব ঘামও নাকি হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে ওনারা বলেছিলেন হৃদযন্ত্রের দেয়ালের পেশিগুলোতে রক্ত চলাচল কমে গেছে। তাই ওগুলো ভালো করে কাজ করতে পারছে না। হাসপাতালে ভরতি করে রাখতে হবে। ওষুধে কাজ না হলে হৃদযন্ত্রের পেশিতে রক্ত চলাচল ঠিক করতে গেলে অপারেশন করতে হতে পারে।

ওপরের সমস্যাগুলো জানলে। এগুলো হলে হৃদযন্ত্রের কাজ স্বাভাবিক হয় না — এধরনের সমস্যাগুলোকেই বলে হৃদযন্ত্রের অসুখ।

শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে ওপরের অসুখগুলো কী কী কারণে হতে পারে তা জানার চেষ্টা করো।

রক্ত

বাড়িতে দেখেছ কি, যখন চা বা কফি বানানো হয় তখন জলের ভেতর কফির গুঁড়ো, দুধের গুঁড়ো, চিনি — এসব কত কিছু মেশানো হয়? এইসব মেশানোর ফলে চা-এর রং, গন্ধ, স্বাদ জলের থেকে অন্যরকম হয়।
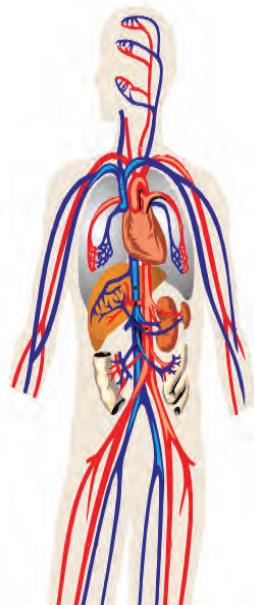
আমাদের শরীরে রক্তও সেইরকম। রক্তে বেশির ভাগটাই জল থাকলেও অনেক রকমের জিনিস মেশানো আছে এতে। লালরঙের একরকম ছোটো ছোটো কণা যা খালি চোখে দেখা যায় না (যেমন — চা, কফির কণাও জলে মিশে যাবার পর খালি চোখে আলাদা করা যায় না)। তেমনই রক্তে সাদা সাদা খুব ছোটো ছোটো কণা থাকে তাদেরও আলাদা করে খালি চোখে দেখা যায় না (চা-এ দুধের গুঁড়ো মেশানোর পর দুধকে আর আলাদা করে বোঝা যায় কি?)।

রক্তের ওই নানারকমের মিশে থাকা অংশগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক —

1. জলীয় অংশ
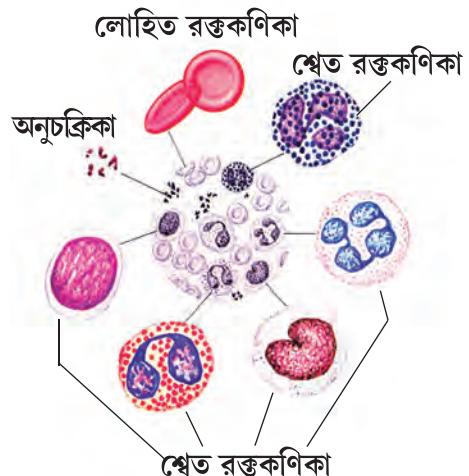
রক্তের বেশির ভাগটাই হলো জলীয়। তাকে বলে রক্তরস বা প্লাজমা। এই অংশ না থাকলে রক্ত মোটেই শরীরের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মোটা-সরু নানারকম নালী দিয়ে চলাচল করতে পারত না। তার ফলে অনেকগুলো কাজ। যেমন — খাবার হজম হবার পর তৈরি হওয়া ছোটো আকারের কণাগুলো খাদ্যনালী থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া, শরীরের নানা জায়গা থেকে তৈরি হওয়া অদরকারি যৌগগুলো (যেমন — CO_2, শরীরে তৈরি হওয়া ক্ষতিকারক যৌগ) বয়ে নিয়ে ফুসফুস, বৃক্ক এসব জায়গায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

রক্তের জলীয় অংশের মধ্যে একরকম উপাদান থাকে যা জীবাণুর দেহ থেকে বেরোনো নানা রোগসৃষ্টিকারী পদার্থকে ধ্বংস করে।

2. লাল রঙের, চোখে দেখা যায় না, এমন কণার নাম হলো লোহিত রক্তকণিকা। এরা প্রধানত ফুসফুসের কাছ থেকে অক্সিজেনকে হাত ধরে নিয়ে পৌঁছে দেয় শরীরের আনাচেকানাচে প্রায় সব জায়গায়।

3. সাদা, খুব ছোটো কণার মতো যারা, চোখে দেখা যায় না — এদের নাম শ্বেত রক্তকণিকা। এদের সাদা রংটা রক্তে মিশে থাকা লোহিত রক্ত কণিকার লাল রঙের জন্য আলাদা করে বোঝা যায় না। তবে এদের কাজ খুব দরকারি। মূলত এরা শরীরের রক্ষীর কাজ করে। পাহারাদার বা সৈন্যের মতোই এদের কাজ হলো বাইরে থেকে আসা শত্রু যেমন রোগের জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করে শরীরকে রক্ষা করা। আবার শরীরে কোথাও ক্ষত হলে তা সারাই করার সময়ও এদের দরকার হয়।

টুকরো কথা

তবে অনেক সময় কিছু কিছু মারাত্মক জীবাণু আছে যেমন টিটেনাস বা ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া এসব — শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা এদের সঙ্গে লড়াইতে এঁটে ওঠে না। টিকা (Vaccine) দিয়ে শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আগে থেকেই উজ্জীবিত ও সক্রিয় করে তোলা হয় যাতে শরীরে ঐ সব রোগের জীবাণু ঢুকলে শরীর তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে।

4. রক্তে আর একরকমের খুব ছোটো ছোটো কণা থাকে। যাদের বলে অণুচক্রিকা। এরা শরীরের কোথাও কেটে গেলে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

5. রক্তে অনেক কিছুই থাকতে পারে — চায়ে চিনি বাইরে থেকে মেশানো হয়, কিন্তু রক্তের মধ্যেই মেশানো থাকে চিনি, নুন এমন কত কী। সেসব উপাদানের মাত্রাও ঠিকঠাক থাকা দরকার ।

   রক্তের এই উপাদানগুলো এদিক ওদিক হলেই মুশকিল — শরীরের স্বাভাবিক কাজে ঘটবে বিঘ্ন। যেতে হতে পারে চিকিৎসকের কাছে।

আচ্ছা, রোজ তো নানা জীবাণু তোমার দেহে ঢুকে পড়ে, কিন্তু রোজ রোজ তো তোমার রোগ হয় না। তাহলে তোমার দেহের ভেতরে ওইসব জীবাণুদের মেরে ফেলে কে? এসো দেখি।

বলো তো, নীচের জিনিসগুলো সম্পর্কে তুমি কী জানো? নীচের ছকে লেখো:

	কোথায় দেখতে পাও	কখন দেখতে পাও
1. পিচুটি		
2. পুঁজ		
3. শ্লেষ্মা/কফ		

এগুলো তৈরি হবার দরকার কী? দেখো তো বুঝতে পারো কিনা? নীচের কতগুলি ঘটনা দেওয়া আছে, সেখান থেকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করো আর নীচে লেখো।

পিচুটি	→	....	→	....	→	....
পুঁজ	→	....	→	....	→	....
শ্লেষ্মা বা কফ	→	....	→	....	→	....

● নাকের ভেতরে জীবাণু ঢোকে।	● চোখের জলের মধ্যে থাকা জীবাণুনাশক জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলে।	● মরা জীবাণুগুলো পিণ্ডাকারে চোখের কোনায় জমে।
● চোখের পাতলা চামড়ার মধ্য দিয়ে জীবাণু ঢোকে।	● রক্তের মধ্যে থাকা জীবাণুনাশক শ্বেত রক্তকণিকা জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলে।	● সাদা তরলের মতো চামড়া থেকে বেরিয়ে আসে।
● ফোঁড়া বা কাটা জায়গার মধ্যে দিয়ে জীবাণু ঢোকে।	● শ্লেষ্মা তৈরি হয়।	● জীবাণুগুলোকে জমাট করে আটকে ফেলে।

তাহলে বুঝতেই পারছ, যে জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলবার জন্য রক্ত ছাড়াও আমাদের দেহে নানারকমের ব্যবস্থা আছে। চোখ, নাক বা চামড়ার কাটা অংশ দিয়ে জীবাণুরা ঢোকার চেষ্টা করলে রক্তের মতো ওখানেও জীবাণুদের মেরে ফেলার ব্যবস্থা আছে।

জল বা খাবারে মিশে থাকা জীবাণুগুলোকে মারবার কী কী ব্যবস্থা তুমি জানো?

* এই জীবাণুরা কোন পথে যেতে পারে পরপর সাজিয়ে লেখো তো : [গ্রাসনালী, পাকস্থলী, মুখগহ্বর]

  1. .... 2. .... 3. ....

* কোথায় কোথায় খাবারগুলো কম সময় থাকে?

  1. .... 2. ....

* ওইসব জায়গায় জীবাণু মারার জন্য কী কী থাকতে পারে জানো?

  1. লালায় লাইসোজাইম (জীবাণু ধ্বংসকারী রাসায়নিক পদার্থ) 2. পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

পরিচয় লেখো : এসো তাহলে ভালো করে বুঝে নিই। আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ বা অন্যান্য ব্যবস্থাটা কীভাবে তৈরি, আর কীভাবেই বা তা কাজ করে। নীচের ছকে লেখো :

রক্তের কোন কোন অংশ জীবাণু মেরে ফেলে : (a) ....।
(b) ....।

কী করা উচিত বলো : আমাদের দেহে রোগ জীবাণুর সংক্রমণ কমাতে তাহলে কী কী করা দরকার?

1. পরিচ্ছন্নতা : ....।

2. আচরণ : ....।

3. বাইরে থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ....।

কী খাওয়া উচিত বলে তুমি মনে করো :

রোগ প্রতিরোধকারী সকল উপাদানই মূলত প্রোটিন দিয়ে তৈরি। তাহলে দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা বজায় রাখতে কী কী খাওয়া দরকার :

1. .... 2. .... 3. ....

4. .... 5. .... 6. ....

ফুসফুস

মনে আছে কি?

আমাদের পৃথিবীতে যে বাতাস থাকে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ হলো অক্সিজেন যাকে আমরা প্রাণবায়ুও বলে থাকি।

এই অক্সিজেন আমাদের মতোই সব প্রাণীদেরই দরকার খাবার থেকে শক্তি তৈরির জন্য, না হলে আমরা বেঁচেই থাকতাম না।

তাহলে বলো তো — বাতাস থেকে এই অক্সিজেন আমাদের শরীরের ভেতর নিয়ে যায় কে?
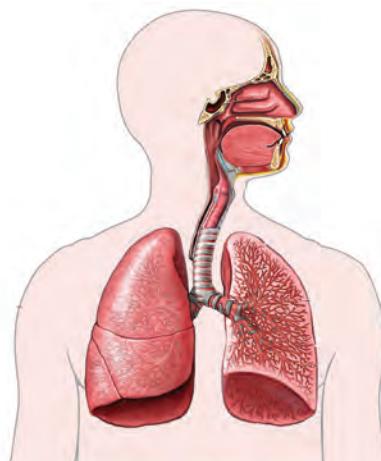
খেয়াল করেছ কি?

এক গ্লাস শরবতে একটা নল ঢুকিয়ে ফুঁ দিলে হাওয়ার বুদবুদ বের হয়, আবার সেই নল দিয়ে শরবত বা দুধ চোঁ চোঁ করে শুষে নেওয়া যায়। গ্লাসের শরবত বা দুধ শেষ হবার সময় তখন কি টেনে নেওয়া হয়? বাতাস, তাই না?

তাই নিশ্চয়ই বুঝলে — বাতাসের সঙ্গে অক্সিজেন আমাদের শরীরে ঢোকার রাস্তাটা শুরু হয় নাক বা খোলা মুখ দিয়ে।

সেখান থেকে কোথায় যায়?

নাকের বা মুখের ভেতর দিয়ে বাতাস প্রথমে পৌঁছোয় গলার ভেতর দিকে — সেখান থেকে শ্বাসনালী দু-ভাগ হয়ে যায়। যাদের বলে ক্লোমশাখা (bronchus)। এরা পৌঁছোয় বুকের ভেতর থাকা দু-দিকে দুটো বড়ো হাওয়ার ব্যাগের মতো জায়গায়। ওরাই হলো ফুসফুস।

ফুসফুসের রং কেমন?

কালচে গোলাপি, কারণ অনেক সরু সরু নালী দিয়ে এর ভেতর রক্ত চলাচল করে। তবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে বাতাস থেকে ধুলো ময়লা ঢুকে ক্রমশই কালো কালো ছোপ পড়ে যায়।
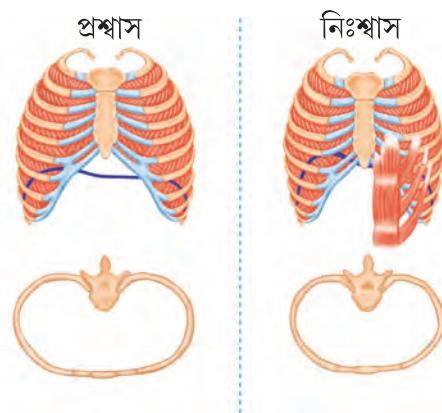
ফুসফুসের ভেতরটা কেমন ?

শ্বাসনালী যতই ভেতরে ঢোকে তা গাছের ডালপালার মতো অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় ভাগ হতে থাকে। সবশেষের সূক্ষ্ম শ্বাসনালিকা (bronchiole); তারও শেষে থাকে দশ কোটি ছোটো ছোটো বেলুনের মতো বায়ুথলি। শ্বাসনালীর শাখাপ্রশাখা যেখানে শুরু হচ্ছে সেখান থেকে এই ছোটো ছোটো বায়ুথলি পর্যন্ত বুকের দু-দিকে থাকা দুটো যন্ত্রের নামই ফুসফুস। এক-একটা ফুসফুসে প্রায় দশ কোটি বায়ুথলি থাকে। বায়ুথলির গায়ে রক্তনালী থাকে। বাম ফুসফুসে দুটো খণ্ড আর ডান ফুসফুসে তিনটি খণ্ড আছে।

তাহলে বলো তো ফুসফুস কী কাজ করে ?

এককথায় বলা যায় বাইরে থেকে বাতাস শরীরের ভেতর টেনে নেওয়া; সেই টেনে নেওয়া বাতাস থেকে অক্সিজেনকে রক্তে পৌঁছে দেওয়া; আর শরীরে তৈরি হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্ত থেকে টেনে নিয়ে বাতাসের সঙ্গে শরীর থেকে বের করে দেওয়া।

আমরা শ্বাস নিই, আর শ্বাস ফেলি কীভাবে? আমাদের পাঁজরের ফাঁকে যে পেশিগুলো আছে, তাকে বলে পঞ্জর পেশি (Intercostal muscle)। বুক আর পেটের মাঝখানে ভেতরে আছে একটা পেশি। এর নাম হলো মধ্যচ্ছদা (Diaphragm)। এগুলির সাহায্যে একবার আমাদের বুকের খাঁচা ফুলিয়ে তোলা হয়, তখন বাতাস ভেতরে ঢোকে। একে বলে প্রশ্বাস। আবার এই পেশিগুলো ঢিলে হয়ে গেলে বুকের খাঁচা চুপসে যায়, আর বাতাস ভেতর থেকে বেরিয়ে যায়। একে বলে নিশ্বাস।

ফুসফুসের সমস্যা

1. শিলাদিত্যর দাদু ভোরবেলা খুব কাশতে থাকেন। দম নিতে খুব কষ্ট হয় ওনার।
2. মাঝে মাঝেই বিশেষ করে শীতকালে রহিমচাচার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কাছে গেলে সাঁই সাঁই শব্দ শোনা যায়। তখন উনি জোরে জোরে চলাফেরা করতে পারেন না।
3. শ্যামলের কাকার কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে মাঝে মাঝেই। রাতের দিকে জ্বর আসে। শরীরের ওজন কমে আসছে।
4. পিয়ালীর বোনের ছোটোবেলা থেকেই খুব কাশি হয়। নাকের পাটা দুটো ফুলে ফুলে ওঠে শ্বাস নেবার সময়। মাঝে মাঝে নাক বন্ধও হয়ে যায়।

ওপরের সমস্ত ঘটনাগুলোই হলো ফুসফুসের নানান সমস্যা।

অস্থি, অস্থিসন্ধি ও পেশি

অস্থি

নীচের বাঁদিকের উপাদানগুলোর সঙ্গে ডানদিকের কাজগুলি লাইন টেনে মেলাও তো দেখি ।

(1)	সার্কাসের তাঁবু	(i)	কাঠামো হিসেবে ধরে রাখা
(2)	পাখির খাঁচা	(ii)	টান বা ঠেলা মেরে সরানো
(3)	ময়লা সরাবার কাঁটা	(iii)	চারপাশে ঢাকা দিয়ে রক্ষা করা

আচ্ছা, আমাদের দেহের কোন অংশটার সঙ্গে এইরকম কাজের মিল আছে? নীচের তালিকা থেকে বেছে লেখো তো।

(1) .... ।

(2) .... ।

(3) .... ।

[বুকের পাঁজর, উরুর হাড়, বাহুর হাড়, কাঁধের হাড়, খুলির হাড়, কোমরের হাড়, শিরদাঁড়া]

এই কাজগুলি তাহলে আমাদের দেহের কোন অংশটি করে? .... ।

অস্থি মানবদেহের যে শুধু কাঠামো তৈরি করে তা নয়, অন্যান্য কাজও করে—

(i) ফুসফুস, ..., ... প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে রক্ষা করে।

(ii) দেহকে নির্দিষ্ট .... প্রদান করে।
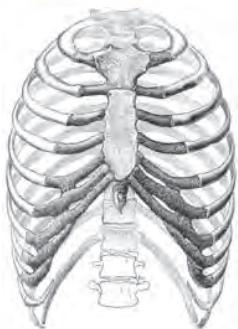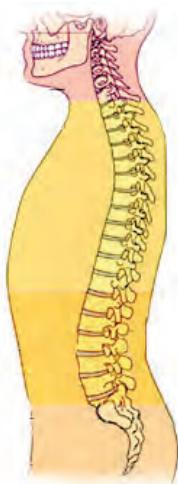
তাহলে হাড় বা অস্থি আমাদের দেহে গুরুত্বপূর্ণ কেন? .... ।

মানবদেহের মতো সমস্ত প্রাণীদের দেহ কি কঙ্কালযুক্ত? .... ।

কয়েকটি প্রাণীকে চিহ্নিত করো যাদের দেহে হাড় বা অস্থি নেই :

1. ....,
2. ....,
3. ....,
4. ....,

তুমি কি শনাক্ত করতে পারো আগের পাতার এক্সরে প্লেটের ছবিগুলি মানবদেহের কঙ্কালের কোন কোন অংশ?
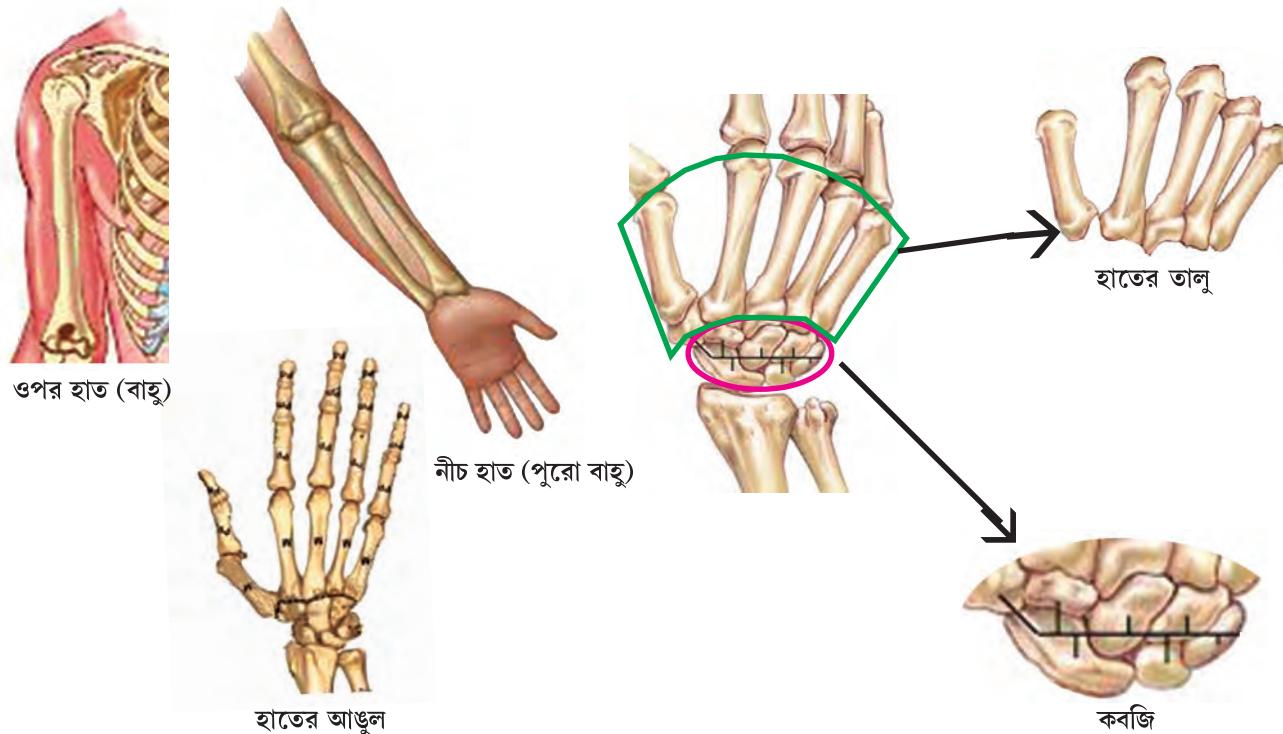
(1) .... (3) ....

(2) .... (4) ....

এসো তোমার আর তোমার বন্ধুর দেহের হাড়গুলো ছুঁয়ে দেখি :
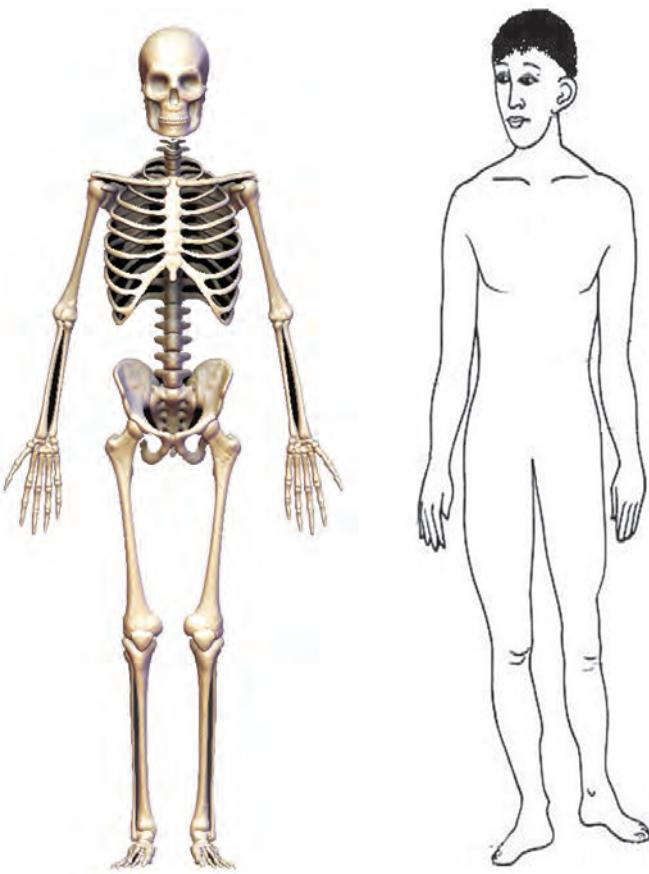
তোমার বন্ধুর হাড়গুলো হাতের কোথায় আছে, আর কেমন দেখতে, হাত দিয়ে অনুভব করে দেখো তো। প্রয়োজনে ছকের নীচে দেওয়া ছবিগুলোর সাহায্য নাও। তারপর নীচের ছকে লেখো:

কোন জায়গায়	কটা হাড়	হাড়ের আকৃতি কেমন	কী কাজ করে বলে মনে হয়
ওপর হাত (বাহু)			
নীচ হাত (পুরোবাহু)			
কবজি			
হাতের তালু			
হাতের আঙুল			

[হাড়ের আকৃতি বোঝাতে এই শব্দগুলো লিখতে পারো— লম্বা, ছোটো, সরু, মোটা, চ্যাপটা, ধারগুলো মোটা, নলের মতো, তেকোণা, সোজা, বাঁকা]

আচ্ছা, এবার নীচে দেওয়া কঙ্কালের সঙ্গে তোমার শরীর মেলাও তো।

কোন হাড়গুলো দেহের ঠিক মাঝখানে (কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর) আছে বলো।

1.

2.বক্ষপিঞ্জর (স্টারনাম ও রিবস)

3.

— এরা হলো অক্ষীয় কঙ্কাল। (Axial Skeleton)

কোন হাড়গুলো পাশে ঝোলে বলো।
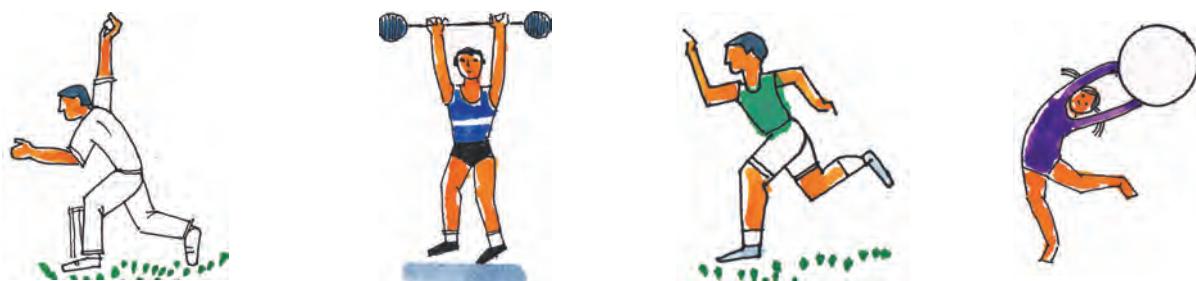
1.পেক্টোরাল গার্ডল

2.

3.

4.

— এরা হলো উপাঙ্গীয় কঙ্কাল। (Appendicular Skeleton)

হাড়ের সমস্যা

1. সুমন মাথায় হেলমেট না পরেই ব্যাট করছিল। বোলার রবার্টের দ্রুতগতির বাউন্সার দেওয়া বল এসে আঘাত করল সুমনের মাথার খুলিতে। সুমন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

2. আলম খেলছিল ফুটবল। হঠাৎ পড়ে গিয়ে হাতের কবজিতে লাগল আঘাত। কবজির ওপর প্রচণ্ড ব্যথা হতে লাগল। হাত নাড়ানোই মুশকিল। ধীরে ধীরে জায়গাটা ফুলে উঠতে লাগল। বিকাশকাকু খেলা দেখছিল। এসে বললেন তাড়াতাড়ি পিন্টুদার দোকান থেকে বরফ নিয়ে আয়।

3. তনুজার মা সেদিন সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলেন। প্রচণ্ড চোট পেলেন মেরুদণ্ডে। তারপর আস্তে আস্তে ওনার পা-গুলো অবশ হয়ে এল। এখন পায়ের নড়াচড়া সম্পূর্ণ বন্ধ। হুইলচেয়ারে বসে চলাফেরা করতে হয়।

4. রোশনের দিদিমার বয়স সত্তর। সেদিন বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গেলেন, আর উঠতে পারলেন না। ডান দিকের পায়ের হাঁটুর নীচের হাড় ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। সঙ্গে কোমরে অসহ্য ব্যথা। পাড়ার লোকেরা ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

ওপরের আলোচনা করা ঘটনাগুলো হলো হাড়ের নানা ধরনের চোট-আঘাতজনিত সমস্যা।

অস্থিসন্ধি
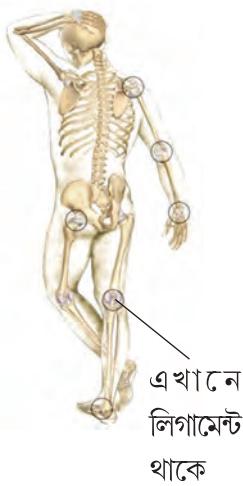
ওপরের ছবিগুলি দেখে লেখো তো দেহের কোন গঠনগত বৈশিষ্ট্যের জন্য এই কাজগুলি সম্ভব?

.... ।
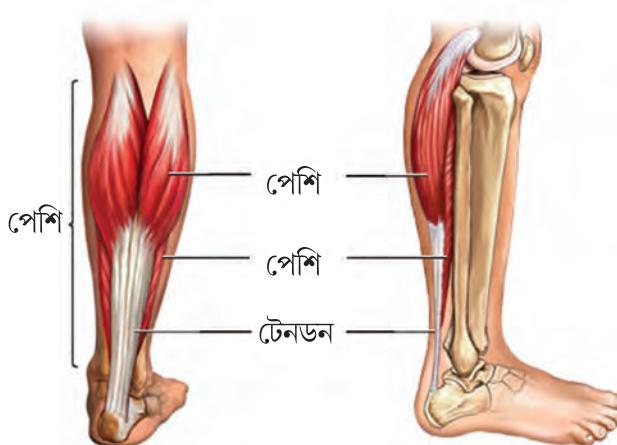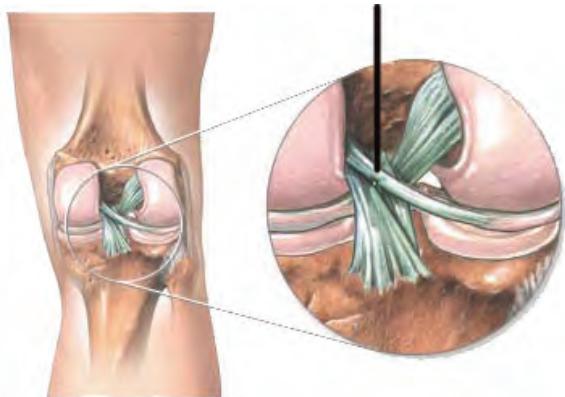
জন্মের সময় একজন শিশুর প্রায় 300টি হাড় বা অস্থির অংশ থাকলেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলোই একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে অবশেষে পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে থাকে 206টি।

এই অস্থিগুলো একে অন্যের সঙ্গে অস্থিসন্ধিতে **লিগামেন্ট** নামের সুতো বা দড়ির মতো জিনিস দিয়ে বাঁধা থাকে; ফলে সবমিলিয়ে একটা কাঠামো তৈরি হয়। আর এই কাঠামোর রকমভেদেই এক একটি মেরুদণ্ডী প্রাণী এক এক রকমের দেখতে হয়।

দুটো প্রতিবেশী অস্থি যেখানে একে অপরের সঙ্গে লিগামেন্ট দিয়ে বাঁধা থাকে সেই জায়গাটাকেই বলে অস্থিসন্ধি বা হাড়ের জোড়। অনেক মাংসপেশি, আবার **টেনডন** নামের স্থিতিস্থাপক আর একধরনের দড়ি দিয়ে ওই অস্থিসন্ধিগুলোর সামনে, পেছনে বা যে-কোনো পাশ দিয়েই ওপরের অস্থি ও নীচের অস্থির সঙ্গে বাঁধা থাকে।
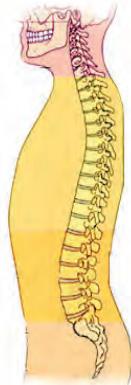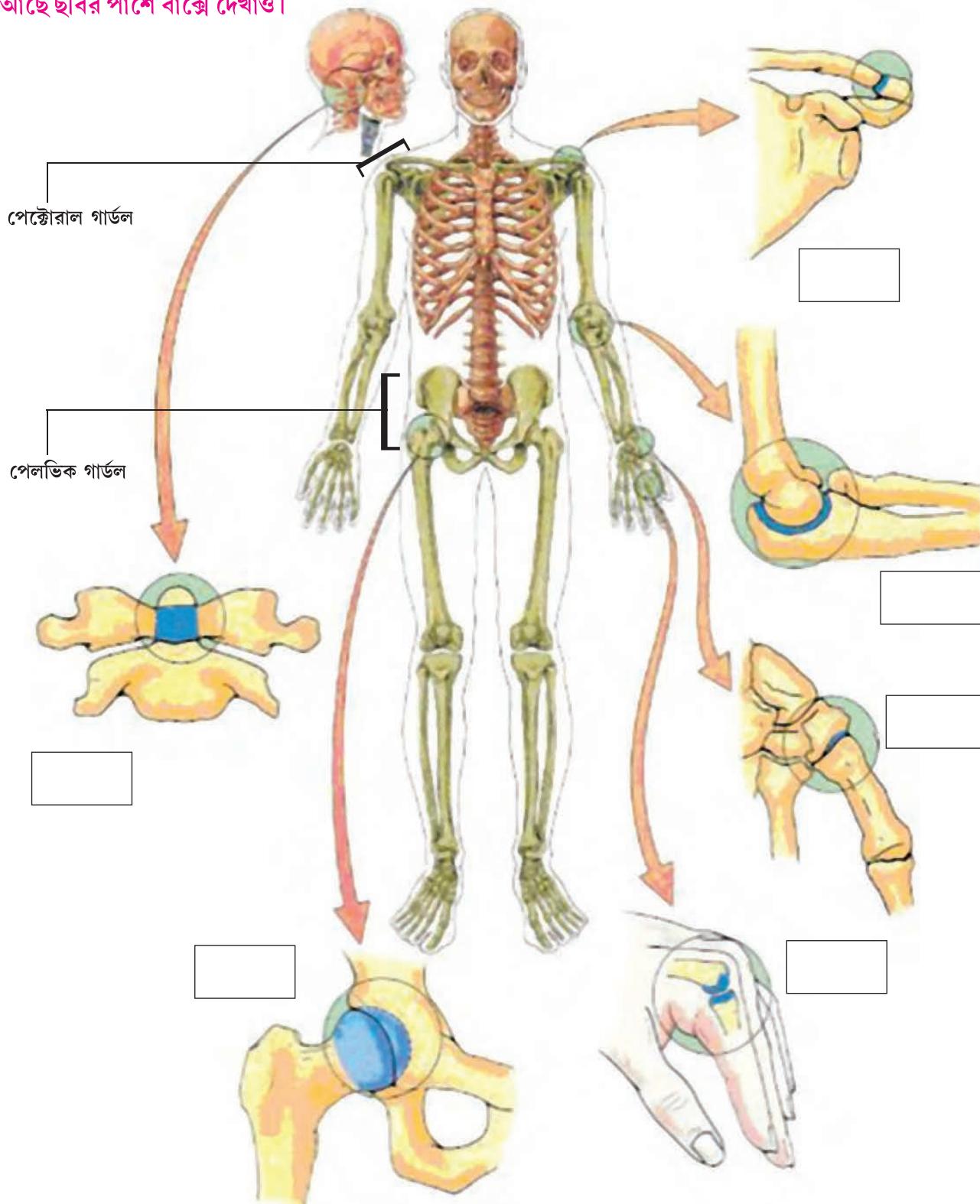
- এমন একটা সন্ধি দেখাও যেটা একদমই নড়াচড়া করে না।

  তোমার খুলির ভিতরে এরকম অস্থিসন্ধি আছে।
  — এরা হলো অচল অস্থিসন্ধি।

- এমন আরো একটা সন্ধি দেখাও যেটা অল্পঅল্প নড়াচড়া করে।

  কঙ্কালে আর কোথায় কোথায় এরকম অস্থিসন্ধি দেখা যায়?
  — এরা হলো ঈষৎ সচল সন্ধি।

- ছবিতে এমন একটা জোড় দেখাও তো, যেটা অনেকটা নড়াচড়া করে।

- এমন আরো দুটো সন্ধির নাম লেখো।

  — এরা হলো সচল অস্থিসন্ধি (এই ধরনের সন্ধির ভিতর এক ধরনের তৈলাক্ত তরল থাকে। আর সেই তরল পদার্থটা ঘিরে থাকে একটা খোলসের মতো আবরণ যাতে তরলটা অস্থিসন্ধি থেকে বেরিয়ে না যায়। এই ধরনের সচল সন্ধি অনেকরকম হতে পারে।)।

- মানবদেহে অধিকাংশ অস্থিসন্ধি দুটি হাড় নিয়ে তৈরি হলেও কোনো কোনো অস্থিসন্ধিতে দুইয়ের বেশি হাড় থাকে। এরকম দুটি অস্থিসন্ধি চিহ্নিত করো।

নীচের ছবিগুলিতে অস্থিসন্ধিগুলো চিহ্নিত করো এবং কোনটি কোন ধরনের অস্থিসন্ধি তা উল্লেখ করো।

এবার নীচের ছবিগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সচল অস্থিসন্ধিগুলোর অবস্থান লক্ষ করো এবং কোন কোন জায়গায় তা আছে ছবির পাশে বাক্সে দেখাও।

পেক্টোরাল গার্ডল

পেলভিক গার্ডল

যখনই আমাদের মস্তিষ্ক থেকে নির্দেশ আসে তা স্নায়ুপথ দিয়ে মাংসপেশিতে পৌঁছোয়। পৌঁছোনো মাত্রই নির্দিষ্ট মাংসপেশি সংকুচিত হয়ে ছোটো হলেই অস্থিসন্ধির প্রতিবেশী অস্থিগুলি যে-কোনো দিকে সঞ্চালিত হয় — সামনে, পিছনে, পাশে বা কখনও মোচড় দিয়ে ঘুরে। এটাই হলো অস্থিসন্ধির বিচলন। পাশের ছবিগুলিতে কয়েকটা উদাহরণ দেখা যাক।

অস্থিসন্ধির বিচলনের এসো কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক।
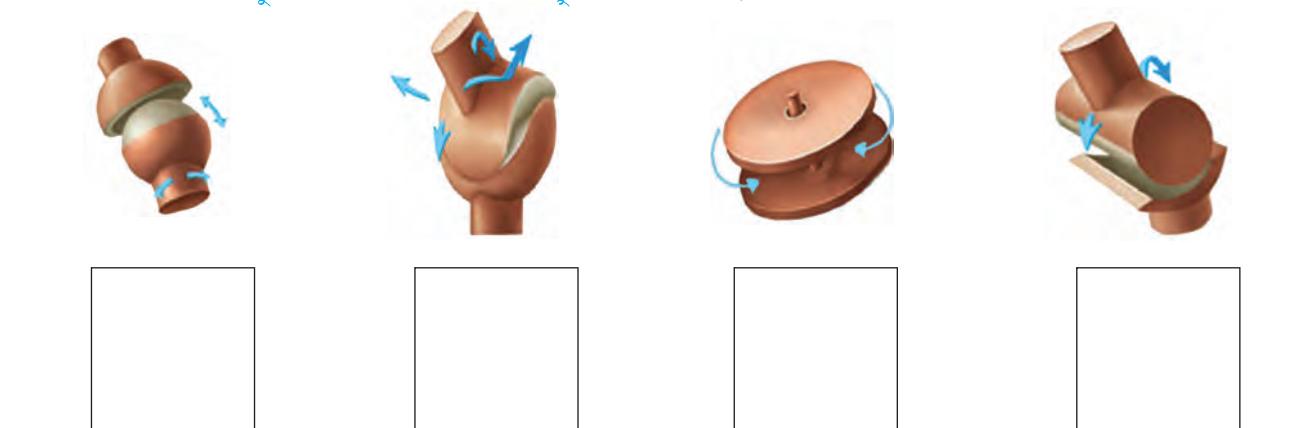
1. **বল এবং সকেট সন্ধি (Ball and Socket):** এই ধরনের অস্থিসন্ধি দেখা যায় কাঁধে ও কোমরে। যেমন কোমরের অস্থিসন্ধিতে পায়ের উপরের হাড় বা ফিমার (Femur) ওপরদিকটা একটা গোলক বা বলের মতো, সেই অংশটা শ্রোণীচক্রের (Pelvic Girdle) দু-পাশে গাছের কোটরের মতো অংশে ঢুকে থাকে। ফলে কোমর থেকে পায়ের বিচলন সামনে-পিছনে, ডানে-বাঁয়ে সবদিকেই হয় এমনকি তা অনেকটা চরকির মতো ঘোরানো সম্ভব হয়।

2. **হিঞ্জ সন্ধি (Hinge Joint):** দরজা বা জানলা কবজার মতো এই রকমের সন্ধি থাকে আমাদের হাঁটুতে বা কনুইতে। এখানে যে-কোনো একটা প্রতিবেশী অস্থির যেমন, পায়ের ফিমারের সাপেক্ষে হাঁটুর নীচের দুটি লম্বা অস্থি জঙ্ঘাস্থি (Tibia) এবং অনুজঙ্ঘাস্থি (Fibula) কেবলমাত্র পিছনে ভাঁজ হতে পারে, সামনে নয়। তেমনই কনুইতে হাত ভাঁজ করা যায় কেবল সামনের দিকে, পিছন দিকে নয়।

3. **পিভট সন্ধি (Pivot Joint):** এই ধরনের অস্থিসন্ধিতে একটি প্রতিবেশী অস্থিকে অক্ষ করে অপর অস্থিটি ঘুরতে পারে। যেমন, আমাদের মেরুদণ্ডের গলা অংশের দু-নম্বর কশেরুকার অক্ষ বা কীলক-দণ্ডের চারধারে আবর্তিত হয় এক নম্বর কশেরুকা বা অ্যাটলাস; ফলে আমরা মাথা ঘুরিয়ে এদিক সেদিক দেখতে পারি সহজেই।

4. **স্যাডল সন্ধি (Saddle Joint):** ঘোড়ার পিঠে বসবার জন্য চামড়া দিয়ে তৈরি করা হয় জিন বা পর্যাণ। এতে যখন অশ্বারোহী বসেন, তিনি সামনে-পিছনে বা পাশাপাশি একটি অবতল (Concave) ও উত্তল (Convex) তলে নড়াচড়া করতে পারেন সহজেই। আমাদের হাতের বুড়ো আঙুল দুটিতে এধরনের সন্ধি আছে তাই বুড়ো আঙুল সহজেই সামনে-পিছনে বা ভেতর ও বাইরের দিকে চলাচল করতে পারে।

নীচের ছবিগুলির অস্থিসন্ধির বিচলনগুলি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট ধরণের অস্থিসন্ধির নাম লেখো। ওই ধরনের অস্থিসন্ধিগুলোতে কী ধরনের বিচলন তুমি দেখতে পাচ্ছ তা নীচে লেখো।

এসো, মানবদেহের অস্থিসন্ধিগুলো নিয়ে নীচের সারণিটি পূরণ করতে পারো কিনা দেখো।

কোন জায়গার অস্থিসন্ধি	কোন ধরনের অস্থিসন্ধি	কোন কোন হাড় দিয়ে তৈরি	কেমনভাবে নড়াচড়া করে	তুমি ওই হাড়-জোড়া দিয়ে কী কী কাজ করো

[এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারো: সোজাসুজি খোলে ও বন্ধ হয়, খোলে, প্রায় 90^{o} খোলে, 180^{o} খোলে, চরকির মতো ঘুরতে পারে, অল্প চলে, অনেকটা চলে।]

অস্থিসন্ধির কার্যপদ্ধতি ও অবস্থান দেখে এবার নীচের সারণিটি পূরণ করো।

কাজের নাম	কোন কোন অস্থিসন্ধি কাজ করে	কী কী প্রকারের অস্থিসন্ধি
1. চাষিদের ধান রোওয়া		
2. গাড়ির ড্রাইভারের ব্রেক কষা		
3. রাঁধুনির হাতা-খুন্তি দিয়ে কড়াইতে হাত নাড়ানো		
4. কলম দিয়ে লেখা		
5. ক্রিকেট খেলায় বল ছোঁড়া		
6. পাখির ঘাড় ঘোরানো		
7. সাইকেল চালানো		
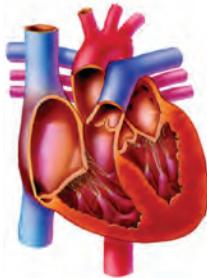
পাখির মাথার বিচলন ও মানুষের মাথার বিচলনে কোনো পার্থক্য কী তোমার চোখে পড়ে? এর পিছনে কী কারণ আছে বলে তোমার মনে হয়? প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে নিতে পারো ।

অস্থিসন্ধির সমস্যা

1. রজতের বাবা ইদানীং সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার সময় লক্ষ করছেন হাঁটুটা কেমন যেন শক্ত লাগছে। আর বেশি হাঁটাহাঁটি করলেই হাঁটুটা লাল হয়ে ফুলে ওঠে।
2. সোমার মা, সইদুলের আব্বা আর দীপার ঠাকুমার প্রায়ই কোমর, হাতের আঙুল আর কাঁধের অসহ্য যন্ত্রণা হয়। হাঁটতে খুব কষ্ট হয়। মাঝেমাঝে জ্বরও আসে।
3. অনীকের শখ হলো কম্পিউটারে গেম খেলা। দীর্ঘক্ষণ খেলার পর যখন ও উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, পিঠে তখন অসহ্য ব্যথা হয়।
4. আব্বাসের দাদা ক্রিকেট খেলে। হাত ঘুরিয়ে বল করতে গিয়ে দুবার কাঁধের হাড়টা আটকে গেছিল। আর নাড়ানো যায়নি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তারবাবুরা কাঁধের সরে যাওয়া হাড় আবার আগের জায়গায় নিয়ে এসেছিলেন।

এই ঘটনাগুলি হলো অস্থিসন্ধির নানা সমস্যা।

পেশি

ওপরের ছবিগুলিতে যে যে কাজগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি উল্লেখ করো:

(1) ...., (2) ...., (3) ...., (4) ....

কার কার অংশগ্রহণের ফলে ওপরের ওই কাজগুলি সম্পন্ন হয়? ....। (অস্থি/পেশি/লিগামেন্ট/টেনডন)

পেশির সংকোচন-প্রসারণের ফলেই কোনো জীবের বা অঙ্গের নড়াচড়া সম্ভব হয়। এবার পেশির বৈশিষ্ট্যগুলি জানো।

(1) পেশি টানার কাজ করে।

(2) পেশি যখন কাজ করে তখন তার দৈর্ঘ্য কমে।

তুমি কোথায় কোথায় পেশি দেখেছ লেখো তো।

(1) তোমার দেহে — (i) ...., (ii) ...., (iii) ....

(2) তোমার বন্ধু বা অন্য কারো দেহে — (i) ...., (ii) ...., (iii) ....

(3) অন্য কোনো প্রাণীর দেহে — (i) ...., (ii) ...., (iii) ....

(4) কোনো খাবারের জিনিসে — (i) ...., (ii) ...., (iii) ....

এবার এসো, পেশির কাজ কী, আর তা কীভাবে করে দেখি।

তোমার বন্ধুকে তার বাঁ হাতটা পুরো ঝুলিয়ে দাঁড়াতে বলো। কনুই থেকে হাতটা ভাঁজ করতে বলো (ছবি দেখো); এবার তীরচিহ্ন দেওয়া অংশের ওপরে হাত রাখো। যা অনুভব করছ ওটাই পেশি।

পেশিটা টিপে দেখো, কেমন মনে হচ্ছে।
এবার বন্ধুকে বলো, ধীরে ধীরে কনুইটা ভাঁজ করতে। এই সময়ে পেশিটা আবার অনুভব করো।
পেশিটা আবার টিপে দেখো, এখন কেমন মনে হচ্ছে।
বন্ধুকে হাত নামাতে বলো। তাকে বলো, আবার হাতটা আস্তে আস্তে ভাঁজ করতে।
হাত দিয়ে অনুভব করে আর চোখে দেখে বোঝার চেষ্টা করো, পেশিটা লম্বায় ছোটো হচ্ছে, না বড়ো হচ্ছে, আর চওড়ায় মোটা হচ্ছে, না সরু হচ্ছে।

এবার নীচের সারণিতে ঠিক শব্দগুলোকে বেছে নিয়ে লেখো।

পেশির আকার	যখন হাত তুলছে এই সময়ে কিছু পেশি কাজ করে, অন্য পেশি বিশ্রাম করে	যখন হাত নামাচ্ছে এই সময়ে ওই পেশিগুলি বিশ্রাম করে, অন্য পেশি কাজ করে
কাজ করা পেশির দৈর্ঘ্য	কমছে/ বাড়ছে	কমছে/ বাড়ছে
কাজ করা পেশির প্রস্থ	কমছে/ বাড়ছে	কমছে/ বাড়ছে
কাজ করা পেশির কাঠিন্য	কমছে/ বাড়ছে	কমছে/ বাড়ছে

তাহলে হাতের ওই পেশিটা কী কাজ করছে? ....।

কাজ করার সময়ে পেশির কীরকম পরিবর্তন হচ্ছে? ....।

বিশ্রাম করার সময়ে পেশির কীরকম পরিবর্তন হচ্ছে? ....।

পেশি এইভাবেই কাজ করে। আচ্ছা, পেশি হাতটাকে টেনে তুলছে কী দিয়ে? কনুইটাকে মাঝামাঝি ভাঁজ করে কনুইয়ের মাঝখানে হাত দাও, দু-পাশ দিয়ে আঙুলে ধরে দেখো।

এই দড়ির মতো অংশটির নাম পেশিবন্ধনী বা টেনডন। এটি পেশির সঙ্গে হাড়কে যুক্ত করে। পেশি এটা দিয়েই হাড়কে টেনে তোলে।

এবার তোমার দেহে আর তোমার বন্ধুর আর কয়েকটি পেশির কাজ নিজে খুঁজে বার করো। তার পেশিবন্ধনীগুলি খুঁজে বার করার চেষ্টা করো।

1. হাতে .... 2. পায়ে .... 3. ঘাড়ে ....

এসো তো দেখি, সব পেশিগুলি একরকম কিনা?

একটা হলো হাতের পেশি; দ্বিতীয়টা হলো পাকস্থলীর গায়ের পেশি; তৃতীয়টি হলো আমাদের হৃৎপিণ্ডের পেশি। নীচের ছকে মেলাও :

কোথাকার পেশি	সবসময়ে কাজ করে কিনা	কখন কাজ করে	তোমার ইচ্ছেমতো কাজ করানো যায় কিনা
1. হাতের পেশি			
2. পাকস্থলীর পেশি			
3. হৃৎপিণ্ডের পেশি			
4.			

হাতের পেশিকে বলা হয় কঙ্কাল পেশি। কেন বলে বলো তো? ....।

পাকস্থলির পেশি হলো আন্তরযন্ত্রীয় পেশি (আন্তরযন্ত্র মানে বুক আর পেটের ভেতরের অঙ্গগুলো)। এমন নাম কেন? ....।

হৃৎপিণ্ডের পেশিকে বলা হয় হৃৎপেশি। এই পেশির বৈশিষ্ট্য কী? ....।

এখন বলো তো নীচের কাজগুলি কোন কোন রকমের পেশির দ্বারা সম্পন্ন হয় —

কাজের নাম	পেশির প্রকৃতি (কঙ্কাল পেশি/আন্তরযন্ত্রীয় পেশি/হৃৎপেশি)
ফুসফুসের সংকোচন-প্রসারণ	
চোয়ালের নড়াচড়া	
খাদ্যনালীর মধ্যে দিয়ে খাদ্যের চলাচল	
রক্তনালীর মধ্যে দিয়ে রক্তের চলাচল	
জিভের নড়াচড়া	
হৃৎপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণ	
চোখ খোলা ও বন্ধ করা	
কোদাল চালানো	
সুইচ অন বা অফ করা	
কথা বলা	
পাহাড়ে ওঠা	
সাঁতার কাটা	

পেশির সমস্যা

1. অণিমার বোনের কোমরের নীচে জন্মের পর থেকেই সাড়া নেই। পা-গুলো খুব সরু সরু।
2. চিরঞ্জিৎ আজকাল ওর লেখালেখির কাজ কম্পিউটারে বসেই করে। দীর্ঘসময় ধরে ওকে বসে থাকতে হয়। পিঠে ও ঘাড়ে ইদানীং ওর একটা ব্যথা হচ্ছে।
3. অসিতবাবুর ইদানীং চোখের পাতা নাড়াতে খুব কষ্ট হয়। হাত ও পায়ের পেশি খুব দুর্বল। বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথা। চলাফেরা করতে খুব কষ্ট হয়।

এই ঘটনাগুলোই হলো পেশি সংক্রান্ত নানান সমস্যা।

শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশ

অঙ্গের পরিচিতি

মাধুরী এখন এক বছরের। এইতো সেদিন জন্মাল। নয়নের ছোটোবোন। প্রথমদিন মাধুরীর হাত-পা-গুলো খুব ছোটো দেখেছিল। নয়ন ওর একটা আঙুল নিয়ে দেখেছিল। কি নরম! মাধুরী তখন দাদার আঙুলটা ধরতেই পারেনি। আর ধরবেই বা কী করে। ওর কি এত জোর হয়েছে? নয়ন ওর হাতের দিকে তাকায়। সত্যিই তো, ওর হাতে ও পায়ে এখন কত জোর।

আচ্ছা, তোমরা নীচের অঙ্গগুলো দিয়ে কী কী কাজ করো তা দলে মিলে চটপট করে ফেলো তো।

অঙ্গের নাম	কাজ
1. হাত	
2. আঙুল	
3. দাঁত	
4. কাঁধ	
5. হাঁটু	
6. পা	

ক্রমবিকাশ

দেখেছ তো তোমরা তোমাদের শরীরের নানা অঙ্গ দিয়ে কতরকম কাজ করতে পারো। নীচের তালিকায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন অঙ্গের অনুপাত করে ফেলো (স্বাভাবিক বৃদ্ধি হলে)।

বয়স	উচ্চতা (সেমি)	ওজন (কেজি)	অঙ্গের নাম	পরিমাপ (সেমি)	মাথা : হাত:দেহকাণ্ড:পা পরিমাপের অনুপাত
তিন বছর	95	14	মাথা	46.8 - 50.8	
			হাত	16 - 17	
			দেহকাণ্ড	12 - 13	
			পা	20 - 22	
ছয় বছর	113	20	মাথা	49	
			হাত	50	
			দেহকাণ্ড	40	
			পা	65	
নয় বছর	131	30	মাথা	51	
			হাত	59	
			দেহকাণ্ড	50	
			পা	71	
বারো বছর	149	40	মাথা	51	
			হাত	66	
			দেহকাণ্ড	55	
			পা	92	

অনুপাতগুলির মধ্যে তুলনা করো। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

তোমরা তো দেখলে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে শরীরের বিকাশ ঘটে। কথা বলা ও মনের ভাবপ্রকাশেরও বিকাশ ঘটে। শরীর ও মনকে স্বাস্থ্যকর করে গড়ে তুলতে গেলে দরকার পুষ্টিকর খাবার। সকাল-দুপুর-বিকাল-রাত্রে পরিমাণ মতো খাবার না খেলে শরীরের যেমন বৃদ্ধি হয় না, তেমন মনের বিকাশও বাধা পায়।

এসো আমরা আমাদের শ্রেণিকক্ষের সকল ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতা ও ওজন মেপে দেখি। তোমাদের লাগবে একটা স্কেল আর একটা ওজন মাপার যন্ত্র ও উচ্চতা মাপার ফিতে বা স্কেল।

ছাত্রছাত্রীর নাম	ওজন (কেজি)	উচ্চতা (সেমি)

দেখো তো, ক্লাসে তোমাদের উচ্চতা আর ওজন কেমন বাড়ে কমে? নীচের ছকে লেখো।

উচ্চতা (সেমিতে মাপা)

	137 সেমির কম	137-139	139-141	141-143	143-145	145-147	147-150
কতজন আছে							

ওজন

	30 কেজির কম	30-32কেজি	32-34কেজি	34-36 কেজি	36-38 কেজি	38-40 কেজি	40 কেজির বেশি
কতজন আছে							

তাহলে বলো তো, কোন খোপের ওজনের আর কোন খোপের উচ্চতার ছাত্রের সংখ্যা তোমার ক্লাসে সবচেয়ে বেশি?

এটাই তোমার ক্লাসের গড় উচ্চতা আর গড় ওজন।

আমরা আমাদের চারপাশে নানাধরনের মানুষ দেখতে পাই। তাদের নানারকমের স্বাস্থ্য। কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ রোগা বা কেউ মোটা। কেউ আবার স্বাভাবিক গড়ন, কারোর অস্বাভাবিক। যেমন ধরো দৈত্যাকার গঠন (জাইগ্যান্টিজম)। আবার কারোর মধ্যে রয়েছে বামনত্ব (ডোয়ারফিজম)।

রহিমের ছোটোবেলা থেকেই হাত-পা খুব লম্বালম্বা। বয়স যত বাড়তে লাগল অন্যান্য সমবয়সিদের তুলনায় ওর উচ্চতা অনেকটাই বেড়ে গেল। ডাক্তারবাবু ওকে দেখে বললেন রক্তে কোনো একটা রাসায়নিক পদার্থের ক্ষরণ বেড়ে যাওয়ার জন্যই নাকি এই অবস্থা। আবার কুণালের হাত-পা খুব ছোটো ছোটো। যদিও ও রহিমের সমবয়সি। ওর রক্তে ওই রাসায়নিক পদার্থের ক্ষরণ নাকি খুব কম। আবার, সুনীল ওদের তুলনায় একদম স্বাভাবিক। ডাক্তারবাবু বললেন উচ্চতা অনুযায়ী সুনীলের ওজন একদম ঠিক ।

নানা কারণে অস্বাভাবিক বিকাশ ঘটতে পারে। কখনও যথেষ্ট খাবার না পেলে, কখনও বা বেশি খাবার খেলে, কখনও বা কোনো রোগের বা বংশগত অস্বাভাবিকতার কারণে তা হতে পারে।

তোমরা তোমাদের এলাকায় কী কী ধরনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখেছ তার তালিকা তৈরি করো। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের কারণ অনুসন্ধান করো।

অস্বাভাবিক বৃদ্ধির লক্ষণ	অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণ	রোগটির নাম
	রক্তে কোনো একটা রাসায়নিক পদার্থের ক্ষরণ বেড়ে যাওয়া	জাইগ্যানটিজম
		ডোয়ারফিজম

অপুষ্টির কারণেও নানা অস্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। এসো ক্লাসের বন্ধুদের মধ্যে খুঁজে দেখি। যার রোগের লক্ষণ আছে তাতে টিক দাও।

নাম	নখের কোণা ভাঙা	দাঁতের সাদা ছোপ	চোখের কোণ ফ্যাকাশে	ত্বকের বর্ণ	হাড়ের আকৃতির পরিবর্তন	প্রায়ই হাড় ভেঙে যাওয়া	ঠোঁটের কোণে ঘা ও জিভে ঘা	মাড়ি ফোলা ও ফেটে রক্ত পড়া
সম্ভাব্য কারণগুলি হলো	ক্যালশিয়ামের অভাব, ফ্লুওরাইডের বিষক্রিয়া	ফ্লুওরাইডের বিষক্রিয়া	লোহা, ভিটামিন বি-এর ও প্রোটিনের অভাব	অপুষ্টি ও প্রোটিনের অভাব	ক্যালশিয়াম ও প্রোটিনের অভাব	ক্যালশিয়াম -এর অভাব	ভিটামিন বি-এর অভাব	ভিটামিন সি-এর অভাব

শরীর মোটা হয়ে গেলে বা বেশি খেলে শরীরে চর্বি জমতে থাকে। একেই আমরা বলি স্থূলত্ব (obesity)। এর ফলে শরীরে নানা রোগ হয়। মনের রোগও হতে পারে।

তোমরা তোমাদের স্কুলের/পাড়ার বিভিন্ন বয়সিদের মধ্যে এধরনের সমস্যা আছে কিনা তা দেখে নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

নাম	উচ্চতা (মি)	ভর (কেজি)	দেহভরসূচক ভর/(উচ্চতা)^2	রোগের নাম	রোগের লক্ষণ
			32	রক্তচাপ বেশি	একটুতেই হাঁফিয়ে যাওয়া, মাথা ঘোরা,মাথা ও ঘাড়ে ব্যথা, রুক্ষ মেজাজ

দেহভর সূচক নির্ণয় - সুস্থতার ধারণা

1. প্রথমে তোমার বন্ধুর ওজন নাও। ধরা যাক তোমার বন্ধুর ওজন 40 কেজি।
2. তারপর তোমার বন্ধুর উচ্চতা মাপো। ধরা যাক তোমার বন্ধুর উচ্চতা 4 ফুট।
3. এবার উচ্চতার একককে মিটারে পরিণত করো। সুতরাং 4 ফুট = 1.22 মি.। [জেনে রাখো, 1 ফুট = 0.3048 মি.]

এবার তোমরা সহজেই শিক্ষিক-শিক্ষিকার সাহায্যে দেহভর সূচক নির্ণয় করতে পারবে।

দেহভর সূচক $= \frac{\text{ওজন}}{(\text{উচ্চতা})^2}$; ওজন আমরা কেজিতে লিখব, আর উচ্চতা লিখব মিটারে।

সুতরাং তোমার বন্ধুর দেহভর সূচক হলো $= \frac{40}{(1.22)^2} = 26.87$

এবার পাশের চার্টটি মিলিয়ে দেখো :

আশঙ্কাজনকভাবে কম ওজন:	দেহভর সূচক 15-র কম
কম ওজন :	দেহভর সূচক 16-18.5
স্বাভাবিক ওজন :	দেহভর সূচক 18.5-25
বেশি ওজন :	দেহভর সূচক 25-30
মোটা হয়ে যাওয়া (স্থূলত্ব) :	দেহভর সূচক 30-40 বা তার বেশি

তাহলে দেখছ তো তোমার বন্ধুর ওজন কিন্তু উচ্চতা অনুযায়ী অনেক বেশি।

এখন থেকেই তার সাবধান হওয়া দরকার। না হলে নানারকম সমস্যা হতে পারে- হৃৎপিণ্ডের রোগ, হাড়ের রোগ, যকৃতের রোগ।

এছাড়াও আর কী কী সমস্যা হতে পারে তা শিক্ষক বা শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লেখো।

1. .... 2. .... 3. ....।

তোমরা দেখলে তো বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে শরীরের বৃদ্ধি ঘটে। তবে এই বৃদ্ধি ছেলে ও মেয়েদের বেলায় আলাদা আলাদা। মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি বেড়ে যায় সাড়ে আট থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত। শারীরিক বৃদ্ধির গতি থেমে যায় সতেরো আঠারো বছর বয়সে। তবে ছেলেদের বেলায় এই বিকাশ শুরু হয় একটু দেরিতে। প্রায় দশ বছর বয়স থেকে চোদ্দো বছর বয়স পর্যন্ত। এক্ষেত্রে বিকাশ থেমে যায় একুশ বছর বয়সে। বংশগত কারণ ও সঠিক পুষ্টি বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে দেহের পরিবর্তন ঘটে। উচ্চতা ও ওজন বাড়ে।

শরীরের ওজন শুধুমাত্র চর্বি জমে বাড়ে না, হাড় এবং পেশি বৃদ্ধির ফলেও ঘটে। চেহারা রোগা হলেও ওজন স্বাভাবিক হতে পারে।

নানা কারণে হাড়ের রোগ হয়। ফলে শারীরিক বিকাশও বাধা পায়। হাত ছোটো, দু-পায়ের ফাঁকের মধ্যে অস্বাভাবিক দূরত্ব, গলা লম্বা, হাত পা বাঁকা — এরকম নানা সমস্যা হতে পারে। এছাড়া হৃৎপিণ্ড, চোখ, নাক, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদির বিকাশেও নানারকম ত্রুটি দেখা যায়। পুষ্টির অভাব ও পরিবেশগত নানা কারণে এইসব সমস্যার সৃষ্টি হয়।

9 সাধারণ যন্ত্রসমূহ

যন্ত্রের ধারণা

প্রত্যুষ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠল। তারপর **প্যাঁচ দেওয়া ঢাকনি** খুলে দাঁত মাজার মাজনের পাত্র থেকে মাজন নিল এবং **ব্রাশ** দিয়ে দাঁত মাজল। **টিউবওয়েলের (চাপা কল) হাতলে** চাপ দিতেই কলের মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। সেই জলে ও মুখ ধুলো। এরপর মা ওকে সুচে সুতো পরিয়ে দিতে বললেন। প্রত্যুষ **সুচে সুতো** পরিয়ে দিল। তারপর **কলমটা** বের করে লিখতে বসল। কিন্তু বারান্দায় গিয়ে দেখে বাবা **হাতুড়ি** দিয়ে দেয়ালে একটা পেরেক পুঁতছেন। তখন হঠাৎই ওর মনে পড়ে গেল, ওর চেয়ারেও একটা **স্ক্রু** ঢিলে হয়ে গেছে। বাবাকে জানাতেই বাবা **স্ক্রুড্রাইভার** দিয়ে স্ক্রুটাকে টাইট করে দিলেন। তারপর প্রত্যুষ শুরু করে স্কুলের প্রোজেক্টের কাজ। **ছুরি** আর **কাঁচি** দিয়ে কাগজ কেটে তৈরি করল ফুল। **সাঁড়াশি** দিয়ে তারকে বেঁকিয়ে তৈরি করল গাছের ডাল। আগামীকাল স্বাধীনতা দিবস। খুব মজা। **কপিকলে** দড়ি পরিয়ে জাতীয় পতাকা তোলা হবে। তারপর নিতাই কাকার দোকানের ফলের রস বেশ মজা করে খাওয়া হবে। প্রত্যুষের কিন্তু মজা লাগে **বটল ওপেনার** দিয়ে ওই বোতলের ঢাকনি খুলতে।

- বলতে পারো, মোটা অক্ষরে লেখা জিনিসগুলো কী?

খেয়াল করে দেখো, এই প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের কাজকে কত সহজ করে দেয়। **এই জিনিসগুলোর ওপর তুমি বল প্রয়োগ করো এক জায়গায়, আর কাজ হয় আর এক জায়গায়।**

তুমি কি **শাবল** দিয়ে মাটি খুঁড়তে দেখেছ? শাবলের কোন জায়গায় **বল প্রয়োগ** করা হয়, আর **কাজ** হয় কোন জায়গায়?

এই জিনিসগুলোকে বলে '**সরল যন্ত্র**'। তুমি এই ধরনের আরো কিছু যন্ত্রের নাম নীচে লেখো।

____

____

____

এরকম দুই বা তার বেশি সরল যন্ত্র নিয়ে তৈরি হয় '**জটিল যন্ত্র**'। যেমন ধরো, '**সেলাইমেশিন**'। ভালো করে লক্ষ করো, একটা সুচের সঙ্গে **আরো কত সরল যন্ত্র মিলে** এই মেশিনটা তৈরি হয়েছে। একটা সুচ দিয়ে একটা একটা করে সেলাই করতে হয়। কত সময় লাগে। কত কষ্ট হয়। আবার প্রতিটি সেলাই সমান নাও হতে পারে। কিন্তু দেখো একটা সেলাইমেশিন দিয়ে কত তাড়াতাড়ি, কত সূক্ষ্মভাবে আর কত সহজে ওই সেলাই-এর কাজ করা যায়।

আসলে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রও ক্রমশ উন্নত হয়েছে। তৈরি হয়েছে **সরল যন্ত্র থেকে জটিল যন্ত্র**। তার থেকে **জটিলতর যন্ত্র**। এভাবে সরল যন্ত্রের হাত ধরেই আবিষ্কৃত হয়েছে কত সব জটিল যন্ত্র। এমনকি '**কম্পিউটার**'। বাড়িতে, অফিসে, স্কুল-কলেজে, হাসপাতালে, কল-কারখানায় আজ প্রায় সর্বত্রই যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়।
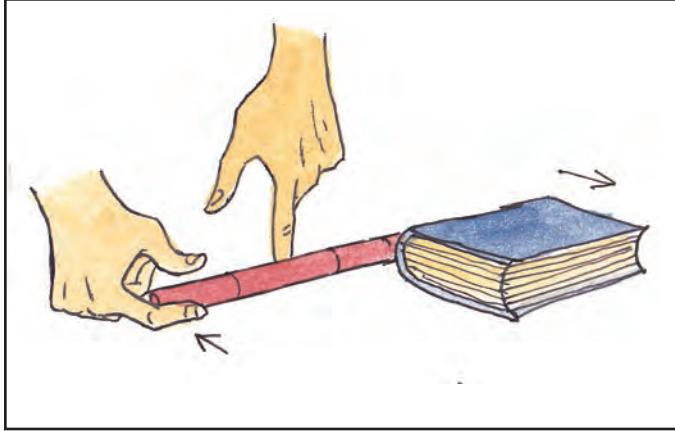
এসো, এরকম যন্ত্রের একটা তালিকা বানাই। শূন্যস্থানে শব্দভাণ্ডার থেকে উপযুক্ত শব্দ বসাই।

সরল যন্ত্র	জটিল যন্ত্র
সুচ	সেলাই যন্ত্র
কলম	ছাপার যন্ত্র (ম্যানুয়াল, অফসেট)
করাত, ছুরি, ব্লেড, কাঁচি	ইলেকট্রিক কাটিং যন্ত্র
ছেনি	ড্রিল যন্ত্র, (দেয়াল ইত্যাদি ফুটো করার জন্য)
শাবল	ভাইব্রেটিং যন্ত্র

শব্দভাণ্ডার — বঁটি, গাঁইতি, সাইকেল, ফ্যান, লাঙল, ট্রাক্টর, লেদ মেশিন।

লিভার (Lever)

ছবিতে যেভাবে দেখানো আছে ঠিক সেইভাবে একটি বই, একটি পেন বা পেনসিল ও তোমার ডান ও বাঁ হাতের আঙুলগুলো রাখো। এবার ডান হাতের আঙুল দিয়ে পেনটাকে তোমার নিজের দিকে টানো।

কী দেখতে পেলে? বইটা সরে গেল তো?

এখন তুমি বাঁ হাতের আঙুলটা একটু একটু করে ডান হাতের আঙুলের দিকে আনতে থাকো এবং পরীক্ষাটা করতে থাকো।

কী বোঝা গেল? বাঁ হাতের আঙুল যত ডান হাতের আঙুলের কাছাকাছি আনছ, তত তোমার পেনটা টানতে কষ্ট হচ্ছে। অর্থাৎ তত বেশি বল প্রয়োগ করতে হচ্ছে।

এবার, বাঁ হাতের আঙুলটা বই-এর দিকে নিতে থাকো। আর একই পরীক্ষা চালিয়ে যাও। এবারে তুমি ঠিক উলটোটাই দেখতে পাবে।

তুমি যে সরল যন্ত্রটা তৈরি করেছ তার নাম কি জানো? **লিভার**। বইটাকে সরাবার জন্য তুমি পেনের ওপর যে টান প্রয়োগ করেছিল তা হলো **বল**। পেনের অপর প্রান্তে যে বইটাকে সরানো হলো তা **বাধা**।

বাঁহাতের আঙুলটা যেখানে পেনকে স্পর্শ করল, তাকে বলে **আলম্ব**। **এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে লিভার (এখানে পেন) অবাধে ঘুরতে পারে**।
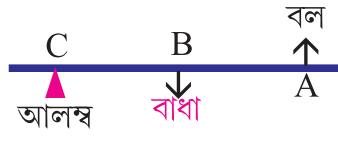
'বল', 'বাধা' ও 'আলম্ব' এই তিনটের অবস্থান ভেদে লিভার তিন রকমের হয়।

ছবিতে তিন শ্রেণির লিভারে বলের প্রয়োগ বিন্দু (A), বাধার প্রয়োগ বিন্দু (B) ও আলম্ব বিন্দুর (C) অবস্থান লক্ষ কর। তারা কোথায় আলাদা তা আলোচনা কর।
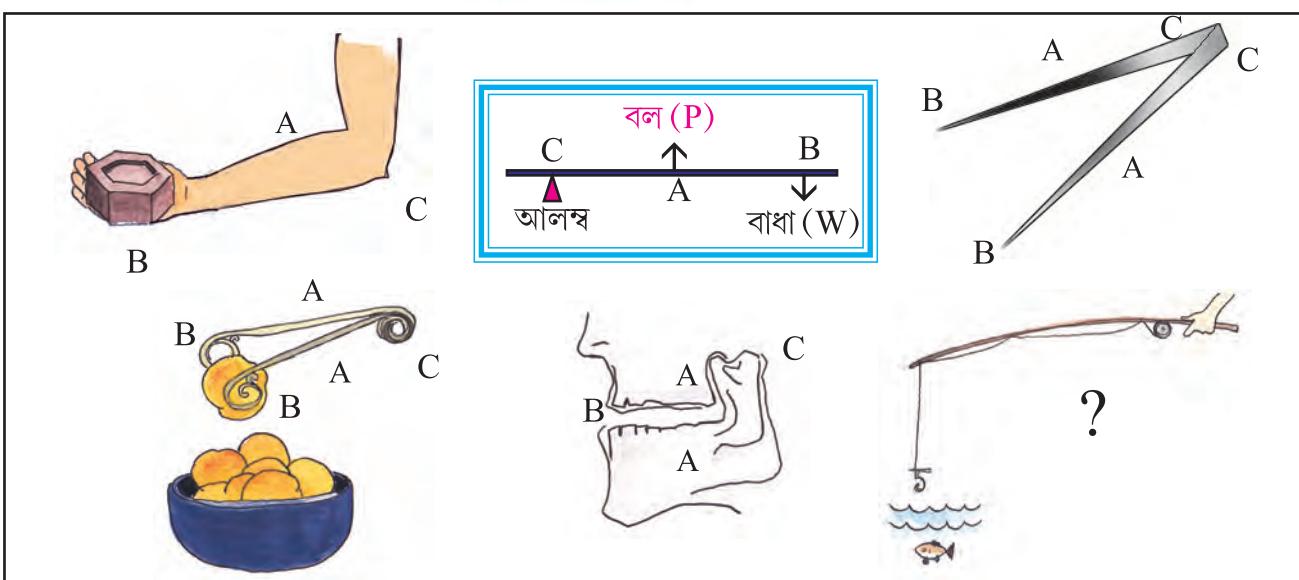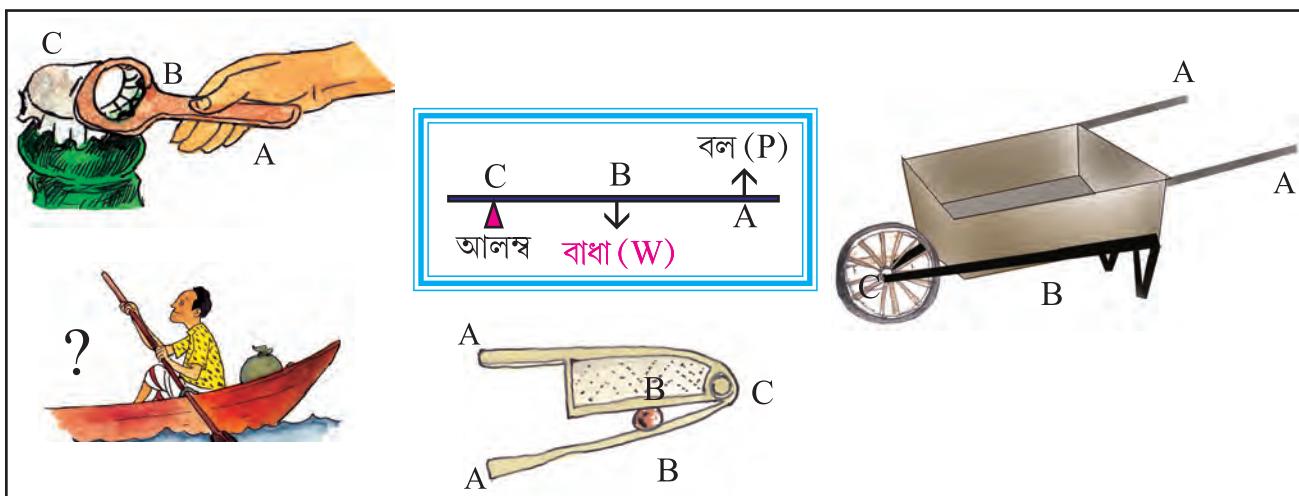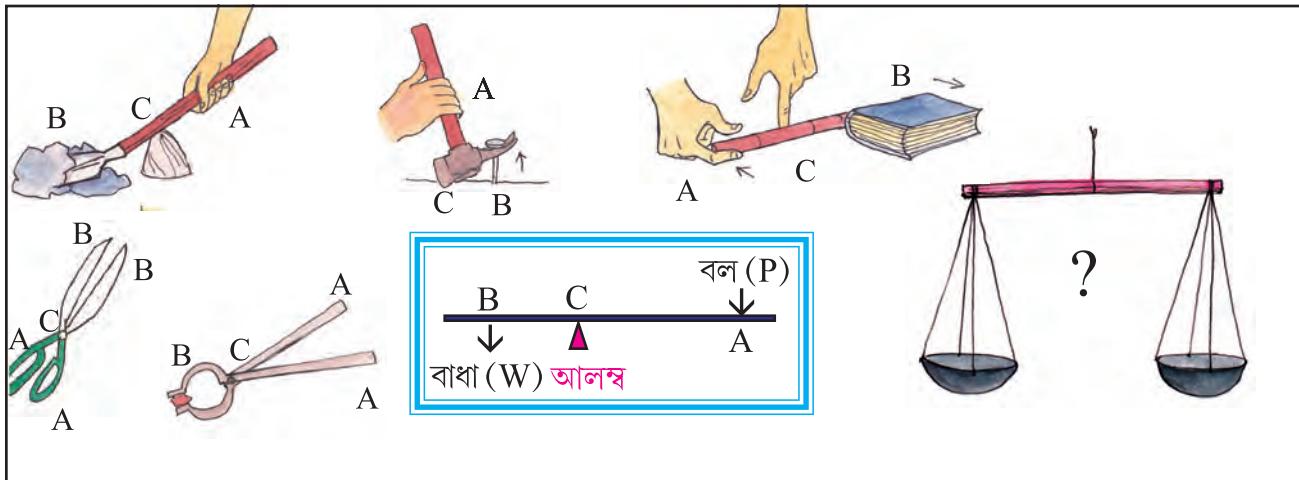
প্রশ্নচিহ্ন (?) অংশটি তুমি পূরণ করো :

নততলের ধারণা

সঠিক স্থানে '✓' দাও :

পাশের ছবিটা দেখো। এবার ভেবে বলো তো কোনটি বেশি সহজ :

- মাটির সঙ্গে খাড়াভাবে থাকা একটা নারকেল গাছ বেয়ে তোমায় উঠতে হচ্ছে।
  গাছের সঙ্গে হেলিয়ে রাখা মই দিয়ে তোমায় উঠতে হচ্ছে।
- দেয়াল বেয়ে ছাদে উঠছো।
  অথবা সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠছো।
- সাইকেল চালিয়ে অনেকটা খাড়াই ব্রিজে ওঠা।
  সাইকেল চালিয়ে কম খাড়াই যুক্ত ব্রিজে ওঠা।

- পাশের ছবিটা দেখো। এবার বলো একটা ভারি ড্রামকে খাড়াভাবে চাগিয়ে কি লরিতে তোলা সহজ?

ওই ড্রামটিকে, লরির সঙ্গে হেলানো কাঠের তক্তার ওপর ঠেলে দিয়ে গড়িয়ে তোলা কি বেশি সহজ ?

ভাবো তো সাধারণ সিঁড়ির চেয়ে খাড়াই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে কষ্ট বেশি হয় কেন?
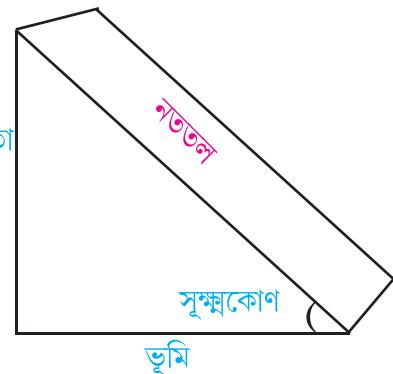
খাড়াই রাস্তা ধরে পাহাড়ে ওঠার চেয়ে আঁকাবাঁকা পথে ওঠা অনেক আরামের কেন?

হেলিয়ে রাখা মই, সিঁড়ি, ব্রিজ, ড্রাম গড়িয়ে ওপরে তোলার জন্য হেলানো কাঠের তক্তা এদের বলে **নততল**।

নততল একটা সমতল পাটাতন বা ওই ধরনের কোনো সমতল যাকে মাটির সঙ্গে সূক্ষ্মকোণ করে রাখা হয়।

ওপরের অভিজ্ঞতা থেকে তাহলে একথা বলা যায় **নততলের খাড়াই যত কম হবে নততলের সুবিধে তত বেশি হবে। অর্থাৎ ভূমি ও নততলের মাঝের কোণ যত ছোটো হবে নততলের সুবিধা তত বেশি হবে।**

স্ক্রু, পুলি, চক্র ও অক্ষদণ্ড

স্ক্রু

একটা কাঠের ব্লকে একটা পেরেক ও একটা স্ক্রু পুঁততে হবে।

পেরেকটাকে তুমি পুরোটাই হাতুড়ির ঘায়ে কাঠের ব্লকে পুঁতলে। এবার স্ক্রুকে তুমি প্রথমে সোজা করে ব্লকের ওপর ধরলে। তারপর ওর মাথার খাঁজকাটা অংশে স্ক্রুড্রাইভারটা আটকিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাঠের ব্লকে প্রবেশ করালে।

এবার বলো তো, কোনো ক্ষেত্রে তোমার কম বল প্রয়োগ করতে হলো?
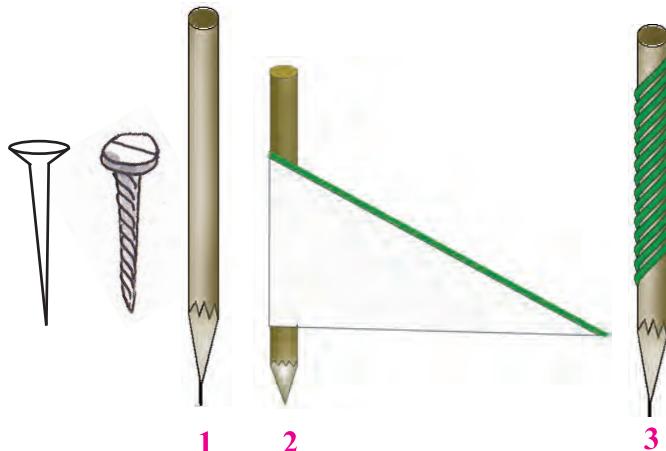
কোন ক্ষেত্রে ব্লকটা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি?

কাঠের ব্লকে পুঁতে দেবার পর, পেরেক বা স্ক্রুর মধ্যে কোনটি কাঠের ব্লকে বেশি শক্তভাবে বসে থাকবে?

তাহলে দেখা গেল, **পেরেক অপেক্ষা স্ক্রু-র সুবিধা অনেক বেশি**। এখন প্রশ্ন হলো, কী কারণে স্ক্রু-র সুবিধা পেরেকের চেয়ে অনেক বেশি।

আসলে স্ক্রু-র মধ্যে লুকিয়ে থাকা নততলই এর কারণ। স্ক্রু-এর গায়ে যে ধাতব প্যাঁচ থাকে তা আসলে একটি **নততল**।

ছবি 1, 2 ও 3-এ তা দেখানো হয়েছে। ছবির মতো করে একটা তিনকোণা কাগজের টুকরো কেটে নাও। ছবিতে দেখো ওই কাগজের যে অংশে সবুজ রং করা হয়েছে তুমিও তাই করো। ওই অংশটা হলো নততলের প্রান্ত দেশ। এবার ছবির মতো করে কাগজটা একটি পেনসিলের গায়ে জড়িয়ে নাও।

কীদেখতে পাচ্ছ? স্ক্রু-এর গায়ের সঙ্গে পেনসিলটার গায়ের মিল পাচ্ছ কি?

স্ক্রু-এর ওই প্যাঁচানো অংশ ধারালোও বটে। ফলে সহজেই তা স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে ঘুরতে ঘুরতে কাঠে বসে যেতে পারে।

পুলি বা কপিকল

ওপরের ছবি দুটো লক্ষ করো। তারপর নীচের প্রশ্নের উত্তর লেখো।

রবির মা কী করছেন?

কীভাবে তা করছেন?

রবির মা কোন দিক থেকে কোন দিকে বল প্রয়োগ করছেন?

রবির মা কী করছেন?

কীভাবে তা করছেন?

রবির মা কোন দিক থেকে কোন দিকে বল প্রয়োগ করছেন?

কোন ক্ষেত্রে রবির মা-র কষ্ট কম হচ্ছে?
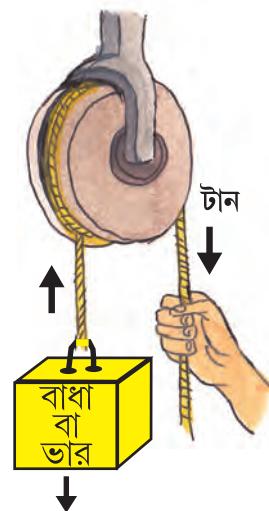
যে ক্ষেত্রে রবির মা-র কম কষ্ট হয়েছে, সেক্ষেত্রে রবির মা কী জিনিস ব্যবহার করায় সেটা সম্ভব হয়েছে? ভাবো।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, রবির মা ব্যবহার করেছেন একটা **সরল যন্ত্র**। এই যন্ত্রের নাম **পুলি বা কপিকল**। আর এই চক্রই রবির মায়ের কুয়ো থেকে জল তোলার কাজ সহজ করে দিয়েছে।

কপিকল হলো একটা **শক্তপোক্ত চাকা**। রাস্তায় চললে চাকার যে স্থান মাটিতে স্পর্শ করে, পুলির সেই স্থানের মাঝখানটায় গর্তকাটা থাকে, আর দু-পাশটা থাকে উঁচু। গর্তের মধ্যে চক্রকে ঘিরে থাকে একটা দড়ি। যার এক প্রান্তে **ওপর থেকে নীচের দিকে টান দেওয়া হয়**। আর অপর প্রান্তে থাকে **'বাধা' (যে বস্তুকে নীচ থেকে ওপরে তোলা হয়)**।
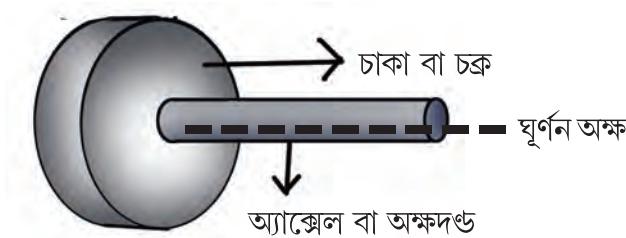
কপিকলের কেন্দ্রে থাকে একটা লম্বা দণ্ড বা অ্যাক্সেল। একে কেন্দ্র করে কপিকল অবাধে ঘুরতে পারে। কপিকল, তোমার বল প্রয়োগের **দিককে ঠিক উলটো করে দেয়**। অর্থাৎ তুমি সরাসরি নীচ থেকে ওপরে দড়ির সাহায্যে কোনো বস্তুকে তুলতে চাইলে, বস্তুটি উঠছে উপরের দিকে কিন্তু তোমার বল প্রয়োগ করতে হচ্ছে নীচের দিকে। কপিকল তুমি আর কোথায় কোথায় ব্যবহার করতে দেখেছ তা পাশে লিখে ফেলো। ....।
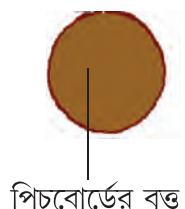
চক্র ও অক্ষদণ্ড

একটা পিচবোর্ড কেটে বৃত্ত তৈরি করো। বৃত্তটার কেন্দ্র দিয়ে পেনসিল বা পেন আঁটোসাঁটোভাবে প্রবেশ করাও। প্রয়োজনে বৃত্ত ও পেনসিলের (বা পেনের) সংযোগস্থলে আঠা ব্যবহার করো। দেখো তোমার বানানো জিনিসটির সঙ্গে স্ক্রু-ডাইভার, রেডিয়োর নব, ট্যাপের মাথার অংশের অনেক মিল আছে।

ওই বৃত্ত আর পেনসিল বা পেন দিয়ে তুমি আসলে বানিয়ে ফেলেছ একটা সরল যন্ত্র। এই যন্ত্রকে বলে **'চক্র ও অক্ষদণ্ড** ।

পিচবোর্ডের বৃত্ত

ওই পিচবোর্ডের বৃত্তটা হলো **চক্র**।

পেনসিল বা পেনটা হলো **অক্ষদণ্ড** ।

পেনসিল

এবার, পিচবোর্ডের বৃত্তটাকে একপাক পুরো ঘুরিয়ে দেখো পেনসিল বা পেনটা একপাকই ঘুরছে।

এই চক্র ও অক্ষদণ্ড উভয়েই একসঙ্গে তাদের একই কেন্দ্র দিয়ে যাওয়া **স্থির অক্ষকে** কেন্দ্র করে অবাধে ঘুরতে পারে। এই অক্ষকে **ঘূর্ণনঅক্ষ** বলে।

চক্রটিতে অপেক্ষাকৃত কম বল প্রয়োগ করে বেশি বাধা অতিক্রম করা যায়।

আর, কোথায় কোথায় চক্র ও অক্ষদণ্ডের ব্যবহার তুমি দেখেছ তা নীচে লেখো।
আখ পেষাই যন্ত্র ....।

যন্ত্রের পরিচর্যা

ভেবে দেখো তো

- তুমি প্রতিদিন স্নান করো কেন? দাঁত মাজো কেন?
- বাড়িঘর নিয়মিত পরিষ্কার রাখা হয় কেন?
- লোহার জিনিসপত্র নিয়মিত রং করা হয় কেন?
- খাতা-বই মলাট দিয়ে রাখো কেন?

এরকম নানা কাজ আমরা করি। নিজেকে, সমাজকে, নানা জিনিসপত্রকে ক্ষয়, ক্ষতি, দূষণ, ব্যাধি ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য।

যন্ত্রেরও তাই দরকার হয় নিয়মিত যত্ন বা পরিচর্যা। এসো, আলোচনা করি, কীভাবে যন্ত্রের পরিচর্যা করা যায়।

(1) যন্ত্রের যে অংশ চলমান বা ঘূর্ণায়মান সেই অংশে ঘর্ষণ বেশি হয়। ফলে সেই অংশ দ্রুত ক্ষয় হতে থাকে। তাই ঘর্ষণ কমাতে ওই অংশে পিচ্ছিল তেল বা গ্রিজ লাগানো উচিত।

(2) লোহার তৈরি যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ জলীয় বাষ্পের হাত থেকে রক্ষা করা দরকার। তা না হলে মরচে (জং) ধরে তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তেল রং (সিন্থেটিক এনামেল) করেও মরিচার হাত থেকে লোহার যন্ত্র বা যন্ত্রাংশকে রক্ষা করা যায়।

(3) কাজের পর যন্ত্রকে নিয়মিত পরিষ্কার করে রাখা দরকার।

10 জীববৈচিত্র্য ও তার শ্রেণিবিভাগ

সে দিন ক্লাসে স্যার বললেন— পৃথিবীতে কত ধরনের জীব আছে অনুমান করে বলত ? দেবপ্রকাশ বলল — দশ হাজার।

সোনা বলল — এক লাখ।

প্রীতম বলল— দশ লাখ।

স্যার মাথা নাড়ছিলেন। সবাই মিলে তখন জিজ্ঞাসা করল — তাহলে কত স্যার ?

স্যার মুচকি হেসে বললেন — প্রায় তিন কোটি! বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন সারা পৃথিবীতে তিন কোটি বা তারও বেশি প্রজাতির জীব বাস করে।

সমীর বলল— প্রজাতি কী ?

স্যার বললেন— একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবকে প্রজাতি বলে, ইংরাজিতে বলে স্পিসিস (species)। একই প্রজাতির জীব থেকে সেই একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত ধরনের জীব জন্ম নেয়। যেমন ধরো বাঘ একটা প্রজাতি, বিড়াল একটা প্রজাতি। শালিখ একটা প্রজাতি, চড়ুই একটা প্রজাতি। কাকদের মধ্যে শহরে যে গলায় ছাই ছাই রং-এর কাক দেখি সেই পাতিকাক একটা প্রজাতি। আবার, গ্রামের দিকে পুরো দেহ কুচকুচে কালো রং-এর যে দাঁড়কাক দেখা যায় সেটা অন্য একটা প্রজাতি। এরকম সাপ, ব্যাং, মাছ-সবার মধ্যেই জীবরা আলাদা আলাদা প্রজাতি হিসাবে থাকে।

সৈকত বলল— গাছদের মধ্যেও প্রজাতি হয় স্যার ?

— নিশ্চয়! আমগাছ, নিমগাছ, নারকেলগাছ, বকুল, কৃষ্ণচূড়া, ইউক্যালিপটাস— সবাই আলাদা আলাদা প্রজাতি।

পারভিন হঠাৎ হাত তুলে বলল — মানুষও কি একটা প্রজাতি ?

— অবশ্যই! সারা পৃথিবী জুড়ে যত মানুষ আছে তারা যেরকম দেখতেই হোক বা যে ধর্মেরই হোক সবাই একই প্রজাতির। সবাই হলো *হোমো সেপিয়েন্স (Homo sapiens)*। বিজ্ঞানীরা মানুষ প্রজাতির এই নামই দিয়েছেন।

বিজ্ঞানীরা মানুষের আলাদা একটা নাম দিয়েছেন কেন — সোমা জিজ্ঞাসা করল।

— বারে! সাধারণ মানুষ তো একধরনের জীবকে তাদের ভাষায় একটা নামে ডাকে। বিভিন্ন জায়গায়

ভাষা অনুযায়ী একই প্রজাতির জীবের বিভিন্ন নাম। যেমন— আমরা বলি বাঘ, ইংরেজরা টাইগার (Tiger), হিন্দিভাষীরা বলে — শের, দক্ষিণভারতে কোথাও বাঘকে বলা হয় — হুলি বা কোথাও পুলি। এবার বলো—বাঘ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞানীরা আলোচনা করতে বসলে গুলিয়ে যাবে না। বিজ্ঞানীর কাছে তাই বাঘের একটাই নাম— *প্যানথেরা টাইগ্রিস* (*Panthera tigris*)। একইরকমভাবে, প্রত্যেক প্রজাতির একটা করে বৈজ্ঞানিক নাম থাকে।

দেবপ্রকাশ এবার প্রশ্ন করল — তিন কোটি প্রজাতির তাহলে তিন কোটি বৈজ্ঞানিক নাম আছে?

—বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত মাত্র উনিশ লক্ষের মতো প্রজাতির জীবের বৈজ্ঞানিক নাম দিয়ে উঠতে পেরেছেন। ভেবেচিন্তে সবাই একমত হয়ে প্রজাতির নাম দিতে হয় তো — তাই সময় লাগে।

এবার সমীরের মাথায় প্রশ্ন এল— নাম না হয় আলাদা হলো— কিন্তু তিন কোটি জীব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের মাথা গুলিয়ে যায় না?

স্যারকে সেটা বলতে স্যার বললেন— গুলোবারই তো কথা। তার জন্য ওঁরা কী করছেন বলছি। আচ্ছা, তোমরা তো বইয়ের দোকানে বই কিনতে গেছ। সেখানে তো হাজারখানেক নানাধরনের বই। তার মধ্যে থেকে দোকানদার কাকু কী করে এক নিমেষে তোমার বইটা বের করে দেন?

রতন এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এবার সে বলে উঠল— আমি জানি, আমার বাবা বইয়ের দোকানে কাজ করেন। বিষয় অনুসারে বইগুলোকে আলাদা আলাদা র‍্যাকে রাখা হয়। কাগজ সেঁটে সেই র‍্যাকের বিষয়টার নাম লেখাও থাকে। আবার, একটা র‍্যাকের ভিতর একই বিষয়ের কিন্তু আলাদা ক্লাসের বই আলাদা আলাদা করে রাখা থাকে। কেউ কোনো বই চাইলে সেটা চট করে খুঁজে পাওয়া যায়।
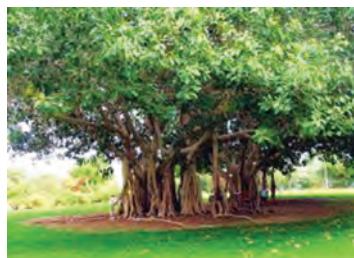
সমীর বলল— ওষুধের দোকানেও ওরকম সাজিয়ে রাখে। আমাদের পাড়ার ওষুধের দোকানে দেখেছি। ওষুধের নামের প্রথম অক্ষর অনুযায়ী ওষুধগুলো সাজানো থাকে। (A) দিয়ে যে ওষুধের নাম শুরু, সেটা থাকে 'A' লেখা তাকে। 'B' দিয়ে যে ওষুধের নাম সেটা থাকে 'B' লেখা তাকে— এরকম।

— না হলে প্রেসক্রিপশন দেখে ওষুধ খুঁজে বের করতে দোকানদারের সারাদিন লেগে যাবে হয়তো। যে-কোনো জিনিসই যদি অনেক ধরনের হয়— তাকে একটা নিয়ম মেনে সাজিয়ে নিতে হয়। বিজ্ঞানীরাও তাই তিন কোটি প্রজাতিকে সাজিয়ে নেন।

পারভিন তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করে— কীভাবে স্যার?

—সেটাই বলছি। বিজ্ঞানীরা প্রজাতিদের নিয়ে যে জীবজগৎ তাকে ছ-টা ভাগে ভাগ করেন। একেকটা ভাগকে বলা হয় একেকটা জীবরাজ্য বা কিংডাম (Kingdom)। জীবজগতে এই ছ-টা রাজ্যের এক একটার এক এক রকম নাম— যেমন প্রাণীদের রাজ্য হলো অ্যানিমালিয়া (Animalia)। গাছপালা, শ্যাওলা মস— সব উদ্ভিদ নিয়ে রাজ্য প্ল্যান্টি (Plantae)। ব্যাঙের ছাতা আর অন্যান্য সব ছত্রাকদের রাজ্য হলো ফানজাই (Fungi)। এককোশী জীব অর্থাৎ যাদের দেহ বলতে একটাই কোশ তাদেরও আবার তিনটে রাজ্যে ভাগ করা হয়-ব্যাকটেরিয়ার রাজ্য- যার নাম ব্যাকটেরিয়া। এছাড়াও অ্যামিবা, জিয়ার্ডিয়া, ইউগ্লিনা, প্লাসমোডিয়াম, প্যারামেসিয়াম— এরকম এককোশী জীবদের রাজ্যের নাম— প্রোটোজোয়া (Protozoa)। এছাড়াও, আর একটা রাজ্য আছে এককোশী জীবদের, তার নাম ক্রোমিস্টা (Chromista)। তাদের কথা আমরা কম জানি।

প্রাণী

উদ্ভিদ

ছত্রাক

ব্যাকটেরিয়া

সোমা প্রশ্ন করল— আমি শুনেছি, আমাদের শরীরে ভাইরাস ঢুকলে তো ভাইরাল রোগ হয়।

স্যার বললেন— ঠিক বলেছ। কিন্তু ভাইরাস ঠিক পুরোপুরি জীব নয়। জীব আর জড় পদার্থের মাঝামাঝি অবস্থা। তাই জীবরাজ্যে তাদের ঠাঁই হয়নি। তবে আমরা এখানে জীবজগতের অন্য আর একধরনের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করব। এই শ্রেণিবিভাগে জীবজগতকে পাঁচটা রাজ্যে ভাগ করা হয়। প্রাণীদের রাজ্য অ্যানিমালিয়া (Animalia), ছত্রাকদের রাজ্য ফানজাই (Fungi) উদ্ভিদদের রাজ্য প্ল্যান্টি (Plantae), ব্যাকটেরিয়ার রাজ্য মোনেরা (Monera) আর এককোশী জীবদের রাজ্য প্রোটিস্টা (Protista)।

প্রোটোজোয়া

ক্রোমিস্টা

জীব রাজ্যের প্রজাতিদের মধ্যে কোনো ভাগ নেই?— রতন জিজ্ঞাসা করল।

— নেই আবার, প্রাণীরাজ্যেই কত ভাগ। তোমরাই বলো না— প্রথমে যাদের দেহে কোনো মেরুদণ্ড নেই অর্থাৎ, অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের কথা বলো।

সমীর প্রথমেই বলল— পোকামাকড়।

হ্যাঁ। পোকা, মাকড়সা, এমনকি চিংড়ি, কাঁকড়া এদের সবাইকে একসঙ্গে বলা হয় আর্থ্রোপোডা (Arthropoda)। এদের শুঁড় আর পা-গুলো খণ্ডে খণ্ডে থাকে আর গায়ের উপর একটা শক্ত খোলা থাকে।

পারভিন বলল— শামুক, ঝিনুক।

স্যার বললেন— শামুক, ঝিনুক, এমনকি সমুদ্রে থাকে যে অক্টোপাস, তারা সবাই একই জাতের, এদের চলাফেরার জন্য মাংসল পা থাকে। আর নরম গায়ের বাইরে বা ভিতরে থাকে একটা চুনজাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি খোলক। এদের বলে মোলাস্কা (Mollusca)। এইভাবে আলোচনা করতে করতে ওরা স্যারের কাছ থেকে আরও অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের কথা জানল।

ওরা যেসব অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের কথা জানল, সেগুলো হলো—

প্রাণীদের নাম	এদের কী বৈশিষ্ট্য	এদের জাত কে কী বলা হয়
পোকা, মাকড়সা, কাঁকড়া, চিংড়ি		আর্থ্রোপোডা
		মোলাস্কা
কেঁচো, জোঁক		অ্যানিলিডা
গোলকৃমি	মানুষ বা অন্য প্রাণীর পেটে বাস করে।	অ্যাস্কহেলমিনথেস
চ্যাপটা কৃমি	মানুষ বা অন্য প্রাণীর পেটে বাস করে অর্থাৎ পরজীবী। স্বাধীনভাবে বাস করে অল্প কয়েক ধরনের চ্যাপ্টা কৃমি।	প্লাটিহেলমিনথেস
তারা মাছ (স্টারফিশ), সি-আরচিন	সারা গায়ের ত্বকে কাঁটা থাকে, মুখ দেহের নীচের দিকে থাকে।	একাইনোডার্মাটা

কেঁচো

গোলকৃমি

চ্যাপটা কৃমি

তারা মাছ

প্রাণীদের নাম	এদের কী বৈশিষ্ট্য	এদের জাতকে কী বলা হয়
রুই, শিঙি (মাছ), ব্যাং (উভচর), সাপ, টিকটিকি (সরীসৃপ), পায়রা, শালিক (পাখি), গোরু, মানুষ (স্তন্যপায়ী)	এদের দেহের মাঝ বরাবর ভ্রূণ অবস্থায় নোটোকর্ড নামে একটা দণ্ড থাকে। প্রথম স্তম্ভে দেওয়া প্রাণীদের পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নোটোকর্ড থেকে মেরুদণ্ড গজায়।	কর্ডাটা; প্রথম স্তম্ভে দেওয়া প্রাণীরা, যাদের নোটোকর্ডের বদলে মেরুদণ্ড গজায় তারা হলো মেরুদণ্ডী বা ভার্টিব্রেট প্রাণী। তবে কর্ডাটাদের মধ্যে অনেকের পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নোটোকর্ড থেকে মেরুদন্ড গজায় না।

মাছ উভচর

সরীসৃপ

পাখি

স্তন্যপায়ী

সবশেষে যে প্রাণীদের ভাগটার কথা স্যার বোর্ডে লিখলেন তার নাম— মেরুদণ্ডী। লিখে বললেন— এবার আমি শুধু মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে যে বিভিন্ন জাতের প্রাণী আছে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখছি একদিকে, তোমরা অন্যদিকে সেই জাতটার নাম কী তা লিখবে। তাহলেই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে কটা ভাগ সেটা পেয়ে যাবে।

এই মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো	এই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভাগটার নাম
1. জলে থাকে, গায়ে আঁশ, পাখনা নেড়ে চলাফেরা করে, ফুলকা দিয়ে শ্বাস নেয়।	1. মাছ
2. বাচ্চাবেলায় জলে থাকে, লেজ নেড়ে সাঁতার কাটে, বড়ো হলে ডাঙার চারপাশে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে।	2.
3. ডাঙাতেই ডিম পাড়ে, ডাঙাতেই বড়ো হয়, চলার সময় বুক মাটিতে ঘষটে যায়।	3.
4. গা পালকে ঢাকা, ডানা মেলে উড়তে পাড়ে, ডিম পাড়ে, ডিম ফুটিয়ে বাচ্চাকে বড়ো করে ।	4.
5. ডিম পাড়ে না, বাচ্চা দেয়। বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে বড়ো করে।	5.

এবার তাহলে তোমরা নীচের প্রাণীগুলোকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নীচের বক্সে বিভিন্ন ভাগে সাজাও।

রুই, কেঁচো, বাদুড়, শেয়াল, টুনটুনি, হাতি, বেড়াল, বাঘ, শজারু, কই, পেঁচা, শকুন, কচ্ছপ, ক্যাঙারু, জলহস্তী, তিমি, কেউটে, শুশুক, আরশোলা, প্রজাপতি, গন্ডার, গোসাপ, কুমির, মাগুর মাছ, হাঙর, মানুষ, ব্যাং, স্যালামানডার, জোঁক, শামুক, ঝিনুক, মশা, মাছি।

সৈকত আবার হাত তুলল— উদ্ভিদ জগৎ অর্থাৎ প্লান্টি-দের মধ্যে প্রাণীদের মতো এরকম ভাগ করা হয়?

স্যার বললেন — হয় না আবার! তোমাদের কিছু গাছের নাম দেওয়া হলো। এদের সঙ্গে তোমাদের অনেকেরই হয়তো পরিচয় আছে। এরা কেউ কেউ খুব লম্বা প্রকৃতির হয়, মোটা গুঁড়ি আছে, আবার কেউ কেউ খুব লম্বা হয় না। কিন্তু অনেক ডালপালা নিয়ে ঝোপের আকার নেয়। আর একধরনের যারা ছোটো, ছোটো। ডালপালাও বেশি নেই। তবে এদের মধ্যে কেউ কেউ লতিয়ে চলে বা কোনো কিছুকে ধরে পেঁচিয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়। দেখো তো এদের এইভাবে সাজাতে পারো কিনা।

যারা ছোটো ছোটো, ডালপালা প্রায় নেই। কখনো-সখনো লতিয়ে বা পেঁচিয়ে চলে। এরা ছোটো গাছ। ইংরেজিতে এদের বলে হার্বস (Herbs)। আর বাংলায় বলে **বীরুৎ**।

যারা খুব বেশি লম্বা হয় না, তবে অনেক ডালপালা আছে। ঝোপের মতো দেখতে লাগে। এরা মাঝারি জাতীয়। ইংরেজিতে এদের বলে শ্রাবস (Shrubs)। আর বাংলায় বলে **গুল্ম**।

যারা লম্বা, যাদের মোটা কাঠের গুঁড়ি ও অনেক ডালপালা আছে। এরা হলো বড়ো গাছ বা **বৃক্ষ**। ইংরেজিতে ট্রি (Tree)।

তাহলে গাছেদের আকার আমরা তাদের নীচের মতো করে ভাগ করতে পারি। নীচে দেখো জোড়ায় জোড়ায় গাছেদের নাম দেওয়া আছে। ঝটপট এদের মধ্যে মিল আর অমিল কোথায় লিখে ফেলো তো।

গাছের নাম	গাছের ছবি	গাছ দুটোর মধ্যে মিল কোথায়	গাছ দুটোর মধ্যে অমিল কোথায়
1. আলু ও কুমড়ো		দুজনেই ছোটো বীরুৎ জাতীয়	
2. আমগাছ ও জবাগাছ			
3. কাঁঠালগাছ ও কলাগাছ			
4. ধানগাছ ও খেজুরগাছ			ধান গাছের কাণ্ড নরম ও খেজুর গাছের কাণ্ড শক্ত
5. উচ্ছেগাছ ও বেগুনগাছ			

দিদিমণি ক্লাসে ঢুকে রোলকল শুরু করলেন আর তখনি ফার্স্ট বেঞ্চে বসা অপর্ণার দিকে চোখ পড়ল। কী ব্যাপার তোমার কপাল ফুলল কী করে?

অপর্ণা বলল — কলতলায় পা পিছলে পড়ে গেছি।

— পড়ে গেলে কী করে?

কলতলাটা পিছল হয়েছিল। পরিষ্কার করা হয়নি বেশ কিছু দিন। আচ্ছা দিদি পিছল জায়গাটা কেমন সবজেটে, মা বলল ওগুলো শ্যাওলা পড়েছে। ওগুলো কি কোনো গাছ?

— হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন তোমার মা। এগুলো শ্যাওলাই। এরাও একধরনের গাছ। এরা সবুজ। তাই অন্য গাছেদের মতো নিজেদের খাবার নিজেদের দেহেই বানিয়ে ফেলে। তবে এদের দেহে কোনো মূল, কাণ্ড বা পাতা নেই। এদের কোনো ফুলও হয় না।
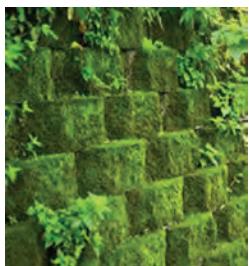
রাবেয়া উশখুশ করছিল দিদিকে কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য।

রাবেয়া কিছু বলবে? দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন।

রাবেয়া বলল— আমাদের পুকুরে সেদিন বাবা জাল ফেলেছিলেন। দেখি জালের গায়ে সবুজ রঙের সিল্কের সুতোর মতো লেগে আছে। ওগুলো কি কোনো শ্যাওলা?

—হ্যাঁ। তুমি ঠিকই দেখেছ। ওগুলোও একধরনের শ্যাওলা। ওদের গায়ে পিছল ভাবটা থাকে। খুব চকচক করে। ওগুলোকে জলের রেশম বা water silk বলে।

দিদিমণি বললেন- বেশিরভাগ শ্যাওলারাই থলথলে, শরীর হড়হড়ে, মূল কাণ্ড, পাতা বলতে কিছুই নেই, এদের সবাইকে থ্যালোফাইটা বা শ্যাওলা গোষ্ঠীর মধ্যে রাখা হয়।

তোমাদের বাড়ির বা স্কুলের পাঁচিলের গায়ে বর্ষাকালে কেমন সবুজ নরম উলের চাদরের মতন একটা আস্তরণ পড়ে। দেখেছ নিশ্চয়ই। এই বর্ষাকালে বা শরৎকালেই রাস্তার ইটের ফাঁকে ফাঁকে বা মাটির ওপর স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় পয়সা বা চাকতির মতো গোল হয়ে একধরনের সবজেটে গাছ লেপটে থাকে। পাশের ছবিদুটো দেখো।

এদের কোনো ফুল, ফল হয় না। এরা সব **মস** জাতীয় গাছ। একসঙ্গে এদের ব্রায়োফাইট বলে। পাশের মসের ছবিটাতে দেখো ওপরের দিকে একটা তিরের মতো— তার ঠিক মাথায় একটা টুপির মতো বা তোমাদের জ্বর হলে ডাক্তারবাবু যে ক্যাপসুল খেতে দেন সেই ক্যাপসুলের মতো দেখতে অনেকটা। এই ক্যাপসুলের মধ্যেই খুব ছোটো ছোটো, একেবারে গুঁড়ি গুঁড়ি রেণু থাকে। ক্যাপসুলটা শুকিয়ে গেলে রেণুগুলো মাটিতে ভিজে জায়গায় পড়ে আবার নতুন মস হয়ে যায়।

পাশের ছবিটা ভালো করে দেখো তো। এরা পুকুরের ধারে জল-কাদার জায়গায় হয়। কখনও বা জলের ওপরেও খানিকটা ভেসে থাকে। পাতাগুলো সুন্দর সাজানো থাকে। কচিপাতা যখন বের হয় কেমন কুকুরের লেজের মতো গুটিয়ে থাকে। এটা শুশনিশাক। তোমরা বাড়িতে এই শাকটা খেয়ে থাকবে নিশ্চয়ই। এদের কোনো ফুল হয় না, ফলও হয় না। তাই শ্যাওলা ও মসদের মতো এদেরও অপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। গাছটার গোড়ায় কতকগুলো শক্ত থলির মতো

আছে। তার মধ্যে ছোটো ছোটো রেণু থাকে। সেগুলো মাটিতে পড়ে গাছ হয়। এরা একধরনের ফার্ন । তোমরা ঢেঁকিশাক বা আরো কিছু ফার্ন যদি দেখো তাহলে দেখবে এদের পাতার নীচে বাদামি বা কালো রংয়ের ফুটকি ফুটকি আছে। কখনও বা পাতার ধারটা নীচের দিকে মুড়ে গিয়ে বাদামি বা কালো রেখা হয়ে গেছে। পাতার এই ফুটকি ফুটকি বা রেখার মধ্যেই রেণুগুলো আছে। এরা সব ফার্ন জাতীয় গাছ বা টেরিডোফাইটা।

পাশের পাইনগাছের ছবিটা দেখো। অনেকটা ঝাউগাছের মতো দেখতে। ঠান্ডা পাহাড়ি জায়গায় হয়। সরু সরু সুচের মতো পাতা। ফল নেই। বীজগুলো একসঙ্গে গোল করে সাজানো। দেখলে মনে হয় যেন কাঠ দিয়ে তৈরি কোনো ফুল। কুমড়ো, আম এদের যেমন ফলের মধ্যে বীজ থাকে পাইনের কিন্তু এরকম ফল নেই। বীজগুলোই কেবল দেখা যায়। তাই এদের **ব্যক্তবীজী** বলে। ইংরেজীতে বলে Gymnosperm।
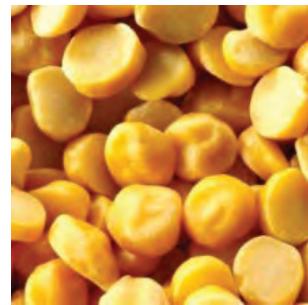
কিন্তু আমাদের চেনা বেশিরভাগ গাছই তাদের বীজ ফলের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। তাই তারা **গুপ্তবীজী**। ইংরেজিতে বলে Angiosperm। যেমন — আম, জাম, কাঁঠাল, কুমড়ো, ধান, গম ইত্যাদি।

ছোলা আর ধান এগুলো সব বীজ। ছোলা আর ধানের খোসা ছাড়িয়ে দেখো তো নীচের ছবির মতো দেখতে পাচ্ছ কিনা।

ছোলা বীজে দুটো গোল, অনেকটা চাকতির মতো (যেগুলো আমরা খাই) অংশ আছে। আর ধানে কিন্তু এরকম একটাই লম্বাটে ধরনের অংশ আছে। এগুলোই বীজের সঙ্গে লেগে থাকা পাতা বা বীজপত্র। ইংরেজিতে বলে Cotyledon । যেসব গাছে একটা বীজপত্র থাকে সেগুলো একবীজপত্রী (Monocotyledon) । আর যাদের দুটো বীজপত্র থাকে তারা দ্বিবীজপত্রী (Dicotyledon)।

নীচের সারণিতে লেখা বীজ সংগ্রহ করে দেখো তো কারা একবীজপত্রী আর কারা দ্বিবীজপত্রী।

বীজের নাম	কটা বীজপত্র আছে	একবীজপত্রী না দ্বিবীজপত্রী
ছোলা	2	দ্বিবীজপত্রী
গম		
মুগডাল		
মুসুরডাল		
ধান		
এলাচ		
সুপুরি		
চিনেবাদাম		
খেজুর		
কুমড়ো		
ভুট্টা		

ওপরের ছবিদুটো ভালো করে দেখো তো। (একটা আমপাতা আর একটা কলাপাতা নিয়েও দেখতে পারো)

পাতা দুটোর ওপরের অংশটা কেমন? ....।

মাঝখানে কটা শিরা আছে? ....।

মাঝখানের শিরার দু-পাশ থেকে যে শিরাগুলো বেরিয়েছে সেগুলো কি নিজেদের মধ্যে আবার মিশে গিয়ে জালের আকারে আছে? নাকি কারোর সঙ্গে না মিশে সমান্তরালভাবে ভাবে আছে।

জেনে রাখা ভালো
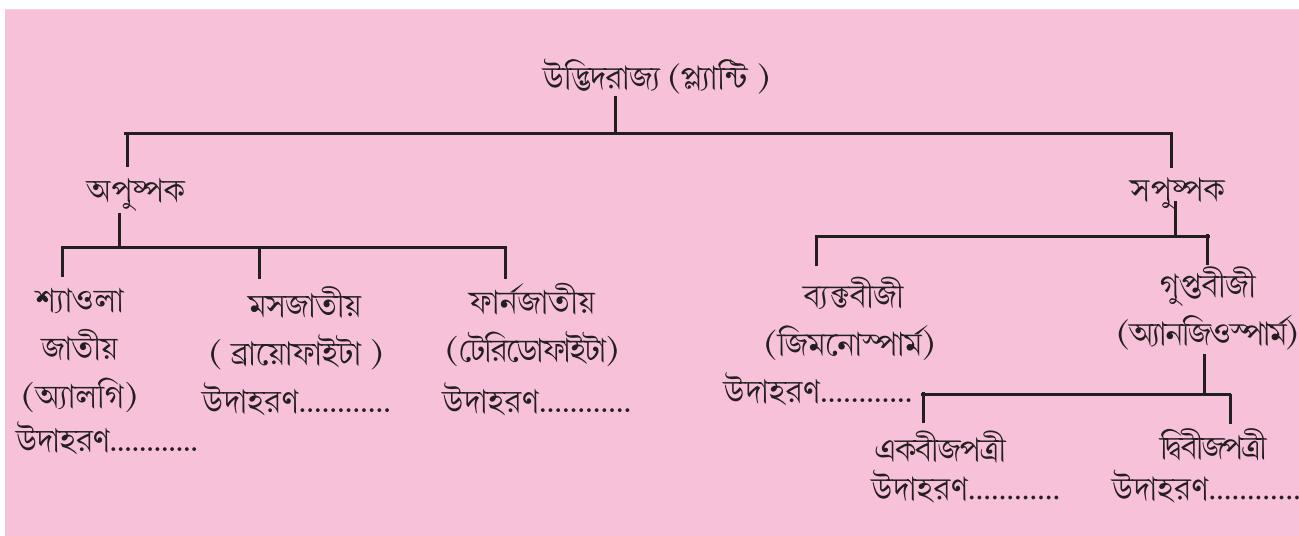
দ্বিবীজপত্রী গাছেদের পাতার মাঝ বরাবর শিরার দু-পাশের শিরাগুলো মিশে জালের মতো তৈরি করে।
একবীজপত্রী গাছেদের পাতার মাঝ বরাবর শিরার দু-পাশের শিরাগুলো না মিশে সমান্তরালভাবে থাকে।

নীচের গাছগুলোর পাতা লক্ষ করে তালিকাটি পূরণ করে ফেলো তো।

গাছের নাম	শিরাগুলো কেমন	একবীজপত্রী না দ্বিবীজপত্রী
কাঁঠালগাছ	জালের মতো	দ্বিবীজপত্রী
গমগাছ		
হলুদগাছ		
জবাগাছ		
ধানগাছ		
কচুরিপানা		
তুলসীগাছ		
লেবুগাছ		
কচুগাছ		
অশ্বত্থগাছ		

তাহলে এবার দেখো তো নীচের উদ্ভিদ রাজ্যের ছকটা বুঝতে পারো কিনা। উদাহরণগুলো তোমরা নিজেরা লিখে ফেলো।
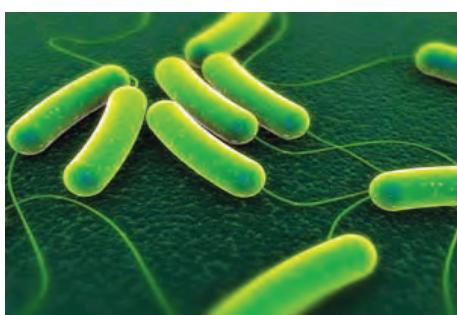
বন্ধনীর ভেতর থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

1. ছোলা হলো একটি .... (সপুষ্পক/অপুষ্পক) উদ্ভিদ।
2. ধানের খোসাটি ছাড়ালে .... (1টি/2টি) বীজপত্র দেখা যায়।
3. মটরের খোসাটি ছাড়ালে .... (1টি/2টি) বীজপত্র দেখা যায়।
4. পাতায় জালের মতো শিরা হলে সেটি ....। (একবীজপত্রী/দ্বিবীজপত্রী)
5. পাতায় মাঝশিরার দু-দিকে সমান্তরালভাবে শিরা থাকলে সেটি ....। (একবীজপত্রী/দ্বিবীজপত্রী)
6. কলাগাছ একটি .... (একবীজপত্রী/ দ্বিবীজপত্রী) উদ্ভিদ।
7. অশ্বত্থগাছ একটি .... (একবীজপত্রী/দ্বিবীজপত্রী) উদ্ভিদ।
8. বীজ ফলের মধ্যে থাকলে সেটি .... (ব্যক্তবীজী/গুপ্তবীজী) উদ্ভিদ।
9. বীজ যদি ফলের মধ্যে না থাকে তখন সেটি (ব্যক্তবীজী/গুপ্তবীজী) উদ্ভিদ।
10. আম একটি .... (ব্যক্তবীজী/ গুপ্তবীজী) উদ্ভিদ।
11. পাইন একটি .... (ব্যক্তবীজী/ গুপ্তবীজী) উদ্ভিদ।
12. (মস/ফার্ন)-দের পাতা কচি অবস্থায় কুকুরের লেজের মতো গুটিয়ে থাকে।
13. .... দের (শ্যাওলা/মস/ফার্ন) দেহে মূল, কাণ্ড, পাতা থাকে না।
14. স্পাইরোগাইরা বা জলরেশম একটি .... (শ্যাওলা/মস/ফার্ন)।
15. ঢেঁকিশাক একটি .... (শ্যাওলা /মস/ফার্ন)।

আমরা জীবজগতের মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীরাজ্য সম্বন্ধে জানলাম। কিন্তু উদ্ভিদ আর প্রাণী ছাড়া আরও কিছু জীব আছে যারা না প্রাণী না উদ্ভিদ। যেমন ধরো তোমাদের বাড়িতে যে দই পাতা হয়, মা-ঠাকুমারা দুধে সাজা দিয়ে দেন। আর দুধ বেশ কিছু সময় বাদে দই হয়ে যায়। এই দইয়ের সাজাতে ব্যাকটেরিয়া বলে যে জীব থাকে, তাদের আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। তারাই দুধকে দই বানিয়ে দেয়।

আবার তোমরা যে টাইফয়েড বা কলেরা রোগের কথা শুনেছ সেইসব রোগের কারণও এই ব্যাকটেরিয়া। সব ধরনের ব্যাকটেরিয়াকে একটি রাজ্যে রাখা হয়। সব ব্যাকটেরিয়ার এই রাজ্যের নাম হলো মোনেরা।

টাইফয়েড রোগের ব্যাকটেরিয়া
(অনেক গুণ বড়ো করে দেখানো)
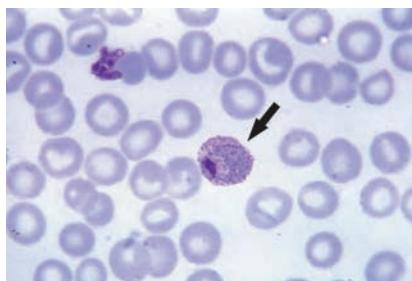
কলেরা রোগের ব্যাকটেরিয়া
(অনেক গুণ বড়ো করে দেখানো)

আচ্ছা তোমাদের স্কুল বাড়িটায় অনেকগুলো ঘর আছে তো? ছোটো বড়ো অনেক ঘর নিয়েই স্কুল বাড়িটা তৈরি। ঠিক তেমনি আমাদের যে শরীর বা আমাদের চারপাশে যেসব গাছপালা, পশুপাখি দেখি তাদের দেহগুলো ঠিক বাড়ির মতো। অনেক ছোটো ছোটো ঘর বা কুঠুরি নিয়েই আমাদের সবার শরীর তৈরি। তবে সে কুঠুরিগুলো খালি চোখে আমরা দেখতে পাই না। এই কুঠুরিগুলোকে বলা হয় কোশ। অধিকাংশ কোশের মধ্যে একটা গোল মতো বস্তু থাকে যেটাকে আমরা নিউক্লিয়াস বলি।

তবে আমরা যে মোনেরা রাজ্যের ব্যাকটেরিয়ার কথা বলছিলাম তাদের দেহ কিন্তু একটা কোশ দিয়েই তৈরি আর সেই কোশে কিন্তু কোনো নিউক্লিয়াস নেই।

আচ্ছা তোমরা ম্যালেরিয়া রোগের নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। আমাশয় হলে পেটের গোলমাল হয়। আর এইসব ঘটায় একধরনের জীব যাদের শরীরটাও ব্যাকটেরিয়ার মতো একটাই কোশ দিয়ে তৈরি। তবে মজার ব্যাপার হলো এদের কোশের মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে। এইসব নিউক্লিয়াস থাকা একটা কোশের জীবদের যে রাজ্যের মধ্যে রাখা হয় সেটা হলো প্রোটিস্টা।

ম্যালেরিয়া রোগ ঘটায় যে জীব
(অনেক গুণ বড়ো করে দেখানো)

আমাশয় রোগ ঘটায় যে জীব
(অনেক গুণ বড়ো করে দেখানো)

নীচের ছবি দুটো দেখো। দুটো ছবিই অনেকগুণ বড় করে দেখানো। প্রথমটা হলো ইউগ্লিনা ও দ্বিতীয়টা প্যারামেসিয়াম। এরাও প্রোটিস্টা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।
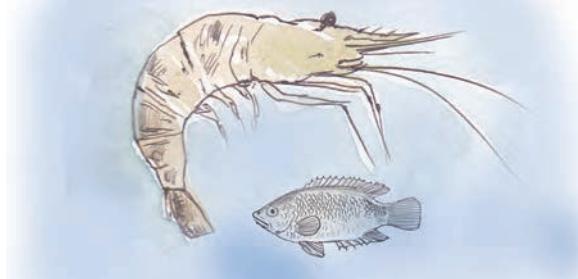
বর্ষাকালে তোমাদের বাড়ির আশেপাশে ব্যাঙের ছাতা তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। অনেকসময় খড়ের গাদায়ও হয়। এদের মাশরুমও বলে। অনেক মাশরুম খাওয়া হয়, আবার অনেক জাতের মাশরুম খাওয়া হয় না কারণ তারা বিষাক্ত। পাঁউরুটি বেশ কয়েকদিন রেখে দিলে কালো-সবুজ ছাতা পড়ে যায়, নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ। লেবু পচে গেলে তার গায়েও এরকম নীলচে-সাদা ছাতা পড়ে। এগুলো সবই ছত্রাক। অনেক সময় আমাদের কারো কারো গায়ের চামড়ায় যে দাদ হয়, প্রচুর চুলকায় বা মাথায় খুসকি হয় সেগুলো সবই নানা ধরনের ছত্রাক।

তবে এই ছত্রাকরা গাছেদের মতো সবুজ নয়। এরা নিজেদের দেহে খাবার তৈরি করতে পারে না। সমস্ত ছত্রাকদের একটা রাজ্যে রাখা হয়। তার নাম ফানজাই ।

তোমার দেখা যে-কোনো একটি পুকুরে,বনে,বাড়ির আশেপাশে, তীরবর্তী সমুদ্রে, অ্যাকোয়ারিয়ামে কিংবা ঘাসজমিতে বিভিন্ন মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের নামের তালিকা তৈরি করো।

অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
1. চিংড়ি	1. মাছ
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
1. প্রজাপতি	1. হরিণ
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
1. কেঁচো	1. কুনোব্যাং
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

অমেরুদন্ডী	মেরুদন্ডী
1. জেলিফিশ	1. হাঙর
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
1. শামুক	1. গোল্ডফিশ
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
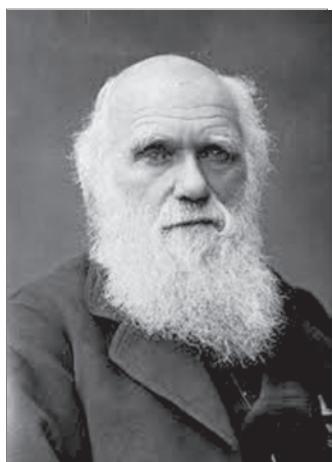
অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
1. পিঁপড়ে	1. সাপ
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

11 কতকগুলি বিশেষ প্রাণীর বাসস্থান ও আচার-আচরণ

আচরণ বিজ্ঞান আর আচরণ বিজ্ঞানী

সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসেছ। পড়ার ফাঁকে হঠাৎ নজর চলে গেল ঘরের দেয়ালের টিকটিকিটার দিকে। আলোর কাছাকাছি সে ঘাপটি মেরে বসে আছে। আলোর আকর্ষণে এসে কোনো পোকা যদি তার মুখের সামনে পড়ে যায়। তাহলে দেখবে কেমন কপাৎ করে তাকে ধরে গিলে ফেলেছে। কখনও আবার, কোনো ফড়িং বা পোকা একটু দূরে কোথাও বসেছে, টিকটিকিটা কেমন পা টিপে টিপে অতি সাবধানে একটু একটু করে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘপাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরে ফেলেছে।

কিংবা, তুমি হয়তো ছুটির দিনের দুপুরবেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছ। হঠাৎ খোলা জানালা দিয়ে চোখে পড়ল সামনের গাছটার ডালে বাসা তৈরি করেছে দুই কাক। একটা কাক বাসার মধ্যে বসে আছে— সেটা হয়তো মা-কাক, ডিমে তা দিচ্ছে। অন্য কাকটা বাবা-কাক যে মাঝে মাঝে খাবার নিয়ে আসছে। মা-কাকটাকে খাইয়ে দিচ্ছে। একবার দেখলে মা-কাকটা বাসা ছেড়ে উঠে এল। ওমা! তুমি দেখলে ডিম না, দুটো বাচ্চা রয়েছে বাসাতে। গায়ে পালক নেই তাদের, বড়ো হাঁ করে দুজনে খুব চ্যাঁ চ্যাঁ করতে থাকল। মুখের ভিতরটা একদম লাল। বাবা-কাক এবারে খাবার ঢেলে দিতে দুজনের মুখের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে দিল।

চার্লস ডারুইন

এরকম তো অনেক কিছুই তোমরা দেখো তোমাদের চারপাশে, তোমাদের ভালোই লাগে নিশ্চয়। কিন্তু, তোমরা কি জানো— জীবজন্তু, পোকামাকড়ের আচার-আচরণ বিজ্ঞানীরা খুঁটিয়ে দেখেন গবেষণা করবার জন্য। এই ধরনের গবেষণাকে বলা হয় আচরণ বিজ্ঞান। ইংরাজিতে Behavioural Science।

জঁ আঁরি ফ্যাবা

মানুষ তো আদিম কাল থেকেই জীবজন্তুর আচার-আচরণ দেখে এবং সেই নিয়ে ভাবে। নইলে তারা কীভাবে বনের পশুকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করেছিল, কোন মাছকে কীভাবে ধরা যাবে তার উপায় বের করেছিল! কিন্তু আধুনিককালে যাঁরা জীবজন্তু পোকামাকড়দের আচরণ খুঁটিয়ে দেখেছেন তাঁদের মধ্যে আগে দুজনের নাম করতে হবে। এরা হলেন— চার্লস ডারুইন আর জঁ আঁরি ফ্যাবা। ডারুইন ইংল্যান্ডের আর ফ্যাবা হলেন ফ্রান্সের মানুষ। ডারুইন ছোটোবেলা থেকেই পোকামাকড়, পাখি এদের আচার-আচরণ দেখেন। পরে বড়ো হয়ে তিনি জাহাজে করে ঘোরার সময় অন্য নানা জায়গার জীবদের আচার-আচরণ দেখেন। সেইসব নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করে উনি একটা বই লেখেন। সেই বইয়ে ব্যাখ্যা করেন জীবরা কীভাবে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে এবং একধরনের প্রজাতি থেকে কিভাবে নতুন ধরনের প্রজাতি সৃষ্টি হয়। তাঁর এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করে আধুনিক জীব বিজ্ঞানের পড়াশোনা ও গবেষণা হয়।

ফ্যাবা ছিলেন গরিব ঘরের সন্তান। খুব কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে উনি স্কুল শিক্ষক হন। তাঁর নেশা ছিল বাড়ির বাগানে ও তার আশেপাশে নিয়মিত দেখতে পাওয়া পোকামাকড়দের আচার-আচরণ খুব মন দিয়ে দেখা এবং সে সম্বন্ধে সুন্দর করে লেখা। পোকামাকড়দের নিয়ে তাঁর লেখাগুলো এত ভালো আর এত বড়ো যে তাকে পোকামাকড়দের মহাকাব্য বলা হয়। পোকামাকড়দের নিয়ে ফ্যাবা-র অনেক সুন্দর লেখা আছে। তার মধ্যে একটা বিখ্যাত লেখা হলো একধরনের শুঁয়োপোকাদের সারিবদ্ধভাবে চলবার একগুঁয়ে স্বভাব নিয়ে। এই শুঁয়োপোকাদের একজনের ঠিক পিছনে আর একজন একইভাবে চলে। একদম সামনে যে থাকে সে যে দিকেই যাক, সেই দিকেই শুঁয়োপোকাদের লাইন যাবে। ঠিক যেন রেলগাড়ি। ফ্যাবা এদের এই একগুঁয়েমি কতটা তা দেখবার জন্য একবার একটা পরীক্ষা করলেন। শুঁয়োপোকাদের লাইনটাকে কাঠি দিয়ে তুলে একটা গোল টবের কানায় বসিয়ে দিলেন। ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা টবের কানা ধরে চক্রাকারে ঘুরতে থাকল। ফ্যাবা দেখেছিলেন ক্লান্তিতে যতক্ষণ না পর্যন্ত খসে পড়ে যাচ্ছে ততক্ষণ শুঁয়োপোকারা ঘুরতেই থাকে। তাদের শরীরের ভিতর থেকে স্নায়ুতন্ত্রে যেন নির্দেশ যাচ্ছে - সামনে চলো, অন্য কোনো দিকে তাকিও না, সরো না।

কনরাড লোরেঞ্জ

বিজ্ঞানী ডারুইন আর ফ্যাবা-র এই আধুনিক আচরণ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উত্তরসূরি বলে ধরা হয় তিনজন বিজ্ঞানীকে। এঁরা হলেন- নিকো টিনবারজেন, কনরাড লোরেঞ্জ আর কার্ল ফন ফ্রিশ। টিনবারজেনের অনেক বিখ্যাত গবেষণার মধ্যে বিখ্যাত আবিষ্কার হলো- পাখিদের বোকামি। হেরিং গাল নামের পাখিরা মাটিতে ডিম পাড়ে ও তা দেয়। পরীক্ষা করার জন্য তাদের বাসার পাশে আসল ডিমের থেকে অনেক বড়ো, বেশি চকচকে ডিম রেখে দিলে, মা বা বাবা পাখি তাড়াতাড়ি আসল ডিম ছেড়ে সেই নকল ডিমে তা দিতে চেষ্টা করে। লোরেঞ্জ দেখেছিলেন- হাঁস ডিম ফুটে বেরোবার সময় যাকে সামনে দেখে তাকেই মা বলে ভেবে পুরো ছেলেবেলাটা তার পিছন পিছন ঘুরে কাটায়। এমনকি ডিম ফুটে বেরোনোর সময় যদি মা-এর হলুদ ঠোঁটের মতো দেখতে একটা রং করা কাঠের টুকরোও বাচ্চাদের দেখানো হয়, তবে তারা ওই কাঠের টুকরোটা দেখলেই মা ভেবে প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে ছুটে যায়।

কার্ল ফন ফ্রিশ

বিজ্ঞানী ফন ফ্রিশ আবিষ্কার করেছিলেন মৌমাছির নাচের ভাষা। কোনো জায়গায় ভালো মিষ্টি রস ভরা ফুল দেখে শ্রমিক মৌমাছি মৌচাকে ফিরে আসে বাকি সঙ্গী শ্রমিকদের খবর দেওয়ার জন্য যাতে ওই মিষ্টি রস মধু তৈরির জন্য সবাই মিলে নিয়ে আসতে পারে। যে মৌমাছিটি খবর এনেছে সে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিতে চাকের উপর নেচে সঙ্গীদের বুঝিয়ে দেয় কোনদিকে কতদূরে সেই রসভরা ফুলেরা আছে। টিনবারজেন, লোরেঞ্জ আর ফন ফ্রিশ-কে তাঁদের গবেষণার কৃতিত্বের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

জেন গুডাল

জেন গুডাল প্রথম মহিলা যিনি বন্য শিম্পাঞ্জিদের আচার-আচরণ কীরকম তা জানবার
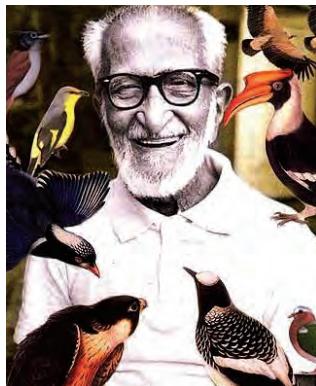
সালিম আলি

জন্য আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে একা দিনের পর দিন কাটিয়েছেন। তিনিই প্রথম আমাদের জানান যে শিম্পাঞ্জিরা কাঠি দিয়ে উইপোকা খুঁচিয়ে বার করে খায়- ঠিক মানুষরা যেমন ছিপ দিয়ে মাছ ধরে সেরকম। শিম্পাঞ্জিরা বন্য অবস্থাতেও যে প্রায় মানুষের মতো আচার-আচরণ করে তা জানা গেছে তাঁর গবেষণা থেকে।

অনেক ভারতীয় বিজ্ঞানীও জীবজন্তুর আচার-আচরণ নিয়ে গবেষণা করে বিখ্যাত হয়েছেন। সালিম আলি ভারতীয় পাখিদের আচার-আচরণ নিয়ে লিখেছেন। রাঘবেন্দ্র গাডাগকার গবেষণা করেন বোলতাদের সমাজ ব্যবস্থা কীরকম সেবিষয়ে। এম.কে চন্দ্রশেখর বাদুড় এবং অন্যান্য অনেক প্রাণীর শরীর কীরকম সময় মেনে কাজ করে গবেষণা করে তা জেনেছেন। রতনলাল ব্রহ্মচারীর গবেষণায় জানা গেছে বাঘরা কীভাবে মূত্রের মধ্যে গন্ধ (ফেরোমোন) মিশিয়ে নিজের এলাকা চিহ্নিত করে তার কথা।

সবশেষে তোমাদের জানাব গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কথা। সারা জীবন উনি বাংলার পোকামাকড়দের আচার-আচরণ খুঁটিয়ে দেখেছেন, তাদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তারপর সেইসব গবেষণার কথা বাংলা ভাষায় সহজ-সুন্দরভাবে সবার জন্য লিখেছেন। তাঁর 'বাংলার কীটপতঙ্গ' বইটি সবথেকে বিখ্যাত। তোমরা সুযোগ পেলেই সেটি পড়ে ফেলবে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য-র লেখা থেকে কিছু আকর্ষণীয় অংশ

এক দিন সকাল নটা, সাড়ে-নটার সময় পল্লিঅঞ্চলের রাস্তা দিয়ে চলেছি। সকাল থেকেই শিশিরবিন্দুর মতো গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। কিছু দূর অগ্রসর হতেই রাস্তার এক পাশে পরিষ্কার স্থানেই একটা সুপারি গাছের উপর নজর পড়ল। কতকগুলি নালসো (লাল পিঁপড়ে) সার বেঁধে গাছটার উপরের দিক থেকে নীচের দিকে ছুটে আসছিল। অবশ্য দু-চারটা পিঁপড়ে উপরের দিকেও উঠছিল। নালসোরা সাধারণত গাছের উপরেই চলাফেরা করে, নেহাত প্রয়োজন না হলে মাটিতে বা নীচু জায়গায় বড়ো একটা নামতে চায় না। তাছাড়া সুপারি গাছের উপর এদের সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় না। কাজেই ব্যাপারটা কী দেখবার জন্যে কৌতূহল হলো। কাছে গিয়ে দেখলাম — গাছটার এক পাশে মাটি থেকে প্রায় এক ফুট উপরে, কালো রঙের একদল ক্ষুদে পিঁপড়ে ছোট্ট একটা গুবরে পোকাকে আক্রমণ করে নীচে নামবার জন্যে তার ঠ্যাং ধরে প্রাণপণে টানাটানি করছে। উপর দিক থেকে আবার পাঁচ-ছয়টা নালসো তার সামনে দুটা পা ও ঘাড় ধরে এমনভাবে টান হয়ে রয়েছে যেন আর একটু হলেই ছিঁড়ে যাবে। গুবরে পোকাটার কাছ থেকে নীচের দিকে গাছটার গোড়ার উপর এখানে-সেখানে আরও অসংখ্য ক্ষুদে পিঁপড়ে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছিল। সুপারি গাছটা প্রকাণ্ড একটা আমগাছের উপর হেলে পড়েছিল। আম গাছটাতেই ছিল নালসোদের বাসা। সেখান থেকে সুপারি গাছটার উপর দিয়ে দু-একটা টহলদার পিঁপড়ে নীচের অবস্থা তদারক করতে আসায় হয়তো শিকারটা নজরে পড়ে যায়। তার ফলেই খুব সম্ভব উভয় দলে শক্তি পরীক্ষা চলেছে। লক্ষণ দেখে বোধ হলো — ক্ষুদেরাই প্রথম শিকারটাকে আক্রমণ করে তাকে অনেকটা কাবু করে এনেছিল — তারপর এসেছে এই নালসোর দল। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই যে এই কাণ্ডটা চলছিল, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু উভয় পক্ষের টাগ-অব-ওয়ারটা চলছে অল্পক্ষণ ধরে। এদিকে-ওদিকে দু-চারটা খাড়া পাহারা মোতায়েন করেছে মাত্র। এই পাহারাদার সান্ত্রীরা শুঁড় উঁচিয়ে, মুখ হাঁ করে, নিশ্চলভাবে অপর পক্ষের গতিবিধির দিকে লক্ষ রেখেছে। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে বাকি রইল না যে, শীঘ্রই একটা গুরুতর 'পরিস্থিতি'-র উদ্ভব হবে।
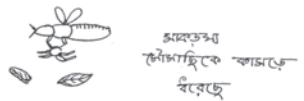
জন্ম ঃ ১-৮-১৮৯৫ মৃত্যু ঃ ৮-৪-১৯৮১

তোমরাও এবার থেকে ডারুইন, ফ্যাবা, গোপালচন্দ্রের মতো চারপাশে পোকামাকড় পশু-পাখিদের আচার-আচরণ দেখতে শুরু করো। শুধু দেখলে হবে না, যা দেখলে তা একটা খাতায় তারিখ এবং সময় দিয়ে লিখে রাখো। কে জানে যে তুমিও একদিন ওঁদের মতো বড়ো আচরণ বিজ্ঞানী হয়ে উঠবে না! অবশ্য তার জন্য আরো পড়াশোনা ও গবেষণাও করতে হবে।

বাচ্চার হাতের লেখায় Naturalist diary -র উদাহরণ

২০শে মে, 2013

আজ সকালে বারান্দার পাশে বকুলগাছটার ফুলে মৌমাছিরা বসছিলো, উড়ে উড়ে নাচছিলো, আর ফুলের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে ফুলের রস খাচ্ছিলো দেখছি, হঠাৎ একটা ফুল জ্যান্ত হয়ে একটা মৌমাছিকে জাপটে ধরলো, আমি অবাক! ভালো করে দেখি ——— ফুলটা ফুল না একটা মাকড়সা, একদম বকুলফুলের মতো দেখতে মাকড়সাটা, বকুলফুল সেজে চুপটি মেরে বসেছিলো, মৌমাছিটা বুঝতে পারেনি, সেই ফুল ভেবে রস খেতে গেছে অমনি মাকড়সাটা ওকে বাগে পেয়ে কামড়ে ধরেছে।

মাকড়সা মৌমাছিকে কামড়ে ধরেছে

কতকগুলি বিশেষ প্রাণীর আচার-আচরণ

পিঁপড়ে

সবাই জানে পিঁপড়েরা সমাজবদ্ধ জীব। পৃথিবীতে অনেক জাতের পিঁপড়ের খবর জানা আছে। কিন্তু আরও অনেক জাতের পিঁপড়ে আছে, যাদের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা একটা হিসাব করেছেন -এ পৃথিবীতে সব জাতের সবকটা পিঁপড়েকে যদি একটা দাঁড়িপাল্লার একটা দিকে বসিয়ে আর একদিকে যদি বাকি সব জাতের প্রাণীদের সব্বাইকে বসানো যায়, পিঁপড়ের পাল্লা নেমে যাবে অনেকখানি। মানে, সংখ্যায় পিঁপড়েরা পৃথিবীর অন্য যে-কোনো প্রাণীর থেকে এত বেশি। বিজ্ঞানীরা বলেন পিঁপড়ে সমাজে এক রানি, রানির অসংখ্য দাসী, সৈন্য আর শ্রমিক নিয়ে এককেটা পরিবার। দাসী, সৈন্য আর শ্রমিক সবাই কিন্তু আসলে রানির মেয়ে। পিঁপড়ের পরিবারে পুরুষের সংখ্যা বা গুরুত্ব খুবই কম। পিঁপড়েরা সব আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করতে পারে।

বিজ্ঞানীরা বলেন পিঁপড়ের দলে লাল পিঁপড়ের দল হলো মনিব আর কালো পিঁপড়ের দল হলো তাদের সেবক। লাল পিঁপড়েরা যুদ্ধে পটু। তুলনায় কালো পিঁপড়েরা অনেক বেশি বুদ্ধিমান। কঠোর পরিশ্রমীও বটে। লাল পিঁপড়েদের মধ্যে মাঝে মাঝেই খাবার মজুত করার চাপ বেড়ে যায়। তখন কালো পিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধায়। কালো পিঁপড়েরা হেরে গিয়ে মারা যায়। তখন লাল পিঁপড়েরা ওদের বাসায় গিয়ে ডিম মুখে করে নিজের বাসায় নিয়ে আসে। বড়ো হয়ে এরা লাল পিঁপড়েদের জন্য সারাজীবন বেগার খেটে মরে। শীতের দিনে পিঁপড়েদের খুব একটা বেশি দেখা যায় না। তখন তারা মাটির নীচে ঘর বেঁধে থাকে আর মজুত খাদ্য খায়। গরম দেশে যাযাবর পিঁপড়ে দেখা যায়। এরা অনবরত বাসা বদল করে। চাষি পিঁপড়েরা মাটিতে গর্ত করে বাসা বানায়, এদের বাসায় কাটা পাতা পচে গেলে তার ওপর একধরনের সাদা রঙের ছত্রাক জন্মায়। এই ছত্রাক চাষি পিঁপড়েদের খুব প্রিয় খাবার। কীভাবে বছরের পর বছর ধরে এই ছত্রাকের চাষ করে তা এক অবাক করা বিষয়। একধরনের পিঁপড়ে আছে যাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের পেটটাকে পরিবারের খাবার জমিয়ে রাখার জালা হিসাবে ব্যবহার করে।

করে দেখো

স্থান : বাড়ি এবং চারপাশের পরিবেশ

উপকরণ : নোটবই, পেন, লেন্স

সময়কাল : প্রধানত গরমকাল

তোমরা 10 - 20 জনের একটা দল বাড়ি ও আশেপাশের পিঁপড়েদের ভালোভাবে লক্ষ করো এবং নীচের সারণিটি পূর্ণ করো:

ক্রমিক নং	পিঁপড়ের নাম জানা না থাকলে তোমরাই চরিত্র অনুযায়ী ওদের একটা নাম দাও	রং			আকার			বাসস্থান
		লাল মাথার রং	বাদামি মাঝের অংশের রং	কালো পেটের রং	ছোটো (1-4 mm)	মাঝারি (5-10 mm)	বড়ো (10 mm বা তার বেশি)	

করে দেখো

স্থান: বাগান

উপকরণ : একটি মার্কার পেন, নোটবুক, পেন, ঘড়ি।

পিঁপড়ে যাওয়ার পথে 10 সেমি অন্তর কয়েকটা দাগ টানো। লক্ষ করো এই দূরত্ব পার হতে কোনো পিঁপড়ের কত সময় লাগছে?
.... ।

আরও লক্ষ করো।

- পিঁপড়ের বাসাটা কোথায় — মাটির তলায়, দেয়ালের ফাঁকে। .... ।
- বাসা থেকে বেরোনোর পর কীভাবে কোনদিকে পিঁপড়েরা রওনা দেয়? .... ।
- বাসা থেকে বেরিয়ে দলবেঁধে না একা একা যাচ্ছে? .... ।
- বাসা থেকে বেরিয়ে সবসময় কি একই দিকে বা একই গন্তব্যস্থলে যায়? .... ।

করে দেখো

স্থান : বাড়ি ও চারপাশ

উপকরণ : নানা ধরনের খাদ্য, লেন্স, নোটবই, পেন।

তোমরা 10 - 20 জনের একটা দল মাটিতে কিছু পরিমাণ আমিষ বা নিরামিষ; তরল বা কঠিন খাদ্য রেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। তারপর দেখো কোন ধরনের পিঁপড়েরা এল। তারপর নীচে লেখো :

ক্রমিক নং	খাদ্যের ধরন	কোন জাতের পিঁপড়ে এল	তারা কীভাবে খাবার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে
1.			
2.			
3.			

করে দেখো

যখন একদল পিঁপড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় তখন তাদের লক্ষ করে নীচের সারণিটি পূরণ করো। এর থেকে তুমি কী সিদ্ধান্তে আসতে পারো?

পিঁপড়ের দলের প্রকার ভেদ	আনুমানিক সংখ্যা
1. বড়ো চোয়ালওয়ালা পিঁপড়ে এবং গাঢ় বর্ণের	
2. অপেক্ষাকৃত বড়ো আকারের, পেট বেশ লম্বা এবং ডানাযুক্ত	
3. ডিম বহনকারী পিঁপড়ে	
4. খাদ্য বহনকারী পিঁপড়ে	

করে দেখো

তোমার বাড়ির উঠোনে বা বাগানে এক টুকরো গুড়/বাতাসা/নকুলদানা/ চিনির দ্রবণ কিংবা পোকামাকড় রেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। ভালো করে দেখো। তারপর নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খাতায় লিখে ফেলো।

- খাবার রাখার কতক্ষণ পরে প্রথম পিঁপড়ে খাবারের আশেপাশে দেখা যায়? ....
- খাবার দেখে সে কি প্রথমেই খেতে শুরু করে না অন্য কিছু করে? ....
- কখন এবং কীভাবে অন্য পিঁপড়েরা খাদ্যের দিকে আনাগোনা শুরু করে? ....
- কোন ধরনের পিঁপড়েরা খাবার নিয়ে যেতে আসে? ....
- একা না দলবেঁধে তারা বাসায় খাবার নিয়ে যায়? ....
- বিভিন্ন খাদ্য খেতে কী ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পিঁপড়েরা আসে? ....
- খাদ্য নিয়ে তারা কী নিজেদের মধ্যে লড়াই করে না ভাগাভাগি করে খায়/ নিয়ে যায়?

উইপোকা

উইপোকারাও পিঁপড়ে বা মৌমাছিদের মতো সমাজবদ্ধ জীব। কিন্তু তাদের মধ্যে রানির ছেলে ও মেয়েরা দুজনেই দাস-দাসী, সৈন্য বা শ্রমিক হতে পারে। উইরানি বেজায় মোটা হয়। সারা শরীরে ডিম-বোঝাই পেট ছাড়া আর কিছু প্রায় চোখেই পড়ে না। উইদের গায়ে অন্য পোকাদের মতো কোনো শক্ত খোলা থাকে না। ফলে, বেশিক্ষণ রোদ তাপ লাগলে শরীর থেকে জল বেরিয়ে শরীর শুকিয়ে যায়। উইরা তাই গর্তের বাইরে এসে ঘুরে বেড়ায় না। কোথাও যেতে গেলে সুড়ঙ্গ বানাতে বানাতে তার মধ্যে দিয়ে এগোয়। দেয়ালে বা জানালা-দরজার ফ্রেমে উইদের সুড়ঙ্গ দেখোনি? আবার, উইদের গর্তে তাপমাত্রা আর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যাতে খুব বেড়ে-কমে না যায় তার ব্যবস্থাও থাকে। তবে সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হলো উইদের খাবার। গাছের কাঠ অংশ, যাতে, সেলুলোজ নামের শর্করা বস্তু থাকে - তা' কোনো প্রাণীই হজম করতে পারে না, কিন্তু উইরা পারে। তার কারণ, উইদের পেটে একরকম জীবাণু থাকে যারা সেলুলোজ হজম করতে পারে। তা যদি না হতো, পৃথিবীর যত গাছ মরে কাঠ হয়ে গেছে, তার বেশিরভাগটাই চিরদিন কাঠ হয়ে থেকে যেত।

করে দেখো

স্থান: উন্মুক্ত ফাঁকাস্থান/বাড়ির চারপাশ/বিদ্যালয়ের আশেপাশে।

উপকরণ: কাগজ, কলম, পেনসিল, লেন্স, ডিশ, সাধারণ পিন।

তোমরা 5-20 জনের একটা দল উই-এর ঢিপি বা সুড়ঙ্গ খুঁজে পেলে ভালো করে লক্ষ করো। তারপর নীচের টেবিলটি পূরণ করার চেষ্টা করো।

কোথায় উইদের দেখা পেলে?

সেই স্থানের বৈশিষ্ট্য				কেমন মাটি	
মাটির ওপরে	মাটির নীচে	পাথরের গায়ে	গাছের গুঁড়িতে	শুকনো	ভিজে

আচ্ছা উই-এর ঢিপি বা সুড়ঙ্গ দেখে কি এর সঙ্গে আশেপাশের গাছপালার কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হচ্ছে? (সঠিক উত্তরটির পাশে '√' দাও)

কোনটাতে উই বেশি ধরে খুঁজে দেখো।

(a) বড়ো গাছের বাকল/ সবুজ অংশ/ চারাগাছ /গাছের ডাল

(b) মৃত গাছের গুঁড়ি/ কাঠের দরজা-জানালা (পালিশ করা)

করে দেখো

স্থান : গ্রামের আশেপাশে।

উপকরণ : খাতা, কলম, পেনসিল, মাপার ফিতে

তোমরা কোনো উই-এর ঢিপি দেখতে পেলে শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্যে নীচের তথ্যগুলি সংগ্রহ করার চেষ্টা করো।

1. ঢিপির উচ্চতা কত? ....
2. ঢিপির মাটির বৈশিষ্ট্য কী ? ....
3. ঢিপির বাইরের দিক কীরকম? ....
4. ঢিপিকে ঘিরে থাকা চারপাশের পরিবেশ কীরকম? ....
5. ঢিপির ছবি আঁকো।

করে দেখো

স্থান : বাড়ি, খেলার মাঠ বা চারপাশের বাগান।

উপকরণ : খাতা, কলম, পেনসিল, একটা লাঠি, লম্বা একটা শক্ত কাঠি, স্বচ্ছ বোতল।

তোমরা 5-20 জনের একটা দল উই -এর ঢিপি খুঁজে পেলে কাছাকাছি যাও। তোমাদের কেউ কেউ ঢিপির একটা বা দুটো চুড়ো লাঠি দিয়ে ভেঙে ফেলো। তারপর এক বা দু-দিন ধরে নীচের সূত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

1. ঢিপি ভাঙার পর তুমি কী দেখলে? ....
2. ঢিপির ক্ষত মেরামত করার জন্য উইপোকারা কোথা থেকে মাটি আনে? ....
3. ঢিপির মধ্যে যদি উইপোকা না থাকে তবে ঢিপির ভিতরের গঠনের ছবি আঁকতে চেষ্টা করো।
4. ঘড়ি ধরে দেখো সারাতে কতক্ষণ লাগে , কীভাবে সারাচ্ছে, যারা সারাচ্ছে তাদের গঠন লক্ষ করো।
5. সরু কাঠি ভাঙা গর্ত দিয়ে ঢুকিয়ে 1-2 মিনিট ধরে রাখো, তারপর আস্তে আস্তে বের করে আনো। দেখো উইপোকারা কী করছে কাঠিটাতে?
6. কাঠির গা কামড়ে ধরে থাকা উইপোকাদের একটি স্বচ্ছ বোতলে সংগ্রহ করে নীচের বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করো।

(a) আকার:

(b) রং :

(c) চোয়াল :

(d) উদর :

মৌমাছি

মৌমাছি কিন্তু মাছি নয়। তাদের মাছির মতো দুটো ডানা না, চারটে ডানা। তারা বরং বোলতা আর পিঁপড়েদের আত্মীয়। ফুলের মধ্যে যে মিষ্টি রস হয় তাকে বলে নেকটার। সেই রস তারা নিজেদের বাসায় আনে। একে মৌ বা মধু বানিয়ে জমিয়ে রাখে বলে এদের নাম মৌমাছি। এদের বাসাকে বলে মৌচাক। মৌমাছিরা একা একা থাকে না, একসঙ্গে সবাই মিলে একেকটা পরিবার হিসাবে থাকে। তাই এরা সামাজিক জীব। একেকটা মৌচাকে একেকটা পরিবার। রানি মৌমাছি আর শ্রমিক মৌমাছি - যারা রানির মেয়ে কিন্তু সংসারের সব কাজ করে - তারাই পরিবারের সব। মৌমাছি সমাজে পুরুষদের সংখ্যা ও ভূমিকা খুবই কম। মেয়ে শ্রমিকরা রানির যত্ন নেয়। নিজেদের গা থেকে ঘামের মতো বেরোনো মোম জমিয়ে মৌচাক তৈরি করে। ঘুরে ঘুরে ফুল থেকে নেকটার বা মিষ্টি রস এনে মৌচাকের কুঠুরিতে মধু করে জমিয়ে রাখে। সবাইকে খাওয়ায়। মৌচাকের কুঠুরি গরম হয়ে গেলে পাখা নাচিয়ে বাতাস করে ঠান্ডা রাখে। মৌচাক মোম দিয়ে তৈরি। খুব বৃষ্টি হলে মোম ভিজে যায়। এতে অনেক বাচ্চা মৌমাছি মারা যায়। তখন শ্রমিক মৌমাছিরা জোরে জোরে বাতাস করলে ভেজা বাসা শুকিয়ে যায়। আবার, শত্রু এলে ঝাঁপিয়ে পড়ে হুল ফুটিয়ে দেয়। সেই হুল একদিকে খাঁজ কাটা অন্যদিকে নিজেদের পেটের সঙ্গে এমনভাবে আটকানো যে শত্রুর শরীরে হুল ঢুকলে সেটা তাদের পেট থেকে ছিঁড়ে আটকে থাকে। ফলে শ্রমিক মৌমাছি মারা পড়ে। মধু যেমন খেতে ভালো, তেমনি উপকারী। মানুষ তো বটেই, অন্যান্য অনেক প্রাণীই মৌচাক ভেঙে মধু খেতে ওস্তাদ। মানুষ অবশ্য অনেক কাল আগে থেকেই মৌমাছিকে পোষ মানিয়ে বাক্সে মৌচাক তৈরি করাতে শিখেছে যাতে ইচ্ছেমতো মধু পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে বড়োজোর দশ-এগারো জাতের মৌমাছির খবর জানা আছে। আমাদের দেশে আছে তিন-চার জাতের। মজার কথা, আমেরিকা মহাদেশে কোনো মৌমাছি ছিল না। ইউরোপের মানুষ প্রথম সেখানে মৌমাছিদের নিয়ে গিয়েছিল।

করে দেখো

স্থান : বাগানের আশেপাশে।

সময় : ফুল ফোটার ঋতুতে।

উপকরণ : খাতা, পেনসিল।

তোমরা নিজেদের মধ্যে (1-20 জনের দল) বিভিন্ন সময়ে দেখা মৌচাক নিয়ে আলোচনা শুরু করো। তারপর বিভিন্ন মৌচাক দেখতে পেলে পর্যবেক্ষণ করে নীচের তথ্যসারণিটি পূরণ করো।

ক্রমিক সংখ্যা	মৌচাকের ধরন	মৌচাকের আকার		কোনখানে মৌচাকটি দেখা গেছে
		লম্বা	চওড়া	
1.				
2.				
3.				
4.				

5. করে দেখো

এবার কোনো মৌচাক দেখতে পেলে তোমরা নীচের তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করো।

- বছরের কোন কোন সময় এই ধরনের মৌচাক দেখা যায়? ....
- আশেপাশে লক্ষ করে লেখো কোন কোন গাছে ফুল ফুটে আছে? ....।
- এর মধ্যে কোন কোন গাছের ফুল থেকে মৌমাছি নেকটার বা মিষ্টি রস সংগ্রহ করছে? ....।

করে দেখো

যদি তুমি কোনো পরিত্যক্ত মৌচাক খুঁজে পাও তবে তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করো, সংগ্রহ করার পর নীচের তথ্যগুলি জানার চেষ্টা করো। (শব্দভাণ্ডার- মোম, ভেতরের কুঠুরিতে, ডানদিকের কুঠুরিতে, বাম ও নীচের দিকের কুঠুরিতে, ষড়ভুজাকৃতি, মাঝের কুঠুরিতে)

- কোন কোন উপাদান দিয়ে মৌচাকটি তৈরি হয়েছে? ....
- মৌচাকের কুঠুরিগুলির আকৃতি কেমন? ....
- মৌচাকের কোথায় মধু সঞ্চয় করা হতো? ....
- মৌচাকের কোথায় ডিমগুলি সঞ্চয় করা হতো? ....
- রানি মৌমাছির থাকার কুঠুরি কোনদিকে থাকে? ....
- পুরুষ ও শ্রমিক মৌমাছির লার্ভারা মৌচাকের কোথায় থাকে? ....
- মৌচাকের একটি ছবি এঁকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো।

করে দেখো

স্থান : বাড়ির আশেপাশের বাগান।

উপকরণ : হলুদ ও লাল কাগজ, চিনির দ্রবণ, জল, দুটো ডিশ।

- তোমরা 1-5 জনের এক একটি দল তোমার অঞ্চলে কোনো সক্রিয় মৌচাক থাকলে চিহ্নিত করো।
- তারপর মৌচাক থেকে 40-50 ফুট দূরত্বে হলুদ কাগজের ওপর চিনির দ্রবণ ভরতি ডিশটা রাখো।

এবার লক্ষ করো।

- ক-বার মৌমাছিরা ওই চিনির দ্রবণ দেখতে এল? ....
- চিনির দ্রবণ খাওয়ার সময় তারা কী কী করল? ....
- হলুদ কাগজের রং বদলে লাল দিলে কী ঘটনা ঘটে? ....

শ্রমিক মৌমাছি যখন ফুলে রস খেতে আসে, সেসময় খেয়াল করে দেখো পিছনের পায়ে হলুদ-হলুদ গুঁড়ো লেগে আছে কিনা। মৌমাছিরা ফুলে ফুলে রস খাওয়ার জন্য যখন ঢোকে তখন এক গাছের ফুলের পরাগ একই জাতের অন্য গাছের ফুলে নিয়ে যায়। এজন্য ফুলে পরাগমিলন ঘটে এবং ফুল ফলে পরিণত হয়।

হাতি

পৃথিবীর স্থলভাগে যত প্রাণী ঘুরে বেড়ায় তাদের মধ্যে সবথেকে বড়ো আকারের হলো হাতি। ভারতবর্ষে যে হাতিরা থাকে তাদের একেকটার ওজন কম করে দু-হাজার কিলোগ্রাম, মাটি থেকে মাথা পর্যন্ত এগারো ফুট উঁচু হতে পারে । আফ্রিকার হাতিরা আরও উঁচু আরও ভারী। হাতির দেহে সবথেকে মজার অঙ্গ হলো তার শুঁড়। নাক আর উপরের ঠোঁট জোড়া লেগে লম্বা হয়ে শুঁড় তৈরি হয়েছে। তবে শুঁড় দেখতে মজার হলে কী হবে, ভীষণ কাজের। উপরে তুলে বাতাসে গন্ধ শোঁকা, গাছের ডাল মড়মড় করে ভাঙা, জল শুষে মুখে ঢালা, ঘাস ছিঁড়ে মাটি ঝেড়ে মুখে পোরা- কী না কাজে লাগে শুঁড়। এমনকি মাটিতে যদি ছোট্ট একটা ফল পড়ে থাকে সেটাও শুঁড়ের ডগা দিয়ে তুলতে অসুবিধা হয় না হাতিদের। হাতির অন্য আর একটা মজার অঙ্গ হলো- হাতির দাঁত । মুখের উপরের পাটির একজোড়া দাঁত বাড়তে বাড়তে লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসে। সেই দাঁত অনায়াসে ছয়-সাত ফুট লম্বা হতে পারে। তবে ভারতীয় মেয়ে হাতিদের দাঁত লম্বা হয় না।

হাতিরা দল বেঁধে থাকে। হাতির দল আসলে একেকটা পরিবার। হাতি এমনিতে খুব শান্ত স্বভাবের প্রাণী কিন্তু বাচ্চার কষ্ট একদম সহ্য করতে পারে না। মানুষের মা ও বাবা তাদের সন্তানকে সবসময় আগলে রাখেন। হাতিরাও তাদের সন্তানকে সবসময় চোখে চোখে রাখে। কখনই বিপদ হতে পারে এমন জায়গায় যায় না। পরিবারের প্রধান হলো মা বা দিদিমা, অন্য সদস্যরা হলো তাদের মেয়ে, নাতি আর নাতনিরা। বিপদে পড়লে কোনো হাতিরা শুঁড় উঁচু করে ডাকতে থাকে দলের হাতিরা তখন একত্র হয়ে বিপদের মোকাবিলা করে। তোমরা হয়তো শুনে থাকবে রেললাইন পেরানোর সময় কোনো হাতি হয়তো ট্রেনের ধাক্কা খেয়ে আহত হলো। দলের অন্য হাতিরা তাকে ঘিরে পাহারা দেয়। হাতিসমাজের নিয়ম খুব কড়া। পথ চলতে চলতে কোনো হাতির বাচ্চা দলছুট হলে হাতির দল তাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করে। কিন্তু যদি দেখে যে হারানো হাতি মানুষের কাছে আশ্রয় পেয়েছে তবে তাকে আর কোনোদিনই গ্রহণ করে না। ছেলে হাতিরা পুরোপুরি বড়ো হয়ে গেলে দল ছেড়ে একা একা ঘুরতে ভালোবাসে। তবে মাঝেমাঝে দলের সঙ্গেও থাকে। বিশাল শরীরের জন্য হাতির খাবারও লাগে অনেক। একেকটা হাতি দিনে দেড়শো কেজি পর্যন্ত ঘাস-গাছ-পাতা খেতে পারে। হাতি জঙ্গলে থাকতেই ভালোবাসে কিন্তু জঙ্গলে খাবার কম পড়ে গেলে হাতিরা খাবারের খোঁজে ফসলের ক্ষেতে গ্রামে ঢুকে পড়ে। সেসময় বাধা দিলে তারা ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলে, মানুষকে আঘাত করে। হাতি এত বিশাল, এত শক্তিশালী যে সে আঘাতে মানুষের বেঁচে থাকা মুশকিল। হাতির যাতায়াতের পথে মানুষ ঘরবাড়ি তৈরি করছে, রাস্তা, রেললাইন বসাচ্ছে। তাই হাতির সঙ্গে মানুষের সংঘাত বাড়ছে।

তোমার অঞ্চলে যদি হাতির আনাগোনা থাকে বা জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে তোমার সঙ্গে যদি মাহুতের পরিচয় হয় তবে হাতির আচরণ সংক্রান্ত নীচের তথ্যগুলি জানার চেষ্টা করো।

- হাতির মতো মানুষ যখন কোনো বিপদে পড়ে তখন অন্যদের কাছ থেকে কীভাবে সাহায্য চায়?
- হাতির মতো তোমার কোনো বন্ধুর বিপদে তুমি কী কী ভাবে সাহায্য করতে পারো?
- হাতি মায়েদের কাছে শিশুরা তাদের সমাজের নানা নিয়মকানুন শেখে। আমরা আমাদের মায়ের কাছ থেকে কী কী শিখি?

শিম্পাঞ্জি

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন- জীবজগতে শিম্পাঞ্জিদের সঙ্গে মানুষের সব থেকে বেশি মিল। অনেক অনেক কাল আগে শিম্পাঞ্জি ও মানুষের পূর্বপুরুষ ছিল একই ধরনের বাঁদর জাতীয় প্রাণী। তারা আর এখন পৃথিবীতে টিকে নেই। টিভিতে বা চিড়িয়াখানায় শিম্পাঞ্জিদের হাবভাব রকমসকম দেখলেই মনে হয় এক্কেবারে আমাদের মতো! এরা পাথর দিয়ে হাতুড়ির মতো আঘাত করে খোলা ভেঙে বাদাম খায়; উইপোকার ঢিবিতে কাঠি ঢুকিয়ে উই শিকার করে। প্রতি রাতে গাছের ডালে পাতার বাসা বানিয়ে ঘুমায়। আমাদের মধ্যে যারা কথা বলতে পারেন না তারা যেমন আকারে ইঙ্গিতে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে পারেন, পোষা শিম্পাঞ্জিদের শেখালে তারাও সেরকম পারে। এরা সহজেই মানুষের বন্ধু হয়।

আফ্রিকার গভীর জঙ্গল ছাড়া শিম্পাঞ্জিদের আর কোথাও প্রাকৃতিক পরিবেশে পাওয়া যায় না। সেখানেও তাদের সংখ্যা খুব কমে গেছে। চোরাশিকারির উপদ্রব আর শিম্পাঞ্জিদের বাসস্থানের জঙ্গল কমে যাওয়ায় শিম্পাঞ্জিদের সংখ্যা খুব কমে আসছে।

শিম্পাঞ্জিরা শাকপাতা-ফলমূলই বেশি খায়। কিন্তু মাঝে মাঝে উইপোকা বা ছোটোখাটো হরিণ শিকার করেও খেয়ে থাকে।

নীচের ছবিগুলোতে শিম্পাঞ্জিদের আচরণগুলো লক্ষ করো।

পরিযায়ী পাখি

যারা শীত পড়লে শীতের দেশ থেকে গরমের দেশে চলে আসে। শীত কাটলে আবার সেখানে ফিরে যায় তাদের বলে পরিযায়ী। অনেক পাখি আছে যারা শীতের সময় তিব্বত, ভুটান, লাদাখ- হিমালয়ের উঁচু পার্বত্য অঞ্চল, যেখানে খুব শীত পড়ে, বরফে ঢেকে যায়, খাবারদাবার মেলা মুশকিল-সেখান থেকে আমাদের সমতলের দেশে নেমে আসে। এখানে ওখানকার তুলনায় অনেক কম শীত আর খাবারদাবারও মেলে প্রচুর। ওখানে যখন শীত কাটে, বরফ গলে যেতে থাকে গাছপালায় পাতা-ফুল-ফল আসে আবার সেসময় ফিরে যায় তারা। এজন্য তাদের হয়তো হাজার কিলোমিটার উড়ে যেতে হয়। এমনও পাখি আছে যারা উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু অঞ্চলে অর্থাৎ পৃথিবীর এক শেষ প্রান্ত থেকে অন্য শেষ প্রান্তে উড়ে যায়। আমাদের এখানে শীতের সময়

আসে নানারকমের পরিযায়ী বুনো হাঁস। কলকাতার কাছে সাঁতরাগাছির ঝিলে, গ্রামবাংলার নানা বিল-জলায় শীতের সময় বুনো হাঁসদের দেখা যায়। লেজ নাচিয়ে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ানো খঞ্জনা, বা মাঠের কোনায় কুল বা অন্য গাছের নীচু ডালে শিকারের সন্ধানে চুপ করে বসে থাকা চোখে-কালো-দাগ খয়েরি রঙের কাজল-পাখি - এরাও কিন্তু পরিযায়ী হিমালয় থেকে আসা শীতের অতিথি। এত লম্বা যাত্রাপথ কোন কোন দিকচিহ্ন অনুসরণ করে এরা পাড়ি দেয় তা এক বিস্ময়ের কথা। আর এত পথ পাড়ি দিতে এত ছোটো দেহে প্রয়োজনীয় শক্তি কোথা থেকে পায় সেটাও বিজ্ঞানীদের কাছে গবেষণার বিষয়।

- তোমার এলাকায় কোন কোন পরিযায়ী পাখি আসে, তাদের দেখতে কেমন, কী খায়, বছরের কোন সময়ে দেখা যায়? ....।
- পশ্চিমবঙ্গের সমতলে হিমালয় থেকে যেসব পরিযায়ী হাঁস আসে তাদের নাম কী কী? এরা কোথা থেকে আসে? ....।
- আর্কটিক টার্ন নামক পরিযায়ী পাখি কোথা থেকে কোথায় যায়?.......................।
- কোথাকার পাখি কোথায় যাচ্ছে তা কীভাবে জানা যায়? ....।
- পরিযায়ী পাখিদের এই যাযাবর বৃত্তির কারণ কী? ....।

কাক

কাক মানুষের সবথেকে পরিচিত পাখিদের মধ্যে অন্যতম। সারা পৃথিবীতে চল্লিশটারও বেশি জাতের কাক আছে। আমাদের এখানে অবশ্য আমরা দুটো জাতকে খুব দেখি। পাতিকাক আর দাঁড়কাক। পাতিকাক-এর ডানা, লেজ, গলা, মাথা, ঠোঁট চকচকে কালো, কিন্তু ঘাড় আর পেট ছাই-ছাই ধূসর রং-এর। দাঁড়কাকের পুরো শরীর কুচকুচে কালো, চেহারাতেও পাতিকাকের থেকে বড়োসড়ো। কাক-রা সব কিছু খায়। আবর্জনা ঘেঁটে খাবার খায়। সুযোগ পেলে ইঁদুর, ছোটোপাখি এসবও শিকার করে। আবর্জনা ঘেঁটে খায় বলে আমাদের ঘেন্না লাগে বটে, কিন্তু কাকদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। পুরোনো দিনের গল্পকথায় তাদের বুদ্ধির অনেক কাহিনি আছে। বুদ্ধিতে শিম্পাঞ্জিরা নাকি মানুষের পরেই। এখন বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বলেছেন কাকরা প্রায় শিম্পাঞ্জিদের মতোই বুদ্ধিমান। কাকেরা খাবার লুকিয়ে রাখতে পারে। আবার মানুষের মতো কাকেদেরও সভা বসে। সেখানে শত শত কাক জড়ো হয়। তবে বাসা তৈরির বিষয়ে কাকদের সমস্যা আছে। প্রচণ্ড ঝড়ে বাসা ভেঙে প্রায় সময়ই বাচ্চা কাক মাটিতে পড়ে যায়। কাক-রা সামাজিকও। তোমার পাড়ার কাউকে কোনোদিন বিপদে পড়তে দেখেছ? বিপদে পড়লে কোনো মানুষ সাহায্যের জন্য প্রতিবেশীদের ডাকাডাকি করে। কেউ বিপদে পড়লে সব কাকরাও একসঙ্গে কেমন জড়ো হয়ে কা-কা করে ডাকতে থাকে দেখোনি? তখন সবাই ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসে।

- প্রতিদিন কাকদের দেখো। তাদের বুদ্ধি আর সামাজিকতার পরিচয় কী কী পাচ্ছ লিখে রাখো ....।
- একের বিপদে অন্য কাকেরা কীভাবে সাহায্য করে, তা দেখেছ কিনা আলোচনা করো।

মশা

তোমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় - কোন পোকাকে তোমাদের খুব অপছন্দ? তোমরা অনেকেই বলবে - মশা। মানুষকে কামড়ানো মশার স্বভাব। শুধু কামড়ানো? রক্ত চুষে নেবার জন্য কামড়ায়। যে জায়গায় হুল ফোটায় সেখানে ফুলে যায়, জ্বালা করে। তার ওপর, মশাদের শরীরে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, ফাইলেরিয়া - এরকম মারাত্মক সব রোগের জীবাণু থাকতে পারে, হুল ফোটাবার সময় সেই জীবাণু মানুষের শরীরে ঢুকে যেতে পারে।

কিউলেক্স

পুরুষ মশারা কিন্তু রক্ত খায় না। মেয়ে মশা রক্ত খায়- নইলে তারা ডিম পাড়তে পারে না। এমনিতে পুরুষ আর মেয়ে মশা - দুজনেই গাছের রস খেয়ে বেঁচে থাকে। রক্তপান করে স্ত্রী-মশারা স্রোত নেই এমন জলে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে লার্ভা (শূককীট) বেরোয়। লার্ভারা কিলবিল করে জলের খাবার খেয়ে খেয়ে বড়ো হয়, তারপর পিউপা (মূককীট) হয়ে যায়। পিউপা-রা কিছু খায় না, তারা কিছু দিন বাদেই খোলস ফেলে পুরোপুরি একটা মশা হয়ে জল থেকে বেরিয়ে উড়ে যায়।

ইডিস

অ্যানোফিলিস

নানা জাতের মশা থাকে আমাদের আশেপাশে। তাদের দেখতে যেমন আলাদা, স্বভাব-চরিত্রও নানাধরনের। ম্যালেরিয়ার জীবাণু যাদের শরীরে থাকে তারা হলো - অ্যানোফিলিস, এরা দেয়ালে বসলে মনে হয় সরু একটা কাঁটা যেন খাড়া হয়ে রয়েছে। এরা ওড়বার সময় আওয়াজ করে। এদের ডানায় কালো ছোপ থাকে। মেয়ে অ্যানোফিলিস ও ইডিসরা ছোটো জায়গায় জমা পরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে। ইডিসরা হলো খুব ছোটো মশা। এদের পেটে আর পায়ে সাদা-কালো ডোরা থাকে। এরা দিনের বেলায় কামড়ায়। এদের কামড়ের সঙ্গে ডেঙ্গির জীবাণু ঢুকে যেতে পারে। কিউলেক্স নামে আরেক ধরনের মশা আছে। এরা গভীর রাতে কামড়ায়। এদের ডানায় কোনো ছোপ থাকে না। এদের ওড়ার সময় কোনো শব্দ হয় না। তবে সব মশাই রোগজীবাণু বহন করে এমন নয়। তবু সাবধান থাকাই ভালো। মশারি টাঙিয়ে শুলে মশা কামড়াতে পারে না। জমা জল ছাড়া যেহেতু মশা ডিম পাড়তে পারে না, তাই জল কোথাও জমতে দেওয়া উচিত নয়।

টুকরো কথা

তোমরা 4-5 জনের একটা ছোটো দল তৈরি করো । তারপর দেখো তোমার বাড়ির আশেপাশে কোথাও ডাবের খোলা, প্লাস্টিকের কাপ, টব, ফেলে দেওয়া ছোটো বালতি বা মগে পরিষ্কার জল জমে আছে কিনা। থাকলে জমা জল ফেলে দাও। এভাবে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গির মতো রোগ থেকে তোমার অঞ্চলকে মুক্ত রাখতে সাহায্য করতে পারো।

মাছ

মাছ হলো পুরোপুরি জলের প্রাণী। মুখ দিয়ে জল গিলে ফুলকোর মধ্যে জল চালিয়ে কানকো দিয়ে বের করে দেয়। ফুলকোর সাহায্যে জল থেকে অক্সিজেন শুষে নেয় আর কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয়। কাজেই জলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে মাছদের কোনো অসুবিধা নেই। সমুদ্রের নোনাজল, সুন্দরবনের আধানোনতা আধামিঠে যাকে বলে খাঁড়ি জল, নদী-খাল-বিল-পুকুরের মিষ্টি জল,যে-কোনো জলেই হরেক জাতের মাছেরা থাকে। কেউ খায় জলের ছোটো ছোটো পোকামাকড়, শ্যাওলা, কেউ খায় জলার গাছের শাক-পাতা, কেউ বা পেটে পোরে ছোটো ছোটো মাছদের। মাছদের কানকোর পাশে থাকা পাখনা দুটো যেন নৌকার বৈঠা, জল ঠেলে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। লেজের পাখনা যেন নৌকার হাল—মাছ যে দিকে যেতে চায়, মাছকে সেদিকে নিয়ে যায়।

মাছেদের মাবাবারাও তাদের বাচ্চাদের জন্য খুব চিন্তা করে। শোল, গজাল, চিতল জাতীয় মাছেরা বাচ্চার যত্ন নেয় ডিম থেকে বড়ো হওয়া পর্যন্ত। বাবা-মা দুজনেই এই কাজ করে। মা যখন ওই বাসায় ডিম দিতে শুরু করে, বাবা মাছেরা তখন পাহারা দিতে বাইরে সারাক্ষণ বসে থাকে। শত্রুকে দেখলে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনোর পর বাবা-মা-র কাজ আরো বেড়ে যায়। তখন বাচ্চাদের ঘিরে রেখে পাহারা দেয়। তেলাপিয়া জলের নীচে নরম মাটিতে লম্বা করে অনেকগুলো খাঁজ কাটে। তারপর সেখানে বাসা বানায়। আর বাবা তেলাপিয়া ওপর থেকে পাহারা দেয়। মা তেলাপিয়ার মুখের ভেতরে থাকা থলির মধ্যে শিশুরা জন্ম নেয়। তারপর বেরিয়ে এসে জলে সাঁতার কাটে খাবার সংগ্রহ করে। কখনও ভয় পেলে আবার মায়ের মুখের থলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। এ যেন ক্যাঙারুর পেটে থাকা বাচ্চাদের নিরাপদ থলির মতো।

সাগরের জলে সী হর্স বলে একটা মাছ দেখা যায়। বাবা সী হর্সের লেজের কাছে একটা বিশেষ থলি থাকে। মা সী হর্স ওই থলির মধ্যে ডিম তুলে রাখে। বাবা দিনরাত ওই ডিমগুলোকে পাহারা দেয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনোর পরও বাবা থলির মধ্যে বাচ্চাগুলোকে রেখে বড়ো করে তোলে।

অ্যাকোয়ারিয়ামে অনেক ধরনের রঙিন মাছ থাকে। এদের একটা হলো প্যারাডাইস মাছ। বাবা প্যারাডাইস মুখের লালা বার করে বাতাসে বুদবুদ ছাড়ে। তা দিয়ে মা প্যারাডাইস মাছের ডিম পাড়ার বাসা তৈরি করে। বাবা মাছ ডিমগুলোকে পাহারা দেয়। শিশু মাছদেরও লালন পালন করে। মাছেদের জলে সবসময় বিপদের মধ্যে কাটাতে হয়। কখনও জলে অক্সিজেন কমে গেল। কখনও বা জল দ্রুত শুকিয়ে যেতে শুরু করল। আবার কখনও জলের মধ্যে নানা বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মিশে যায়। মাছরা বিপদে পড়লে গা থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ ছড়ায়। টের পেলে অন্যান্য মাছরা সতর্ক হয়ে যায়। আর বিপদ বুঝে জলের মধ্যে ছোটাছুটি করে।

বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত বত্রিশ হাজারেরও বেশি জাতের মাছের খোঁজ পেয়েছেন। আর কোনো মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে এত বেশি বৈচিত্র্য নেই। মাছ মানুষের প্রিয় খাদ্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মানুষ যে কটা জাতের মাছ খেতে শিখেছে তার সংখ্যা সামান্যই।

তোমরা 4-5 জনের এক একটা ছোটো দল বাজার থেকে জ্যান্ত মাছ সংগ্রহ করে অ্যাকোয়ারিয়াম, চৌবাচ্চা বা কোনো ছোটো জলাধারে রেখে মাছের নানা আচরণ দেখতে পারো।
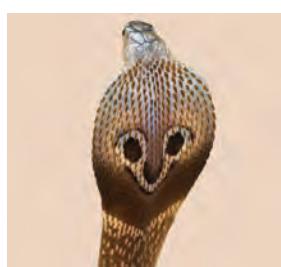
- একটা পুকুরে কিছু চালের কুঁড়ো, মুড়ি বা অন্য কিছু খাবার দাও। দেখো তো কোন কোন মাছ তা খেতে আসে।
- হঠাৎ শত্রুর মুখোমুখি হলে বিভিন্ন মাছ কী কী আচরণ করতে পারে? মাছেদের এরকম আচরণ কী মানুষের মধ্যে দেখা যায়?
- পুকুরে রুই, কাতলা, পুঁটি, খলসে, শোল এরকম কত মাছ থাকে। তারা কী মিলেমিশে থাকে না ঝগড়া করে? এ বিষয়ে তোমরা আলোচনা করে লিখে ফেলো।
- ডিম ফুটে বেরোনো শিশু শোলদের মা শোলমাছ কীভাবে রক্ষা করে?

সাপ

তোমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় - কোন পরিচিত প্রাণীকে তোমরা সবচাইতে ভয় পাও? তোমরা অনেকেই বলবে সাপ। এদের হাত বা পা নেই। কিন্তু এরা মাংসাশী, অন্য প্রাণীকে ধরে। ইঁদুর থেকে হরিণ সব প্রাণীকেই এরা গিলে খায়। ইঁদুর, ছুঁচোর মতো ফসলখেকো প্রাণীদের খেয়ে এরা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। ভয় পেয়ে সাপ মেরে ফেললে আমাদের ক্ষতি হয়। খুব বরফের দেশ ছাড়া প্রায় সর্বত্রই এদের দেখা মেলে। গাছের ডাল, মাটির তলা, কিংবা জলে বহু সাপেরই বাসস্থান। সাপের মাথার হাড় এমনভাবে সাজানো যে সাপ চোয়াল দুটোকে দু-পাশে ছড়িয়ে বিশাল হাঁ করতে পারে। তাই সাপ নিজের মুখের থেকেও বড়ো ইঁদুর বা পাখি শিকার করে গিলতে পারে। সাপের চামড়া আঁশ দিয়ে ঢাকা। ডাঙায় সাপ পেটের আঁশের সাহায্যে চলাফেরা করে। সাপ সারাজীবন নিয়মিতভাবে পুরোনো আঁশের খোলস পালটায়। সাপদের কান নেই, কিন্তু এদের ঘ্রাণশক্তি খুব ভালো।

এরা চেরা জিভ দিয়ে বাতাসে ভাসা গন্ধের অণু মুখের ভিতর নিয়ে গন্ধ টের পায়। এরা বুক দিয়ে মাটিতে হওয়া সামান্য কম্পনও টের পায়। কিছু সাপের মুখের ওপর তাপ মাপার যন্ত্র আছে। বেশিরভাগ সাপই ডিম পাড়ে। তবে চন্দ্রবোড়া, মেটুলির মতো কোনো কোনো সাপ সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে। বেশিরভাগ সাপই মানুষের জন্য বিষাক্ত নয়। মানুষের জন্য ভয়ংকর বিষাক্ত খুব কম প্রজাতির সাপই, যেমন- কালাচ বা ডোমনাচিতি, চন্দ্রবোড়া, কেউটে, গোখরো, শঙ্খচূড়, শাঁখামুটি। বিষাক্ত সাপরা বিষকে শিকার মারতে ও হজম করতে কাজে লাগায়। সবার বিষদাঁত একই মাপের হয় না। কোনো বিষ শিকারের স্নায়ুতন্ত্রে আঘাত করে আবার কোনোটা রক্তসংবহনতন্ত্রে। সাপ মানুষের সামনে পড়ে নিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে করলে প্রথমে ভয় দেখিয়ে সতর্ক করে। যেমন কেউ জোরে নিশ্বাস ছাড়ে, হিসহিস শব্দ করে বা কেউ বা ফণা তোলে বা লেজের প্রান্ত

নাড়ায়। তারপর নিজের বাঁচার রাস্তা না পেলে কামড়ায়। কিন্তু, সাপ খাদ্য ধরা ছাড়া বিষকে নষ্ট করতে চায় না। মানুষরা কিন্তু কোনো সাপের খাদ্য নয়।

বাঘ

বনে বেড়াতে যাওয়ার কথা উঠলে তোমাদের কোন প্রাণীকে সামনাসামনি দেখার সবথেকে ইচ্ছা জাগে? তোমাদের অনেকেই বলবে বাঘ। বনের রাজা নিজের থেকেও বড়ো প্রাণীদের অনায়াসে শিকার করে। এদের সাংঘাতিক জোরালো চোয়াল আর তাতে ধারালো বড়ো ক্যানাইন বা শ্বদন্ত দাঁত থাকে। বিড়ালের মতোই এদের চলাফেরার সময় সামান্য শব্দও হয় না। থাবার ধারালো নখ শিকারের আগে পর্যন্ত ভেতরে ঢোকানো থাকে। বাঘের সামনের পা খুব নমনীয়। ফলে ভিতরের দিকে পা ভাঁজ করতে পারে। এদের দর্শন ও শ্রবণশক্তি খুব প্রখর। যে-কোনো জন্তু বা মানুষের সামান্যতম চলাফেরাতেও এরা সজাগ হয়ে পড়ে। দিনের বেলায় মানুষ আর বাঘের দৃষ্টিশক্তি প্রায় সমান। কিন্তু রাতের বেলা? বাঘের চোখের রেটিনায় ট্যাপেটাম লুসিডাম বলে একটা বস্তু থাকে, তাই বাঘরা অল্প

আলোতেও মানুষের থেকে ছয়গুণ ভালো দেখতে পায়। বাঘেরা বাতাসে গন্ধ শুঁকে শিকারের পিছনে ধাওয়া করে না। কিন্তু একেকটা বাঘ নিজের এলাকা চিহ্নিত করতে মূত্রনালী থেকে এক ধরনের তরল মাটিতে ও গাছে ছিটিয়ে দেয়। আবার গাছের কাণ্ডে আঁচড় কেটেও নিজের অঞ্চলের সীমানা ঠিক করে। গন্ধ শুঁকেই বাঘ বাঘিনি পরস্পরকে খুঁজে নেয়। গৃহপালিত বিড়াল তার মলকে মাটিতে চাপা দেয়, বাঘ কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানে তার মলত্যাগ করে নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়। প্রাপ্তবয়স্ক বাঘ সাধারণত একা থাকে। একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল নিয়ে থাকে। অন্য বাঘের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কখনো-কখনো অন্য বাঘ ঢুকে পড়লে দুজনের জোর লড়াই হতে পারে।

হরিণ আর শুয়োরের মাংস এদের খুব প্রিয় খাদ্য। সুন্দরবনের বাঘ, কাঁকড়া, মাছ, গোসাপ পর্যন্ত খায়। সুন্দরবনের বাঘের গায়ের চামড়া হালকা হলুদ থেকে লালচে হলুদ রং-এর হয়। আর এর গায়ে ডোরাকাটা কালো দাগ থাকে আঙুলের ছাপের মতো। ত্বকের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য এদের বাদাবনের হেঁতাল গাছে লুকিয়ে থাকতে সুবিধা হয়। সাধারণত সূর্যাস্ত থেকে গোধূলির মধ্যেকার সময়ে বাঘ শিকার করে। বাঘ তার শিকারকে চিহ্নিত করে, কাছাকছি যতটা যাওয়া সম্ভব যেতে চেষ্টা করে। তারপর তাকে তাড়া করে বা পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁধ বা গলা কামড়ে ধরে। শিকার মারা গেলে নিরাপদ স্থানে টেনে নিয়ে যায় এবং খায়। শিকার বড়ো হলে কয়েকদিন ধরে খায়। শিকারের সব চেষ্টা যে সফল হয় তা নয়। তাই সবদিন খাওয়া জোটে না।

বাঘ একই সঙ্গে হিংস্র ও বুদ্ধিমান। পেটে খিদে থাকুক বা না থাকুক শিকার পেলে কখনোই তারা হাতছাড়া করতে চায় না। নিঃশব্দে শিকারের পিছু নেয়। উদবৃত্ত খাবার গর্ত করে নিজেদের আস্তানার ঝোপের ধারে জমিয়ে রাখে। বাঘ শুধুমাত্র নিঃশব্দে

লাফিয়ে শিকার ধরতে পারে তা নয়, প্রয়োজনে গাছে চড়তে, জলে সাঁতার দিয়ে শিকার করে।

বাঘ ও বাঘিনি দুজনেই হিংস্র। কিন্তু সন্তান পালনের ব্যাপারে বাঘিনির স্নেহ-শাসন লক্ষ করার মতো। বাচ্চা দেওয়ার আগে ভালোভাবে পরিষ্কার করা জায়গা তৈরি করে। বাচ্চা দেওয়ার পর তাদের কাছে সমস্ত দিন ঠায় বসে থাকে। অনেক সময় পাহারা দিতে গিয়ে নিজের খাওয়া পর্যন্ত হয় না। কিন্তু ওর বাসা যদি কেউ চিনে ফেলে তবে বাঘিনি সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাসা খুঁজে চলে যায়। বাসা বদলের সময় যদি কোনো প্রাণী বা মানুষ তার মুখোমুখি হয় তবে, তার মৃত্যু নিশ্চিত। মধু সংগ্রহ বা কাঠ কাটতে গিয়ে যে সকল মানুষ মারা যান তাদের অধিকাংশের পিছনে থাকে বাঘিনির এই বাসা বদলের ঘটনা।

বাচ্চারা একটু বড়ো হলে বাঘিনি তাদের শিকার শেখাতে নিয়ে যায়। প্রথম প্রথম শিকার করা প্রাণীর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে দেয়। দাঁত বসিয়ে কীভাবে মাংস ছিঁড়ে খেতে হয় তাও শেখায়। তারপর একসময় একটা আধমরা প্রাণীকে বাচ্চাদের কাছে নিয়ে এসে তার থেকে দাঁত দিয়ে মাংস ছিঁড়তে শেখায়। বাচ্চাদের সাঁতার কাটতেও শেখায় বাঘিনিরা। মা বাঘের কাছ থেকে এভাবে ছয়-সাত মাস শিক্ষা পেয়ে শিশু পূর্ণাঙ্গ বাঘে পরিণত হয়। বয়স হলে বা আহত হলে বাঘ মনুষ্য বসতি এলাকায় সহজ শিকারের জন্য চলে আসতে পারে। সুন্দরবন অঞ্চলের অনেক জঙ্গল ঘেঁষা গ্রামে এটা একটা বড়ো সমস্যা। যে বনে বাঘ থাকে, সেখানে মানুষ ঢুকতে ভয় পায়। মানুষের হাত থেকে জঙ্গল রক্ষা করার জন্য বনে বাঘের সংখ্যা বাড়ানো খুব জরুরি। জঙ্গল ধ্বংস হওয়া ও চোরা শিকারের জন্য বাঘের সংখ্যা খুব কমে গেছে। বাঘের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ভারতের বিভিন্ন জঙ্গলকে ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

বাঘের ছবিগুলিতে কী কী আচরণ দেখা যাচ্ছে তা নীচে লেখো।

1. ....। 2. ....। 3. ....।

তিমি

তিমি সামুদ্রিক প্রাণী। অনেকে বলে মাছ। আসলে তিমি স্তন্যপায়ী প্রাণী। তিমির গায়ে কেবল মাথার সামনে নাকের জায়গায় অংশে কিছু লোম থাকে। এদের চামড়ার নীচে চর্বির একটা পুরু স্তর থাকে - যার নাম ব্লাবার (Blubber)। এই চর্বির স্তর দু-ভাবে তিমিদের সাহায্য করে — প্রয়োজনে চলাফেরার শক্তি জোগান দেওয়া আর দেহের তাপ বজায় রাখা। তিমিদের পূর্বপুরুষদেরও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতোই দুটো হাত আর পা ছিল। জলের জীবনে মানিয়ে নেওয়ার জন্য ওদের হাতদুটো পরিণত হয়েছে সাঁতার কাটার অঙ্গ ফ্লিপারে। আর পিছনের পা-দুটো লোপ পেয়েছে। জলে বাস করলেও তিমির কিন্তু মাছের মতো ফুলকা থাকে না, থাকে ফুসফুস। কেবল জলের উপরে ভেসে উঠলে তবেই তিমি শ্বাস নেয়। তিমিদের একইসঙ্গে অনেকটা বাতাস নিতে আর ছাড়তে হয়। জলে ডুব দিয়ে ভেসে উঠে তিমি খুব জোরে নিশ্বাস ছাড়ে তার মাথার

উপরে থাকা ব্লোহোল (Blowhole) বা নাকের ফুটো দিয়ে। এত জোরে তারা এই বাতাস ছাড়ে যে ওই নিশ্বাসবায়ু প্রায় 10,20, বা 40 ফুট সোজা ওপরে উঠে যায়। এই নিশ্বাস বায়ু সাধারণত আশপাশের বাতাসের চেয়ে গরম হয়। তাই বাতাসে থাকা জলকণাগুলো বাষ্পে পরিণত হয়। আর তিমি জলে ভেসে উঠলেই অনেক দূর থেকে এই সাদা স্তম্ভের মতো দেখা যায়, ঠিক যেন একটা ফোয়ারা। আমরা তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও শ্বাস-প্রশ্বাস চালাই। কিন্তু জলের মধ্যে তিমির সে সুবিধে নেই। তাই তিমিরা কখনোই পুরোপুরি ঘুমোয় না। তিমিরা যখন বিশ্রাম নেয়, তখন তাদের মস্তিষ্কের একটা অংশ জেগে থাকে অন্য অংশটা ঘুমোয়।

তিমি অনেক প্রজাতির হয়। নীল তিমি (Blue whale) কেবল পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো তিমিই নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো প্রাণী। একটা উদাহরণ দিলে তোমরা বুঝতে পারবে। একটা নীল তিমির ওজন তিরিশটা হাতির ওজন বা 2000 মানুষের ওজনের প্রায় সমান। জন্মের সময় এরা লম্বায় 7 মিটার হয় আর ওজনে আড়াই হাজার কেজি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা পূর্ণবয়স্ক নীল তিমি প্রায় 30 মিটার লম্বা আর ওজনে প্রায় দেড় লক্ষ কেজি হয়। দিনে এরা প্রায় তিন থেকে চার হাজার কেজি ছোটো চিংড়ি জাতীয় প্রাণী ক্রিল খায়।

তিমিরা শব্দের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখে। যেমন হাম্পব্যাক তিমি সুরেলা গানের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখে। আর নীল তিমির আওয়াজ একটা জেট ইঞ্জিনের আওয়াজের চেয়েও জোরালো।

নীচের তিমিগুলোকে চিনে রাখো।

হাম্পব্যাক তিমি

স্পার্ম তিমি

নীল তিমি

12

বর্জ্য পদার্থ

বর্জ্য পদার্থের উৎস ও প্রকৃতি

বাড়ির নানা আবর্জনা ও তার ব্যবহার
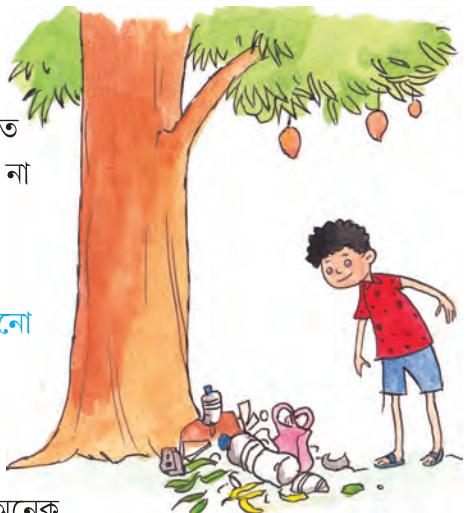
বাড়ির দক্ষিণদিকের আমগাছের নীচে রফিক বেশ কিছু জিনিসপত্র পড়ে থাকতে দেখল। কাছে গিয়ে হাত দিতে যাবে এমন সময় মা বলে উঠলেন— হাত দিও না বাবা।

রফিক মাকে জিজ্ঞাসা করল— ওগুলো কী গো ?

মা বললেন— ওগুলো আমাদের বাড়ির নানা ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র। পুরোনো জিনিস কেনে এমন ফেরিওয়ালা এলে বলিস তো। ওগুলো বেচে দেবো।

রফিক দেখল এক জায়গায় কিছু পুরোনো শিশিবোতল। আর এক জায়গায় বেশ কিছু প্লাস্টিক প্যাকেট। এক জায়গায় একটা পুরোনো মাটির হাঁড়ির মধ্যে ভাতের ফ্যান ও সবজির খোসা। পাশে একটি ভাঙা রেডিয়ো রয়েছে। ওর না চেনা অনেক জিনিসও রয়েছে।

এবার তোমরা রফিকের মতো তোমাদের বাড়ির কাজে না লাগা জিনিসগুলোর তালিকা তৈরি করো।

বাড়ির কাজে না লাগা জিনিস	রান্নাঘরের কাজে না লাগা জিনিস
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

এবারে এসো দেখি বর্জ্যকে পদার্থ কেন বলা হয়। নীচের বাক্যগুলো থেকে সঠিক উত্তর বেছে নাও।

বৈশিষ্ট্য
1. বেশ কিছুটা জায়গা দখল করে থাকে/দখল করে থাকে না।
2. নির্দিষ্ট ওজন আছে / ওজন নেই।

এবার তোমরা তোমাদের চারপাশের নানারকম আবর্জনার তালিকা তৈরি করো। তারপর নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

আবর্জনার তালিকা	জায়গা দখল করে থাকে কিনা	নির্দিষ্ট ওজন আছে কিনা
1. পচা ফল		
2. বোতাম		
3. থার্মোকলের টুকরো		
4. পুরোনো ব্লেড		
5. মাছের আঁশ		
6. বাতিল ব্যাটারি		
7.		
8.		

এবারে লেখার চেষ্টা করো তোমাদের চেনা বর্জ্য পদার্থগুলোর মধ্যে কোনগুলো কঠিন আর কোনগুলো কঠিন নয়।

বর্জ্য পদার্থের নাম	কী ধরনের বর্জ্য পদার্থ (কঠিন/কঠিন নয়)

কলার খোসা, পটলের খোসা, প্লাস্টিকের বোতল, কাচের টুকরো, টিনের তৈরি ক্যান, কম্পিউটারের ক্যাবিনেট, চটের তৈরি ব্যাগ আর খবরের কাগজের তৈরি ঠোঙা যদি দীর্ঘদিন মাটিতে ফেলে রাখা যায় তবে বেশ কিছু দিন পর দেখা যায় কলার খোসা, চটের ব্যাগ, আর কাগজের ঠোঙা মাটিতে মিশে গেছে। বাকিগুলোর বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি।
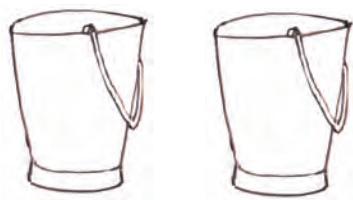
এবার তোমার চারদিকে ফেলে দেওয়া বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে কোনগুলো সহজে মাটিতে মিশে যায় আর কোনগুলো দীর্ঘদিন মাটিতে থাকলেও সহজে ভাঙে না, পরিবর্তিত হয় না বা মাটিতে মেশে না, তার একটা তালিকা তৈরি করো।

চারিদিকে ফেলে দেওয়া জিনিসের নাম	কিছুদিন রেখে দিলে যা সহজে মাটিতে মিশে যায়	দীর্ঘদিন রেখে দিলেও যা সহজে মাটিতে মেশে না

চারিদিকে ফেলে দেওয়া জিনিসের মধ্যে যেগুলো খুব তাড়াতাড়ি মাটিতে মিশে যায় তারা হলো **জৈব ভঙ্গুর (Biodegradable) বর্জ্য পদার্থ**। আর দীর্ঘদিন মাটিতে থাকার পরেও যেগুলোর কোনো রকম পরিবর্তন হয় না তারা হলো **জৈব অভঙ্গুর (Non-biodegradable) বর্জ্য পদার্থ**।

পাশে দুটো বালতি রাখা আছে। তোমরা রং করে আলাদা করো। একটা বালতি জৈব ভঙ্গুর আর অন্যটা জৈব অভঙ্গুর বর্জ্য পদার্থের জন্য নির্দিষ্ট।

নীচের বিভিন্ন বর্জ্যকে কোন কোন বালতিতে রাখবে তা নির্দিষ্ট করো।

দু-বছর হলো রতনদের গ্রামে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পিছনদিকটায় ওদের খেলার মাঠ। খেলার বলটা মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পিছনের পাঁচিলের ভেতরে গিয়ে পড়ে। তখন বল কে আনবে তাই নিয়ে চলে লড়াই। আসলে ওখানটা খুব নোংরা। ওদের ধারণা ওখানে গেলে শরীরে রোগ হবে।

বর্জ্য পদার্থের শ্রেণিবিভাগ

বর্জ্য সাধারণত কোথা থেকে পাওয়া যায় এসো জানা যাক।

1. বাড়ি থেকে— যেমন খালি বোতল
2. পুরসভা/পঞ্চায়েতের ডাস্টবিন থেকে—যেমন ভাঙা লাইট
3. কারখানা থেকে তৈরি বর্জ্য— নানারকম রাসায়নিক পদার্থ, তেল
4. ব্যাবসা থেকে তৈরি বর্জ্য— প্যাকেট, কাঠের গুঁড়ো,

5. স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পাওয়া বর্জ্য—ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, তুলো, গ্লাভস, প্লাস্টার
6. বাড়ি তৈরি করার সময় উদ্ভূত বর্জ্য— পাইপের টুকরো, প্লাস্টিক, অ্যাসবেস্টস
7. চাষের জমি থেকে পাওয়া বর্জ্য— ডিডিটি
8. বাজার থেকে পাওয়া বর্জ্য— পচা সবজি

আগের তালিকা থেকে পাওয়া বর্জ্যগুলির মধ্যে কোনগুলো জৈব ভঙ্গুর/ জৈব অভঙ্গুর এবং কোনগুলো আমাদের কাজে লাগে/লাগে না তার তালিকা তৈরি করো।

তালিকাথেকে প্রাপ্ত বর্জ্যের নাম	জৈব ভঙ্গুর	জৈব অভঙ্গুর	কাজে লাগে/লাগে না

এসো আমাদের বাড়ির ও চারপাশের নানাধরনের বর্জ্যপদার্থ নিয়ে আলোচনা করা যাক। নীচে তোমাদের বাড়ির নানাধরনের আবর্জনার কয়েকটির নাম দেওয়া আছে। তোমরা এইরকম আরো কিছু আবর্জনার নাম নীচের তালিকায় যোগ করো।

বাড়ির নানা ধরনের আবর্জনা

পুরোনো কাগজ	খড়, ভাঙা ডালপালা,	প্লাস্টিক প্যাকেট, বিস্কুটের প্যাকেট,	তরিতরকারির খোসা, ফলের খোসা,	বাজারের প্লাস্টিক ব্যাগ চটের ব্যাগ,
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....			

বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার

তোমরা এর আগে দুটো বালতিতে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থকে আলাদা আলাদা করে রেখেছিলে। আচ্ছা ওই নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থের মধ্যে থেকে কোন কোন জিনিসকে আবার কাজে লাগানো যেতে পারে তার তালিকা তৈরি করো।
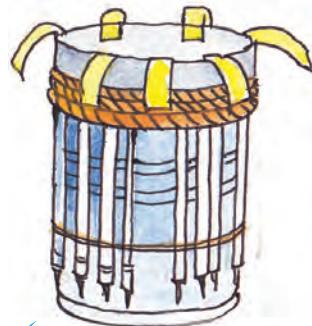
ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র	কী কাজে লাগানো যেতে পারে
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

রফিক একদিন ওই ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র থেকে একটা প্লাস্টিকের বোতল খুঁজে বার করল। আর বেশ কিছু কালি শেষ হয়ে যাওয়া রিফিল নিল। তারপর অবসর সময়ে সুন্দর একটা পেনদানি তৈরি করল। পেনদানিটা স্কুলে নিয়ে যেতে স্যার খুব প্রশংসা করলেন।

সুনীতা নতুন জামার ভেতরের কাগজের বোর্ডটা ফেলে না। সেগুলো জমিয়ে ছোট্ট কুঁড়েঘর তৈরি করল। রফিকের মা সবজির খোসাগুলোকে গোরুকে খাইয়ে দিলেন। রফিক পারতপক্ষে দোকান থেকে প্লাস্টিকের ব্যাগ নেয় না। আর নিলেও সেটা বারবার ব্যবহার করে।

তোমাদের বাড়ির বর্জ্য পদার্থগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করো তা লেখো।

1.	3.
2.	4.

নমিতার বাবা বাগানের পাতা, ফলের / সবজির খোসা ফেলেন না। বাগানের এক জায়গায় গর্ত করলেন। তারপর গর্ততে ওই বর্জ্যগুলোকে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে দিলেন, বেশ কিছু দিন পরে বেশ খানিকটা সার তৈরি হলো।

বেশ জোরে মাইকের শব্দ শুনে সুমন্ত্র ছুটে রফিকের বাড়ির বাইরে এল। দেখল একটা রিকসায় বসে একজন লোক জোরে জোরে কিছু একটা বলতে বলতে আসছে। একটু পরে রিকসাটা কাছে এল। সে শুনতে পেল কথাটা। বলছে— 'বাড়ির প্লাস্টিক যেখানে সেখানে ফেলবেন না। নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলুন। পুরসভার গাড়ি এসে ওগুলো নিয়ে যাবে।'

পরদিন সুমন্ত্র ক্লাসে এসে সেকথা বলল। রাবেয়াও বলল আমাদের পাড়াতেও গাড়িটা এসেছিল। রফিক বলল—আমার মা তো কবে থেকেই প্লাস্টিকগুলোকে আলাদা রাখে।

আমাদের চারপাশে পড়ে থাকা নানাধরণের বর্জ্যকে আবার ব্যবহার করতে হবে। আর তার জন্য চাই সুপরিকল্পনা। এব্যাপারে **4R(Reduce, Refuse, Reuse, Recycle)** পদ্ধতির সাহায্য আমরা নিতে পারি।

কমিয়ে আনা (Reduce) : যেসব বর্জ্য পরিবেশে জঞ্জাল বাড়ায়, সেগুলির ব্যবহার কমিয়ে আনতে পারি।

যেমন প্লাস্টিক ব্যাগ, ..., ..., ..., ...,

আবার কাজে লাগানো (Reuse) : ব্যবহার করা বর্জ্য ফেলে না দিয়ে আবার কাজে লাগানো।

যেমন তরকারির খোসা, ..., ..., ..., ...

পুনর্ব্যবহার (Recycle) : ফেলে দেওয়া জিনিস থেকে নতুন কাজের জিনিস তৈরি করা।

পুরোনো লোহা গলিয়ে ধাতুর নতুন কিছু জিনিস তৈরি করা।

.................................., ..., ..., ...

প্রত্যাখ্যান করা (Refuse) : সুস্থ পরিবেশের জন্য আমরা কিছু জিনিস কিছুতেই ব্যবহার করব না।

যেমন প্লাসটিক ব্যাগ, ..., ..., ..., ...

পরিবেশ ও বিজ্ঞান

পাঠ্যসূচি

1. পরিবেশ ও জীবজগতের পারস্পরিক নির্ভরতা

ক) উদ্ভিদের ওপর প্রাণীর নির্ভরশীলতা
খ) প্রাণীর ওপর উদ্ভিদের নির্ভরশীলতা
গ) এক জীবের ওপর অন্য জীবের নির্ভরশীলতা
ঘ) প্রাণীদের ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা
ঙ) জীবাণুর ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা

2. আমাদের চারপাশের ঘটনাসমূহ

ক) একমুখী, বহুমুখী ঘটনা
খ) পর্যাবৃত্ত, অপর্যাবৃত্ত ঘটনা
গ) অভিপ্রেত ও অনভিপ্রেত ঘটনা
ঘ) প্রাকৃতিক ঘটনা, মনুষ্যসৃষ্ট ঘটনা
ঙ) মন্থর ও দ্রুত ঘটনা
চ) ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য
ছ) পরিবর্তন ও শক্তি
জ) ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের আরও ঘটনা

3. মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ

ক) ধাতু ও অধাতু
খ) বিশুদ্ধ ও মিশ্র পদার্থ
গ) মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ
ঘ) চিহ্ন, সংকেত ও যোজ্যতা
ঙ) বিভিন্ন ধরনের মিশ্রণ
চ) মিশ্রণ পৃথককরণের পদ্ধতি

4. শিলা ও খনিজ পদার্থ

ক) নানান ধরনের শিলা
খ) খনিজ পদার্থ ও আকরিক
গ) সংকর ধাতু
ঘ) জীবাশ্ম বা ফসিল
ঙ) জীবাশ্ম জ্বালানি বা ফসিল ফুয়েল

5. মাপজোক ও পরিমাপ

ক) দৈনন্দিন জীবনে পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা ও পরিমাপের এককসমূহ
খ) দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল, আয়তন, ভর ও সময়
গ) উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির পরিমাপ

6. বল ও শক্তির ধারণা

ক) স্থিতি, গতি ও শক্তির ধারণা
খ) স্পর্শহীন বল
গ) শক্তির ধারণা, প্রকারভেদ, রূপান্তর, উৎস, শক্তি শৃঙ্খলের ধারণা ও শক্তি সমস্যা
ঘ) প্রাত্যহিক জীবনে ঘর্ষণ বল

7. তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের স্থিতি ও গতি

ক) চাপের ধারণা
খ) চাপের প্রভাব
গ) বারনৌলির নীতির ধারণা

8. মানুষের শরীর

ক) হৃৎপিণ্ড
খ) রক্ত
গ) ফুসফুস
ঘ) অস্থি, অস্থিসন্ধি ও পেশি
ঙ) শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশ

9. সাধারণ যন্ত্রসমূহ

ক) যন্ত্রের ধারণা
খ) লিভার
গ) নততল
ঘ) স্ক্রু, পুলি, চক্র ও অক্ষদণ্ড
ঙ) যন্ত্রের পরীক্ষা

10. জীববৈচিত্র্য ও তার শ্রেণিবিভাগ

ক) প্রজাতি সম্পর্কে ধারণা
খ) জীবরাজ্যের শ্রেণিবিভাগ

11. কতকগুলি প্রাণীর বাসস্থান ও আচার আচরণ

ক) আচরণ বিজ্ঞান আর আচরণ বিজ্ঞানী
খ) কতকগুলি বিশেষ প্রাণীর আচার-আচরণ

12. বর্জ্য পদার্থ

ক) বর্জ্য পদার্থের উৎস ও প্রকৃতি
খ) বর্জ্য পদার্থের শ্রেণিবিভাগ
গ) বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার

তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি

প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : (প্রত্যেক বিষয় থেকে 5 নম্বর নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে)

1. পরিবেশ ও জীবজগতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (1-20)
2. আমাদের চারপাশের ঘটনাসমূহ (21-38)
3. মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ (39-54)

দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (প্রত্যেক বিষয় থেকে 5 নম্বর নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে)

4. শিলা ও খনিজ পদার্থ (55-62)
5. মাপজোক বা পরিমাপ (63-78)
6. বল ও শক্তির প্রাথমিক ধারণা (79-99)
7. তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের স্থিতি ও গতি (100-105)
8. মানুষের শরীর (106-132)

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (প্রত্যেক বিষয় থেকে 10 নম্বর নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে)

9. সাধারণ যন্ত্রসমূহ (133-140)
10. জীববৈচিত্র্য ও তার শ্রেণিবিভাগ (141-155)
11. কতকগুলি বিশেষ প্রাণীর বাসস্থান ও আচার-আচরণ (156-174)
12. বর্জ্য পদার্থ (175-180)

বিশেষ মন্তব্য : তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দেশিত অংশগুলির সঙ্গে প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অন্তর্গত অধ্যায় মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ, দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অন্তর্গত মাপজোক বা পরিমাপ, বল ও শক্তির ধারণা অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত হবে। সংযোজিত অংশটি ধরে পাঠ্য প্রতিটি বিষয় অবলম্বনে 10 নম্বরের প্রশ্নপত্র মূল্যায়নের জন্য তৈরি করতে হবে। সেক্ষেত্রে অধ্যায় ও তা থেকে তৈরি করা প্রশ্নের মূল্যায়নের সারণিটি হবে নিম্নরূপ :

অধ্যায়	প্রশ্নের মূল্যমান
1. সাধারণ যন্ত্রসমূহ	10
2. জীববৈচিত্র্য ও তার শ্রেণিবিভাগ	10
3. কতকগুলি বিশেষ প্রাণীর বাসস্থান ও আচার-আচরণ	10
4. বর্জ্য পদার্থ	10
5. মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ	10
6. মাপজোক বা পরিমাপ	10
7. বল ও শক্তি	10

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য সক্রিয়তামূলক কার্যাবলী	প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে ব্যবহৃত সূচকসমূহ
i) সারণি পূরণ ii) ছবি বিশ্লেষণ iii) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ iv) দলগত কাজ ও আলোচনা v) কর্মপত্র পূরণ ও সমীক্ষার বিবরণ vi) সঙ্গী মূল্যায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন vii) হাতের কাজ ও মডেল প্রস্তুতি viii) ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field work)	1) অংশগ্রহণ 2) প্রশ্ন ও অনুসন্ধান 3) ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য 4) সমানুভূতি ও সহযোগিতা 5) নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ

প্রশ্নের নমুনা

(এই ধরনের নমুনা অনুসরণ করে পার্বিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র তৈরি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অন্যান্য ধরনের প্রশ্নও ব্যবহার করা যেতে পারে। কী কী ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে তার কিছু নমুনা দেওয়া হলো।)

1. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1 নম্বর)

i) কোন রাশিটি মৌলিক রাশি নয়?— (a) আয়তন (b) দৈর্ঘ্য (c) সময় (d) ভর

ii) ‘বেগ’ রাশিটির SI একক হলো — (a) cm/s^2 (b) m/s^2 (c) cm/s (c) m/s

iii) 9·8 m-কে কিলোমিটারে প্রকাশ করলে হয়—(a) 0·098 km (b) 0·0098 km (c) 0·980 km (d) 0·00098 km

iv) কোনো বস্তুর উপরিতলের পরিমাপ যে রাশি দিয়ে প্রকাশ করা হয় তা হলো — (a) আয়তন (b) উচ্চতা (c) ক্ষেত্রফল (d) ঘনত্ব

v) একটা ছোটো অসম আকৃতির পাথরের টুকরোর আয়তন পরিমাপ করতে তুমি নীচের দেওয়া কোন কোনগুলো ব্যবহার করবে— (a) স্কেল, কাগজ, পেনসিল (b) তুলাযন্ত্র, স্কেল, পেনসিল (c) আয়তনমাপী চোঙ, তুলাযন্ত্র, পেনসিল (d) জল, আয়তনমাপী চোঙ, নাইলনের সুতো

vi) ইলেট্রিক হর্ন বাজানো হলো— ঘটনাটিতে— (a) যান্ত্রিকশক্তি শব্দশক্তিতে রূপান্তর হয়েছে (b) তাপশক্তি শব্দশক্তিতে রূপান্তর হয়েছে (c) বৈদ্যুতিক শক্তি শব্দশক্তিতে রূপান্তর হয়েছে (d) রাসায়নিক শক্তি শব্দশক্তিতে রূপান্তর হয়েছে

vii) নীচের কোন খাদ্যশৃঙ্খলটি সঠিক নয়— (a) ঘাস ⟶ গঙ্গাফড়িং ⟶ ব্যাং ⟶ সাপ ⟶ বেজি (b) গাছের পাতা ⟶ পঙ্গপাল ⟶ শালিক পাখি (c) গাছের পাতা ⟶ খরগোশ ⟶ বাজ ⟶ পাখি (d) ঘাস ⟶ হরিণ ⟶ সাপ

viii) একটা ফুটবলকে মাঠের ওপর গড়িয়ে দিলে তা কিছু দূর গিয়ে থেমে যায়। ঘটনাটির জন্য দায়ী— (a) বলটির উপরিতলের ক্ষেত্রফল (b) বলটির আকৃতি (c) ঘর্ষণ বল (d) বলটির গতি

ix) চাপ = $\frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$ সূত্রটি থেকে পেরেকের ক্ষেত্রে চাপ বাড়াবার কোন নীতিটি কাজে লাগানো হয়েছে— (a) ক্ষেত্রফল বাড়ানো হয়েছে (b) ক্ষেত্রফল ও বল দুটিকেই বাড়ানো হয়েছে (c) ক্ষেত্রফল কমানো হয়েছে (d) বলকে কমানো হয়েছে

x) C B বল ↓ / ↑ △ A / বাধা আলম্ব 1-ম শ্রেণির লিভার

লিভারটির কর্মদক্ষতা বাড়াতে হলে— (a) B বিন্দু A বিন্দুর কাছাকাছি হতে হবে, (b) A বিন্দু B বিন্দুর কাছাকাছি হতে হবে, (c) B বিন্দু C বিন্দুর কাছাকাছি হতে হবে, (d) B বিন্দু C ও A-বিন্দুর মধ্যখানে থাকতে হবে,

xi) কোন ঘটনাটি একমুখী— (a) মোম গলে যাওয়া (b) গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাওয়া (c) রোদের তাপে রেললাইন গরম হয়ে যাওয়া (d) জল থেকে বাষ্প তৈরি হওয়া

xii) কোনটি পর্যাবৃত্ত ঘটনা নয়— (a) ঋতু পরিবর্তন (b) জোয়ার-ভাটা (b) হঠাৎ বন্যা হওয়া (d) পূর্ণিমা

xiii) কোনটি অন্য শব্দগুলির থেকে আলাদা— (a) বক্সাইট (b) হেমাটাইট (c) তামা (d) কপার গ্লান্স

xiv) কোনটি অন্য শব্দগুলির থেকে আলাদা— (a) গ্রানাইট (b) পিউমিস (c) ব্যাসাল্ট (d) চুনাপাথর

xv) কোনটি মৌল নয়— (a) তামা (b) কার্বন (c) সোনা (d) অ্যামোনিয়া

xvi) জল ও চিনির মিশ্রণের ক্ষেত্রে কোন কথাটি ঠিক— (a) জল দ্রাব, চিনি দ্রাবক (b) এদের ফিলটার করে আলাদা করা যায় (c) এদের চুম্বকের সাহায্যে আলাদা করা যায় (d) জল দ্রাবক, চিনি দ্রাব

xvii) গাছ থেকে যে জিনিসটা পাওয়া যায় না, সেটা হলো— a) কাগজ b) গঁদের আঠা c) কুইনাইন d) ছানা

xviii) নীচের কোন অস্থিসন্ধিটা অল্প অল্প নড়াচড়া করে—a) মাথার খুলির অস্থিসন্ধি b) কবজির অস্থিসন্ধি c) পঞ্জরাস্থি আর স্টারনামের অস্থিসন্ধি d) কাঁধের অস্থিসন্ধি

xix) জলের রেশম যে ধরনের উদ্ভিদ সেটা হলো— a) মস b) শ্যাওলা c) ফার্ন d) ব্যক্তবীজী

xx) ছত্রাক চাষ করে— a) চাষি পিঁপড়ে b) কালো পিঁপড়ে c) মৌমাছি d) লাল পিঁপড়ে

xxi) যে সাপ সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে সেটা হলো— a) চন্দ্রবোড়া b) কেউটে c) গোখরো d) দাঁড়াশ

2. নীচের যে কথাটি ঠিক তার পাশে '✓' আর যে কথাটি ভুল তার পাশে '×' দাও : **(প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1 নম্বর)**

i) সী হর্স একধরনের মাছ। ☐ ii) সাপদের কান আছে। ☐ iii) আফ্রিকার জঙ্গলে ছাড়া শিম্পাঞ্জীদের অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবেশেও পাওয়া যায়। ☐ iv) দইয়ের সাজাতে যে ছত্রাক থাকে, তারাই দুধকে দই বানিয়ে দেয়। ☐ v) বংশগত কারণ ও সঠিক পুষ্টির ওপর বৃদ্ধি নির্ভর করে। ☐ vi) আমাদের হাতের বুড়ো আঙুলে স্যাডল অস্থিসন্ধি আছে। ☐ vii) প্রশ্বাস নেওয়ার সময় বুকের খাঁচা চুপসে যায় আর বাতাস ভেতর থেকে বেরিয়ে যায়। ☐ viii) ফুসফুসীয় ধমনি বিশুদ্ধ রক্ত বয়ে নিয়ে যায়। ☐ ix) কর্ড মাছের যকৃতের তেলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন C থাকে। ☐ x) খাদ্য পিরামিডের প্রতিটি ট্রফিক লেভেলে মোট গৃহীত শক্তির মাত্র দশ শতাংশ দেহ গঠনের কাজে লাগে। ☐ xi) পুরুষ মশা রক্ত খায়। ☐

3. শূন্যস্থান পূরণ কর : **(প্রতিটি শূন্যস্থান পূরণের জন্য 1 নম্বর)**

i) 5390 cc = _______ L ii) কোনো বস্তুকে মাটি থেকে ওপরে তুললে তার মধ্যে কাজ করার _______ যোগান হয়। iii) _______ হলো এমন একটি প্রাণী যা খাদ্য শৃঙ্খলের উৎপাদক ছাড়া আর সব স্তরেই থাকতে পারে। iv) এমন একটা ঘড়ি হলো _______ যাতে কোনো কাঁটা থাকে না। v) তুমি যখন জামা বা ব্যাগের চেইন আটকাও তখন যে বল প্রয়োগ করো তাকে _______ বল বলা যায়। vi) মরচে ধরা একটি _______ পরিবর্তন। vii) হিরে অধাতু হলেও তাপের _______। viii) ফিলটার করার পর প্রাপ্ত তরলকে বলা হয় _______। ix) চুনাপাথর একধরনের _______ শিলা। x) পালিশ করার জন্য প্রয়োজনীয় _______ গাছ থেকে পাওয়া যায়। xi) গো-বক আর _______ মধ্যে মিথোজীবী সম্পর্ক দেখা যায়। xii) নিজের দেহে নিজেই খাদ্য উৎপন্ন করে বলে উদ্ভিদকে বলা হয় _______। xiii) শরীরের কোথাও কেটে গেলে _______ রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। xiv) অস্থিসন্ধিতে দুটো হাড় একে অন্যের সঙ্গে _______ দিয়ে বাঁধা থাকে। xv) বল এবং সকেট সন্ধি দেখা যায় _______। xvi) প্যানথেরা টাইগ্রিস হলো _______ বৈজ্ঞানিক নাম। xvii) মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহের মাঝ বরাবর ভ্রূণ অবস্থায় থাকে _______ নামের একটি দণ্ড। xviii) আমাদের সবার শরীর যেসব ছোটো ছোটো ঘর বা কুঠুরী দিয়ে তৈরি, তাদের বলা হয় _______। xix) পিঁপড়েদের সমাজে দাসী, সৈন্য আর শ্রমিক সবাই আসলে _______ মেয়ে। xx) মৌচাক _______ দিয়ে তৈরি। xxi) তিমি একধরনের _______ প্রাণী। xxii) চাষের জমি থেকে পাওয়া একটা বর্জ্য হলো _______। xxiii) সচল অস্থিসন্ধির ভেতর একধরনের _______ তরল থাকে। xxiv) একটা জৈব অভঙ্গুর বর্জ্য পদার্থ হলো _______।

4. স্তম্ভগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো : **(প্রতিটি সম্পর্ক স্থাপনের জন্য 1 নম্বর) (নমুনা হিসাবে একটা করে দেওয়া হলো)**

I.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ	'C' স্তম্ভ
i) বস্তুর উপরিতল	a) ঘর্ষণ	1) ক্ষয়
ii) লোহা ও চুম্বক	b) পরিমাপ	2) চাপবৃদ্ধি
iii) খাদ্য শৃঙ্খল	c) আকর্ষণ	3) বারনৌলির নীতি
iv) গাড়ির টায়ার	d) উৎপাদক	4) ক্ষেত্রফল
v) ঝড়	e) ন্যূনতম ক্ষেত্রফল	5) খাদক
vi) ছুরির ধারালো অংশ	f) বাড়ির চাল উড়ে যাওয়া	6) স্পর্শহীন বল

উ : **iii) - d) - 5)**

II.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ	'C' স্তম্ভ
i) ম্যাগনেশিয়াম তারের দহন	a) তরল	1) রাসায়নিক পরিবর্তন
ii) পারদ	b) তড়িৎপ্রবাহ	2) পরিস্রাবণ
iii) কাদাগোলা জল	c) একমুখী	3) নুন
iv) জল	d) কেলাসন	4) ধাতু
v) নুন জল	e) ফিল্টার কাগজ	5) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস

III.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ
(i) ইডিস মশা	a) অ্যানিলিডা
(ii) পায়ের পেশি	b) মৌচাক
(iii) চিংড়ি	c) বায়ুথলি
(iv) মৌমাছি	d) কঙ্কাল পেশি
(v) ছাগল	e) ডেঙ্গি
(vi) বাম অলিন্দ	f) আর্থ্রোপোডা
(vii) ব্লোহোল	g) প্রথম শ্রেণির খাদক
(viii) জৈবভঙ্গুর বর্জ্য পদার্থ	h) বিশুদ্ধ রক্ত
(ix) ফুসফুস	i) তিমি
(x) জোঁক	j) আন্তরযন্ত্রীয় পেশি
	k) কলার খোসা

5. বেমানান শব্দ বা নামটিকে খুঁজে বার করো : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1 নম্বর)

i) সালিম আলি, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, কনরাড লোরেঞ্জ, বারনৌলি ii) শ্যাওলা, মস, ফার্ন, তারামাছ, iii) শ্বেত রক্তকণিকা, পেশি, লোহিত রক্তকণিকা, অণুচক্রিকা, iv) তুলোগাছ, উকুন, যক্ষ্মার জীবাণু, স্বর্ণলতা, v) লিগামেন্ট, হৃৎপিণ্ড, টেনডন, অস্থি, vi) রুই মাছ, তারামাছ, টিকটিকি, শালিক vii) ব্যাং, ঘাসফড়িং, ঘাস, সাপ viii) তরিতরকারির খোসা, খড়, প্লাস্টিকের ব্যাগ, পুরোনো কাগজ।

6. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1 নম্বর)

i) স্ক্রু-এ কোন নীতির প্রয়োগ করা হয়? ii) পতাকায় হাওয়া লাগলে তাতে ঢেউ খেলে — ঘটনাটি বিজ্ঞানের কোন নীতির উদাহরণ? iii) ঘর্ষণ বল, ঘর্ষণ তলের ক্ষেত্রফল না তার প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে? iv) খাদ্য পিরামিডের কোন স্তরে জীবের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি? v) খাদ্য শৃঙ্খলটির ফাঁকা জায়গাটি পূরণ কর। ধান ⟶ ইঁদুর ⟶ [ ] ⟶ বাজপাখি। vi) এমন একটি উদাহরণ দাও যেখানে টানা ও ঠেলা এই দুই প্রকারের যে কোনো এক প্রকারের বল প্রয়োগ করে একই কাজ করা হয়। vii) একটা খালি বাটির মধ্যে একটি কানায় কানায় জলপূর্ণ গ্লাস রাখা হলো। একটি পাথরকে সাবধানে এমনভাবে গ্লাসের জলে ফেলা হলো যাতে একটুও জল গ্লাসের বাইরে ছিটকাতে না পারে। ফলে কিছুটা জল উপছে বাটিতে পড়ল। ওই পাথরের সঙ্গে উপছানো জলের কী সম্পর্ক? viii) এমন একটি উদাহরণ দাও যেখানে 'আনুমানিক পরিমাপ' করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। ix) ঘর্ষণের ফলে ক্ষয় হয় এমন একটি উদাহরণ দাও। x) কোনো ধাতুর আকরিক বলতে কী বোঝায়? xi) একটা মিশ্র ধাতুর উদাহরণ দাও। xii) প্রাকৃতিক গ্যাসের মুখ্য উপাদানের নাম লেখো। xiii) তরলে গ্যাস মিশে দ্রবণ তৈরি হয়েছে এমন উদাহরণ দাও। xiv) দুটো আলাদা হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটা হাইড্রোজেন অণু সংকেতের সাহায্যে কীভাবে বোঝাবে? xv) অধাতু হলেও তাপের সুপরিবাহী এমন দুটো পদার্থের উদাহরণ দাও। xvi) H_2O সংকেত থেকে তুমি কী কী কথা বলতে পারো? xvii) খোলা হাওয়ায় সদ্য কেটে রাখা আপেলে বাদামি ছোপ ধরে কেন? xviii) বাঘ অল্প আলোতেও ভালো দেখতে পায় কেন? xix) অ্যাজোলার পাতায় থাকা ব্যাকটেরিয়া কীভাবে অ্যাজোলার উপকার করে? xx) পঞ্জরপেশি কোথায় থাকে? xxi) ফুসফুস প্রধানত কী দিয়ে তৈরি? xxii) দুটো ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের নাম লেখো। xxiii) আচরণ বিজ্ঞানীরা কী কী বিষয় দেখেন? xxiv) তিমিরা কীভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে? xxv) এক ট্রফিক লেভেল থেকে অন্য ট্রফিক লেভেলে স্থানান্তরণের সময় শক্তির অপচয়কে কোন সূত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়? xxvi) হৃৎপিণ্ড থেকে যে নলের মাধ্যমে রক্ত সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে, তার নাম কী? xxvii) ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে যে অণুজীব তাদের জীবজগতের কোন রাজ্যে রাখা হয়?

7. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 2 নম্বর)

i) তোমার কাছে একটি দাঁড়িপাল্লা, একটি 1 কেজি ভরের বাটখারা ও এক বস্তা চাল আছে। তুমি ওই দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারার সাহায্যে কীভাবে 250 গ্রাম চালের ভর মাপতে পারবে? ii) দুটি তারার মধ্যের দূরত্বকে আলোকবর্ষ এককে প্রকাশ করা হয়। আলোকবর্ষ প্রাথমিক একক না লব্ধ একক? কেন? iii) কল থেকে কী হারে জল পড়ছে তা কোন এককে মাপবে? এই পরিমাপের জন্য কী কী যন্ত্র লাগবে? iv) তুমি যে বাড়িতে থাকো তা কি প্রকৃতই স্থির? কারণ কী? v) গতিশক্তি থেকে তাপশক্তিতে রূপান্তরের একটি উদাহরণ দাও। vi) ঘর্ষণ বল আছে বলে আমরা কী কী সুবিধা পেতে পারি? vii) তোমার দেহের একটি অঙ্গের নাম লেখো যা দুটি নততলের সমন্বয়ে তৈরি হয়। viii) তোমার বাড়িতে ব্যবহার করা হয় এমন দুটি জিনিসের নাম লেখো যাকে নততল বলা যায়। ix) তোমার হাত একটি তৃতীয় শ্রেণির লিভার। এর আলম্ব কোথায় আছে? x) জলে চিনি গোলার পরে চিনিকে চোখে দেখা যায় না। কী কী পরীক্ষা করে তুমি বলতে পারো যে চিনি হারিয়ে যায়নি দ্রবণেই আছে? xi) পেট্রোলিয়াম পরিশোধনের প্রয়োজনীয়তা কী? xii) জীবাশ্ম জ্বালানির দুটো

উদাহরণ দাও। xiii) লোহার সঙ্গে ক্রোমিয়াম মিশিয়ে যে মিশ্র ধাতু পাওয়া যায় তার সঙ্গে লোহার ধর্মের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য কী? xiv) আমাদের আশেপাশে আমরা সাধারণত কোন্ কোন্ জাতের কাককে দেখতে পাই? xv) ভিটামিন A আর D-এর অভাবে আমাদের কী সমস্যা হতে পারে? xvi) টেনডন কী কাজ করে? xvii) জঁ আঁরি ফ্যাবা আর কার্ল ফন ফ্রিশ-এঁরা যেসব প্রাণীদের নিয়ে কাজ করেছেন তাদের একটা করে নাম লেখো। xviii) শিম্পাঞ্জিরা কী খায়? xix) এমন দুটো পাখির নাম লেখো যাদের খালি শীতকালে দেখতে পাও। xx) তোমরা বাড়িতে তৈরি হওয়া একটা জৈব অভঙ্গুর আর একটা জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য পদার্থের নাম লেখো। xxi) মাছেদের কোন পাখনা নৌকার বৈঠার মতো কাজ করে? xxii) তুমি কীভাবে তোমার চারপাশের যেকোনো একটা বর্জ্য পদার্থকে আবার কাজে লাগাতে পারো লেখো। xxiii) বাম অলিন্দ থেকে রক্ত কীভাবে ডান অলিন্দে পৌঁছায়? xxiv) প্রত্যেক জীবের একটা করে বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়ার কারণ কী?

8. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 3 নম্বর)

i) নীচের ঘটনাগুলিতে কোন শক্তির কোন শক্তিতে রূপান্তর ঘটছে লেখ ঃ a) ব্যাটারিচালিত ক্যালকুলেটার; b) দুটি পাথর ঘষার ফলে আগুন জ্বলে উঠল; c) ওপর থেকে একটা পাথরকে ফেলে দেওয়ায় নীচের দিকে পড়ছে। ii) তোমার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত এমন তিনটি উদারহণ দাও যেখানে তুমি বাধ্য হও আনুমানিক পরিমাপ করতে। iii) একটি তৃণভূমির খাদ্যজালের উদাহরণ দাও। iv) যদি ঘর্ষণ বল না থাকতো তবে তোমার দৈনন্দিন জীবনে কী কী অসুবিধা হতো তার যেকোনো ছয়টি উদাহরণ দাও। v) বারনৌলির নীতির সমক্ষে একটি হাতেকলমে পরীক্ষার উল্লেখ করো। vi) চাষের জমিতে প্রয়োগ করা অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক কীভাবে উদ্ভিদ থেকে পরবর্তী শ্রেণির খাদকের দেহে প্রবেশ করতে পারে তার একটা রেখাচিত্র এঁকে দেখাও। vii) কাচের শিশি পড়ে ভেঙে গেল— এটা কী ধরনের পরিবর্তন বলবে? যুক্তিসহ লেখো। viii) ফসিল কীভাবে তৈরি হয় তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ix) শিশির কীভাবে তৈরি হয়? x) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রঙের পরিবর্তন হচ্ছে এমন কোনো উদাহরণ তোমার জানা থাকলে বলো। xi) কোনো কঠিন জিনিসকে গুঁড়ো করে ফেললে তা তাড়াতাড়ি রাসায়নিক বিক্রিয়া করে এমন উদাহরণ দাও। এর কারণ কী? xii) কোন্ ক্ষেত্রে তুমি ফিল্টার কাগজের সাহায্যে মিশ্রণের উপাদান পৃথক করতে পারবে এবং কোন ক্ষেত্রে পারবে না তা যুক্তিসহ লেখো ঃ (a) চিনি ও জলের মিশ্রণ (b) জল ও বালির মিশ্রণ। xiii) কথাটি ঠিক না ভুল যুক্তি দিয়ে বোঝাও ঃ "কোনো ধাতুর সব খনিজই ধাতুর আকরিক।" xiv) ঘটনাগুলোর একটা করে উদাহরণ দাও ঃ a) বাতাসের অক্সিজেনের প্রভাবে ঘটা রাসায়নিক পরিবর্তন; b) সূর্যালোকের প্রভাবে ঘটা রাসায়নিক পরিবর্তন; c) তাপ প্রয়োগে ঘটা ভৌত পরিবর্তন। xv) বর্জ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে 4R পদ্ধতিটি কী? xvi) উইদের খাবার কী? উইরা এই খাবার কীভাবে হজম করে? xvii) ইস্ট কীভাবে পাঁউরুটি তৈরি করতে সাহায্য করে? xviii) বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণী বিভিন্ন রকমের দেখতে হয় কেন? xix) মাথা ঘুরিয়ে এদিক সেদিক দেখতে অস্থিসন্ধি কীভাবে আমাদের সাহায্য করে? xx) তোমার বন্ধুর ওজন 35 কেজি আর উচ্চতা 3 ফুট। তাহলে ওই বন্ধুর দেহ ভরসূচক থেকে বন্ধুর সুস্থতা সম্পর্কে তোমার কী ধারণা হলো সেটা লেখো। xxi) একটা একবীজপত্রী আর একটা দ্বিবীজপত্রী গাছের নাম লেখো। এদের বীজকে আলাদা করবে কীভাবে? xxii) শ্রমিক মৌমাছিরা কী কী কাজ করে? xxiii) বাঘিনি কীভাবে সন্তানদের পালন করে? xxiv) তিমি জলের নীচে থেকে ভেসে উঠলেই সাদা ফোয়ারা মতো দেখা যায়। এর কারণ কী? xxv) এক ট্রফিক লেভেল থেকে অন্য ট্রফিক লেভেলে শক্তির স্থানান্তরণের সময় শক্তির অপচয় হয় কেন?

9. শব্দছকটিকে সূত্রের সাহায্যে পূরণ করো : (প্রতিটি শব্দের জন্য 1 নম্বর)

সূত্র ঃ

ওপরনীচ : (1) একরকমের আগ্নেয়শিলা

(3) জলে বাস করে এমন এক ধরনের সরীসৃপ

(4) ঘড়ির কাঁটা যা মাপে

(5) মাটির নিচ থেকে পাই আর প্রতিদিন খাই

পাশাপাশি : (2) এর সঙ্গে সন্ন্যাসী কাঁকড়ার মিথোজীবী সম্বন্ধ
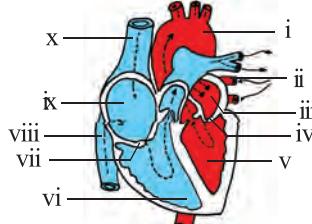
(4) লেবুর ______ ছানা কাটায়

(5) উইরা এই শর্করাটা হজম করতে পারে

10. পাশে দেওয়া হৃৎপিণ্ডের ছবিতে নীচে দেওয়া অংশগুলো দেখাও : (প্রতিটি অংশ দেখানোর জন্য 1 নম্বর)

বাম অলিন্দ, ডান অলিন্দ, বাম নিলয়, ডান নিলয়, মহাধমনি, ফুসফুসীয় শিরা, দ্বিপত্রক কপাটিকা, ত্রিপত্রক কপাটিকা, উর্ধ্ব মহাশিরা, নিম্ন মহাশিরা

শিখন পরামর্শ

প্রথম অধ্যায়: বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রিম্যান ডাইসন একটি কথা বলেছেন — ' It has become part of the accepted wisdom to say that the twentieth century was the century of Physics and the twenty-first century will be the century of Biology.'। এই কথাটি স্মরণে রেখে আমাদের জীবজগৎ ও প্রকৃতির বৈচিত্র্যের প্রতি নবীন শিক্ষার্থীর আগ্রহ, কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধির কথা চিন্তা করতে হবে। এই অধ্যায়টি সেই কাজের প্রথম ধাপ।

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রকৃতির বৈচিত্র্য সব বয়সের মানুষকেই আকর্ষণ করে। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত রূপ পরিস্ফুট হতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ। দ্বিতীয় অধ্যায় শিক্ষার্থীদের পরিবেশে সংঘটিত নানান ভৌত-রাসায়নিক ঘটনাসমূহের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে সাহায্য করবে। শিক্ষক এখানে ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনগুলির উদাহরণসহ প্রাথমিক বিশ্লেষণে সাহায্য করবেন। এই অধ্যায়ে প্রকৃতিতে ঘটে চলা নানাধরনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ কীভাবে বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে প্রভাবক রূপে কাজ করে তাও দেখানো হয়েছে। যে-কোনো পরিবর্তনের জন্যই শক্তির প্রয়োজন - এই ধারণা এই অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: দ্বিতীয় অধ্যায়ের পর রসায়নের প্রাথমিক ধারণার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর কাছে তার চেনা জড়জগতের অচেনা ছবি পরিস্ফুট করতে হবে। নীরস তথ্যের পরিবেশন কাম্য নয় তাই পরীক্ষানিরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্ত শুধু পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়েই বিজ্ঞানের বহু অংশ শেখা যায় না; প্রয়োজন হয় প্রতিফলনের (reflection)। কোনো পরীক্ষা করে দেখালে তার ফলাফল বিশ্লেষণ না করলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

চতুর্থ অধ্যায়: ব্যবহারিক প্রয়োজনে অপরিহার্য জড়জগতের এমন উপাদানগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটানো এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। শিশুকাল থেকে মিউজিয়ামে নিয়ে গিয়ে, ছবি দেখিয়ে জীবাশ্মের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষক/শিক্ষিকা জীবাশ্মের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটিয়ে ধীরে ধীরে জীব বিবর্তনের দিকে তার ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করবেন। এতে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধি পাবে। অনুসন্ধান ও সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

পঞ্চম অধ্যায়: বিজ্ঞানের কোনো শাখায় পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শিক্ষার্থীকে এই বিষয়ে সচেতন করার জন্য তাদের হাতেকলমে পরিমাপ করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এতে দ্রুত অনুমান ও বিশ্লেষণের মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যা একান্তই কাম্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়: তথাকথিত সংজ্ঞার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে শিশুর প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বল, শক্তি ও স্থিতি-গতির ধারণা প্রদান ও শিশুদের হাতেকলমে সহজলভ্য উপকরণ সহযোগে সহজসাধ্য পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে সেই ধারণার দৃঢ়ীকরণ এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

সপ্তম অধ্যায়: বর্তমান যুগে পদার্থবিজ্ঞানের সুসংহত ধারণা দেওয়া ছাড়া জীববিজ্ঞানে অগ্রগতি সম্ভব নয়। এই অধ্যায়ে চাপের ধারণা, পরিমাপ এবং জীবনের ও প্রকৃতিতে চাপের প্রভাব বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়: এই অধ্যায়ে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুসের মতো অঙ্গ এবং রক্ত, অস্থি ও পেশির মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের অবস্থান, গঠন, কলার বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, কার্য ও সমস্যার কথা উল্লেখিত হয়েছে। মানবদেহের প্রধান সংবহনতন্ত্র রক্ত; রক্তের কার্য ও সমস্যা সংগত কারণেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই অধ্যায়ের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় এর চিত্র সম্পদ। 'অস্থি ও অস্থি সন্ধির বিচলন' অংশটি পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যার মিলনস্থল বহু সংখ্যক ছবির মাধ্যমে অঙ্গসংস্থান ও হৃৎপিণ্ডের রক্তসংবহন সযত্নে শেখানো হয়েছে।

নবম অধ্যায়: শক্তিকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাতে হলে চাই যন্ত্র, নবীন শিক্ষার্থীদের নততল, লিভার, পুলি, চক্র, অক্ষদণ্ডের কাজ বোঝাতে হাতেকলমে কাজ করতে উৎসাহ দিন এবং বিশ্লেষণে সাহায্য করুন।

দশম অধ্যায়: কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে সাধারণত খনিজ সম্পদ ও জল সম্পদ উল্লিখিত হয়ে থাকে। বর্তমানে কোনো দেশের জীববৈচিত্র্যও তার অন্যতম সম্পদরূপে পরিগণিত হয়। শুধু জীববিজ্ঞানের জ্ঞানবৃদ্ধি নয়, জীববৈচিত্র্যে সংরক্ষণের ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। নবীন শিক্ষার্থীর মনে ভারতের মতো ক্রান্তীয় দেশের জীববৈচিত্র্যের ধারণা দিতে এই অধ্যায়টি সংযোজিত হয়েছে। কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্রেণিবিভাগ করার প্রয়োজনীয়তা উদাহরণসহ বোঝানো হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়: প্রাণীর আচার-আচরণও মানবিক গুণের বিকাশে সহায়তা করতে পারে। এই অধ্যায়ে কয়েকটি সমাজবদ্ধ প্রাণীর কথা বলা হয়েছে। এরকম প্রাণীদের পরিবার, সমানুভূতি, পারস্পরিক সহযোগিতা, সমস্যার সমাধান ও অপত্যস্নেহের উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে উক্ত গুণগুলির বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হন। শুধু বিজ্ঞানচর্চা নয়, মানবিক গুণের বিকাশই বর্তমানের সমস্যাদীর্ণ পৃথিবীকে অস্তিত্বের সংকট থেকে রক্ষা করতে পারে। শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে এই অধ্যায়ে বিখ্যাত আচরণ বিজ্ঞানীদের (Behavioural Biologist) কথা সংযোজিত হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়: বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো পরিবেশ দূষণ। পরিবেশ দূষণে আজ হারিয়ে যাচ্ছে বনাঞ্চল, বর্জ্যে ভরে উঠছে পৃথিবী। বর্জ্য পদার্থের প্রকৃতি, উৎস ও শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানই ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল সুনাগরিক গড়ে তোলার প্রথম ধাপ।

এই বইতে আমরা আকাদেমি বাংলা অভিধানের বানান রীতি অনুসরণ করেছি।

ভৌত পরিবেশের আলোচনার যেসব অধ্যায়ে পদার্থবিদ্যা আলোচিত হয়েছে সেখানে প্রধানত কর্মভিত্তিক শিখন প্রণালী (activity-based learning) অনুসৃত হয়েছে। শিক্ষক/শিক্ষিকা মহাশয়/মহাশয়ার মনে হতে পারে শুরুতে একটা ভূমিকা করে নেওয়া প্রয়োজন। ছাত্র/ছাত্রীদের বিষয়টিতে যেটুকু দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা আছে বলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/শিক্ষিকা মনে করবেন তার ভিত্তিতে তিনি একটি ভূমিকা করে নিয়ে কর্ম প্রক্রিয়াটি (activity) শুরু করবেন। এইভাবে শুরু করলে বিষয়টি বেশি মনোগ্রাহী হবে বলে আমাদের ধারণা।